সময় প্রসঙ্গ

ড. আলী আসগর

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

মানুষ যখন থেকে ভাবতে শিখেছে, তখন থেকেই সময় একটি ধাঁধা বা প্রহেলিকারূপে উদয় হয়েছে তার মনে। সময় সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগত গভীরতর ও সূক্ষ্মতর হয়েছে। সময়ের ধারণাকে প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের আবিষ্কার। সময় পরিমাপের বিভিন্ন রকম যন্ত্রের ও কৌশলের উদ্ভাবন, দৈনন্দিন জীবনে ও জটিল সব গবেষণায় সময় অপরিহার্য এক রাশিরূপে উপস্থিত হয়েছে। এরপরও সময় সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয়নি। এ বইয়ের মূল লক্ষ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের ধারণাকে ধাপে ধাপে তুলে ধরা।

সময় আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির, জ্ঞানচর্চা ও জীবন নির্বাহের সমগ্র স্তরে ও ক্রমবিকাশের ধারায় ক্রমবর্ধিত গুরুত্বে আবির্ভূত।

আমরা দেখব আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব, কোয়ান্টাম সংখ্যানিক বিদ্যা, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্ব, কৃষ্ণ বিবরে আপেক্ষিকতার সাধারণতত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ এবং সবশেষে স্ট্রিং তত্ত্বে সময় নতুন সব বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করছে।

সময়কে তাই বুঝতে হবে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির আলোকে, এর বিবর্তনের ধারায়। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি যত সমন্বিত হবে, সময়ের ধারণায় যে বৈচিত্র্য তা তত অভিসারী হবে। কোন দিন যদি একীভূত তত্ত্ব প্রকৃতির সবগুলো বলকে সমন্বিত করতে পারে, এবং প্রকৃতির সব ঘটনাকে একটি সমীকরণে আনা যায়, তখন হয়তো সময়ের একটি একক অভিন্ন চিত্র সম্ভব হবে।

ড. আলী আসগর গণবিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফিজিক্স ও বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর ও প্রকৌশল অনুষদের ডীন ছিলেন। জমাট পদার্থ, চৌম্বকবস্তু, মেডিক্যাল ফিজিক্স ও বায়ো ম্যাগনেটিজম তাঁর নির্বাচিত গবেষণার বিষয়। তাঁর শতাধিক গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে প্রসিডিংস রয়্যাল সোসাইটি, ফিজিক্যাল রিভিউ, ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স, জার্নাল অব ম্যাগনেটিজম অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়্যালস, ফিজিকা, থার্মোকেমিকা অ্যাকটা, জার্নাল অব অ্যালয়েজ অ্যান্ড কম্পাউন্ডস, নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্স, বাংলাদেশ জার্নাল অব ফিজিক্স, জার্নাল অব বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও দেশীয় জার্নালে। গবেষণা ও শিক্ষকতার পাশাপাশি বিজ্ঞান গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি, উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞানচর্চার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞানকে জনবোধ্য ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নানা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও প্রকাশমাধ্যমের ব্যবহারে তাঁর মেধা ও মননকে প্রয়োগ করেছেন। গবেষণা-ল্যাবরেটরি ও বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলার পাশাপাশি রেডিও, টেলিভিশন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা– সব মাধ্যমকেই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁর কয়েকশ প্রবন্ধ ও বিশটির মতন বই প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সস-এর ফেলো এবং বাংলাদেশ জার্নাল অব ফিজিক্স-এর চিফ এডিটর।

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪ ০৩

বর্ণবিন্যাস
সেতু কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৩৬০৫

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : উত্তম সেন

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা

ABOUT TIME : by ALI ASGAR
Published by Afzal Hossainn, Anindya Prokash
6 Shrishdas Lane Dhaka-1100 Phone 71 2 44 03
First Published in February 2007
Price :Taka 160.00
US $ 6.00

ISBN 984 8740 14 7

উৎসর্গ

রঞ্জন, ভাস্কর এবং ওদের বন্ধুদের
—যাদের জন্য অপেক্ষা করছে সম্ভাবনাময় অনাগত সময়

ভূমিকা

মানুষ যখন থেকে ভাবতে শিখেছে, তখন থেকেই সময় একটি ধাঁধা বা প্রহেলিকা-রূপে উদয় হয়েছে তার মনে। সময় সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি দীর্ঘসময় ধরে ক্রমাগত গভীরতর ও সূক্ষ্মতর হয়েছে। সময়ের ধারণাকে প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের আবিষ্কার। সময় পরিমাপের বিভিন্নরকম যন্ত্রের ও কৌশলের উদ্ভাবন, দৈনন্দিন জীবনে ও জটিল সব গবেষণায় সময় অপরিহার্য এক রাশিরূপে উপস্থিত হয়েছে। সেইসঙ্গে সময় নিয়ে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক যতসব ভাবনা এক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। কিন্তু এরপরও সময় সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয়নি। এ বইয়ের মূল লক্ষ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের ধারণাকে ধাপে ধাপে তুলে ধরা।

সময় আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির, জ্ঞানচর্চা ও জীবননির্বাহের সমগ্র স্তরে ও ক্রমবিকাশের ধারায় ক্রমবর্ধিত গুরুত্বে আবির্ভূত। বস্তুত বলা চলে, সময় সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি ও চেতনার গভীরতা আমাদের বুদ্ধিগত অগ্রগতির পরিমাপ দেয়। কারণ, মানুষ যে অন্যসব প্রাণী থেকে ভিন্ন ও অনন্য, তার যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি—এর পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল, একমাত্র মানুষেরই কালিক চেতনা আছে। মানুষ এই চেতনালাভে সক্ষম হয়েছে তার মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের জন্য, যেখানে দশসহস্র কোটি নিউরোন রয়েছে, যারা আবার পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অসংখ্য সন্নিধি সংযোগ দ্বারা।

কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের জটিল জৈব গঠন একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত মাত্র। বস্তুত মস্তিষ্কের এই গঠনও মানুষ অর্জন করেছে বিবর্তনের ধারায়, নানা ঘটনার অভিঘাত এবং উদ্ভাবনমূলক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। সময়-সম্পর্কে ধারণা লাভের অন্তর্গত উপাদান যদি জুগিয়ে থাকে মানুষের মস্তিষ্ক, এই উপলব্ধির বাহ্যিক উপাদান এসেছে বাইরের ঘটনা-প্রবাহ থেকে। ঘটনার গতিশীলতা, পরিবর্তনীয়তা, রূপান্তর, পর্যায়ক্রম, কার্যকারণ সম্পর্ক, পারম্পর্য—এসবই আমরা সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করি সময়ের ধারণাকে ব্যবহার করে। সময়কে আমরা যে রৈখিক অগ্রগতিরূপে গণ্য করি, যা ঘড়ির কাঁটায় বা ক্যালেন্ডারের পাতায় চিহ্নিত হয়, তা আসলে গত তিনশো বছরের ঘটনা। যদিও সময়ের ভাবনা ও সময়কে ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত করার বিষয়টি সহস্র বছরের পুরোনো। গ্যালিলিও ও নিউটনের আগে সময় পরিমাপ্য ও ভৌত রাশিরূপে ঘটনার ব্যাখ্যায় প্রবেশ করে নাই। এদিক থেকে পদার্থবিজ্ঞানই মূল ভিত্তি সময়ের আধুনিকরূপ সৃষ্টিতে। এর আগপর্যন্ত সময় ছিল একটি অলৌকিক বা ম্যাজিকাল ধারণা। সময়কে এই ম্যাজিকাল বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করা তখনই মাত্র সম্ভব হয়েছে, যখন আমাদের সংস্কৃতি থেকে ম্যাজিক বা অলৌকিক ভাবনা দূর হয়েছে।

সময়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপণ, এমনকি সময়কে নির্ভুলভাবে হিসাব করার ঐতিহ্য অবশ্য অনেক পুরোনো। আধুনিক নির্ভুল সময় গণনা আমরা পেয়েছি ইউরোপ থেকে, যা প্রথম প্রবর্তন করেন পোপ গ্রেগরি ১৫৮২ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু এর সহস্রবছর আগে মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে সময়-গণনার প্রচলন ছিল তা গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের চেয়েও নির্ভুল ছিল। কারণ গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার যেখানে প্রতি দশ হাজার বছরে তিনদিন পিছিয়ে যায়, কারণ এর বছর সৌর বছরের তুলনায় একটু দীর্ঘতর, মায়া ক্যালেন্ডার দশ হাজার বছরে মাত্র দুদিন এগিয়ে যায়, কারণ এর বছর সৌরবছরের তুলনায় সামান্য ছোট।

মায়া সভ্যতায় সময় সূক্ষ্মভাবে হিসাব করা এবং সময়কে গুরুত্বের সঙ্গে তাঁদের ভাবনায় স্থান দেয়া হলেও সময়কে একটি অবিচ্ছিন্ন একক প্রবাহ ও সর্বজনীন ধারণারূপে গ্রহণ করেনি। সময় ছিল অনেকটা ম্যাজিকাল এবং প্রতিটি বছর, দিন বা মুহূর্ত পৃথকভাবে তাঁরা সম্পর্কিত করত ঘটনার সঙ্গে।

সময় সম্পর্কে একটি ধারণা খৃষ্টপূর্ব ৩৫,০০০ সাল থেকে চলে আসছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তা হল, সময় আবর্তক বা চক্রাকার। এর মূলে কাজ করেছে হয়ত প্রকৃতির কিছু পর্যায়ক্রমিক ঘটনা, যেমন ঋতু পরিবর্তনগুলো ফিরে ফিরে আসে বা আকাশের অনেক আলোকিত বস্তুর গতিপথই আবর্তক। কিন্তু একটি মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাও এক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে মনে হয়। তা হল, মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর ঘটনা এমন একটি ইচ্ছার জন্ম দিয়েছে, যেখানে মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করতে চেয়েছে। পুনর্জন্মের এই ধারণা ও বিশ্বাস এমন গভীরভাবে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে যে, তা ধর্ম, দর্শন, এমনকি বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকেও প্রভাবিত করেছে। দূর অতীতেও মানুষ যে পুনর্জন্মের বিশ্বাস করত তার স্বপক্ষে প্রমাণ মিলেছে পুরোনো কবরের মধ্যে মৃতের পছন্দের জিনিসপত্র তার মৃতদেহের সঙ্গে সাজিয়ে রাখার ঘটনায়।

কৃষিসভ্যতা ও আধুনিক ঘড়িনির্ভর নাগরিক জীবন সময়ের আবর্তক ধারণাকে জোরদার করেছে। খৃষ্টধর্মে সময়ের রৈখিক ধারণা কিছুটা প্রতিষ্ঠা পায় সময়ের আবর্তক ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে। মধ্যযুগে সময়ের এই ধারণার মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয় ওঠে। সময়ের ধারণার ক্রমবিকাশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বেশ জটিল ও গভীর ও দীর্ঘ। এই বইয়ে সেই বিস্তারিত ইতিহাসে যাবার অবকাশ নেই। বস্তুত ধর্ম, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য মানুষের ভয়, প্রত্যাশা, কল্পনা ও সৃজনশীলতার অভিব্যক্তিরূপে সময়ের ধারণাকে রূপান্তরিত করেছে দীর্ঘ সময় ধরে, যার প্রভাব এখনো বিদ্যমান সাধারণ্যে। এই বইতে মূলত বিজ্ঞানিক ভাবনা ও প্রযুক্তির ব্যবহার সময়কে যেভাবে রূপ দিয়েছে আমাদের উপলব্ধি ও উপযোগের ক্ষেত্রে, তাই শুধু তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কেপলার সর্বপ্রথম সময়কে প্রাণবাদ ও ম্যাজিকাল ধারণা মুক্ত করে মহাবিশ্বকে যান্ত্রিক ঘড়ির বৈশিষ্ট্য আরোপ করলেন। এই ধারণার বিকাশ ঘটালেন ডেকার্তে, গেলিলিও, রামফোর্ড প্রমুখ। এরা সময়কে মানুষের সাবজেক্টিভ ভাবনামুক্ত করে একটি স্বাধীন ও পৃথক বৈজ্ঞানিক এবং নৈর্ব্যক্তিক বিষয়রূপে দাঁড় করালেন। সময় নিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরেই দার্শনিক বিতর্কের সূচনা ঘটে। যেমন, ফ্রান্সিস বেকন সময়ের রৈখিক অগ্রগতির ধারণায় বিশ্বাস করলেও, নিউটন সময়কে আবর্তক

ভাবতেন এবং বিশ্বাস করতেন বিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংসের পর্যায়ক্রমিক ঘটনার ভিতর দিয়ে চলবে। সময়ের রৈখিক ধারণার সমর্থক ছিলেন লাইবনিজ, ব্যারো এবং দার্শনিক লক। নিউটন যেখানে মহাকর্ষের নিয়ম ব্যবহার করে গ্রহদের গতিপথ ব্যাখ্যা করতেন, সেখানে সময় এর আবর্তক বা চক্রাকার বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত। কিন্তু এই সৌরজগৎ একটি বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এমন ধারণা পোষণ করেন ডেকার্তে, কান্ট এবং বিশেষ করে জেমস্ হাটন। সময়ের রৈখিক গতির চিত্র সমর্থন করেন তাঁরা।

সময়ের ধারণা সৃষ্টিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-দার্শনিকের মধ্যে আপাত এই পার্থক্য দেখা গেলেও এর আড়ালে একটি গভীরতর মিল লক্ষণীয়। তা হল, সময়কে অধিবিদ্যক ও ম্যাজিকাল ধারণা থেকে ভৌত ও অবজেক্টিভ রাশিরূপে প্রকৃতির নিয়ম ব্যাখ্যায় ব্যবহার করতে গিয়ে সময় হয়ে পড়ল ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। সময়কে কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যায় পরিমাণগতভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে স্বভাবতই ঘটনার প্রকৃতি সময়ের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে চাইবে। অবশ্য নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানে সময়কে বস্তু ও ঘটনানিরপেক্ষ ধরে নেয়া হয়েছিল দার্শনিকভাবে। কিন্তু আমার মতে সেটা ছিল বৈজ্ঞানিক কাঠামোর বাইরে থেকে একধরনের মানসিক জড়তার ফসল। কিন্তু সময়ের স্বরূপ যে ব্যাখ্যাত ঘটনার স্বরূপ দ্বারা নির্ধারিত হবে, সেই বাস্তবতা অভিন্নভাবে বিজ্ঞানীরা সবাই সৃষ্টি করেছেন। এখানেই প্রছন্নভাবে তাঁদের মধ্যে পদ্ধতিগত মিল রয়েছে। এর ফসল আমরা দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে।

সময় সম্পর্কে ধারণা লাভে ও আকর্ষণ সৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় প্রভাব রেখেছে পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। কারণ, সময়ের ছাপ বহন করে ঘটনা। আমরা বিশেষ মুহূর্তকে মনে রাখি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু আমরা যে সময়কে পরিমাপ করতে পারি, তার মূল ভিত্তি ঘটনার পর্যায়ক্রম। আবর্তক সময়ের ধারণাও এসেছে পর্যায়ক্রমিক ঘটনা থেকে। পৃথিবীর আপন অক্ষের উপরে পাকখাবার যে পর্যায়ক্রমিক গতি তা সময়-মাপার একটি একক দিয়েছে, দিন-রাত্রি রূপে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পর্যাক্রমিক আবর্তন গতি দিয়েছে বছরের হিসাব। পরমাণুর কম্পন থেকে এসেছে পারমাণবিক ঘড়ি।

বাহ্যিক ঘটনার সময় বিচার ও সময় মাপার ফলে আর-একটি বড় অগ্রগতি হয়েছে। তা হল, সময় অলৌকিক বা সবজেক্টিভ ধারণা থেকে নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেক্টিভ ধারণায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সময় কি অনন্ত অথবা সময় ক্ষণকালীন ও অস্থায়ী? এ-প্রশ্ন নিয়ে গ্রিক দার্শনিকরা অনেক বিতর্কের অবতারণা করেছেন। আমরা দেখব এ-প্রশ্নের জবাব আমরা পেতে পারি অন্তর্গত ভাবনা থেকে নয়, বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ থেকে।

মহাবিশ্ব পর্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ভিতর দিয়ে অনন্তকাল টিকে থাকবে অথবা বর্তমানের প্রসারণ প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যাবে মহাশূন্যে, তা শুধু আগামীদিনের পর্যবেক্ষণ নির্ধারণ করবে হাবল্-এর ধ্রুবকের মান থেকে। আসলে মহাবিশ্বে মোট বস্তুর পরিমাণ একটি ক্রান্তিক মানের কম হলে মহাবিশ্ব বর্তমানের প্রসারণ-পর্যায় থেকে সঙ্কোচন-পর্যায়ে আসবে। এবং স্পন্দনশীল মহাবিশ্ব অনন্তকাল টিকে থাকবে। অন্যদিকে মহাবিশ্বের মোট ভর যদি এই ক্রান্তিক মান অতিক্রম করে, তা হলে সীমিত হবে মহাবিশ্বের জীবন। পুরো বিষয়টি যথা গ্যালাক্সিদের পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার গতি জানা বা মহাবিশ্বের মোট ভর জানা—একটি পর্যবেক্ষণের ব্যাপার।

সময় সসীম অথবা অসীম তার জবাব নির্ভর করছে সেক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ওপরে। অবশ্য এখানে প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের কথাও ভাবতে হবে। কারণ, প্রতিটি পর্যবেক্ষণ-যন্ত্র ও পর্যবেক্ষণ-কৌশল, সেইসঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তের ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে আনুষঙ্গিক তত্ত্ব।

ফরাসি বিজ্ঞান-দার্শনিক ওগুস্ত কোঁৎ সভ্যতাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেন। প্রথমে ধর্মের যুগ, এরপর দর্শনের যুগ এবং শেষে ধনাত্মক বিজ্ঞানের যুগ। তাঁর ধারণার কিছুটা অভিশ্রুতি ঘটিয়ে বলতে পারি—সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণারও এই ধরনের রূপান্তর আমরা দেখতে পাই। সময় নিয়ে আধিবিদ্যক চিন্তা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে সময়কে ব্যবহার এই প্রথম পর্যায়টির দৃষ্টান্ত। জীবন, জন্ম-পূর্ব এবং মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের ধারণা যথাক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকাল রূপে ধর্মগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এরপর সময়ের ধারণাকে দার্শনিকরা বিশ্লেষণ করেছেন কার্যকারণ-সম্পর্ক উদ্ঘাটনে।

বস্তুত নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানে সময় সম্পর্কে যে স্বীকার্যগুলো গৃহীত হয়েছে, যথা সময় চিরন্তন সময়ের শুরু বা শেষ নেই। সময়কে সীমাহীনভাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। সময় কোনো ঘটনা বা বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হয় না—এসবই দার্শনিক ভাবনার অংশরূপেই আসে। পরবর্তীতে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব, পরীক্ষালব্ধ অভিনব সব উপলব্ধি বিজ্ঞানীদের মনে নানা প্রশ্ন জাগায় সময় সম্পর্কে নিউটনীয় স্বীকার্যগুলোর।

সময় যখন ঘটনাপ্রবাহের কার্যকারণ ব্যাখ্যায় শুধু নয়, কালনির্ভর ঘটনাবলির গাণিতিক সম্পর্ক উদ্ঘাটন ও কার্যকারণের নিয়ম প্রকাশে পরিমাপযোগ্য রাশিরূপে উত্তরণ লাভ করল, তখন তা দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানীদের মতে ধনাত্মক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হল। সময় যত জটিলভাবে বিজড়িত হয় নানা ঘটনার সঙ্গে, উপলব্ধির দিক থেকে সময় তত গভীরতা ও সূক্ষ্মতা লাভ করেছে। প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটনে আবিষ্কৃত প্রতিটি তত্ত্বই সময় সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি দিচ্ছে।

প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ম থেকে পাওয়া সময়ের ধারণাগুলো ততটাই পরস্পর থেকে ভিন্ন, যতটা ভিন্নতা বা সমন্বয়হীনতা রয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যায় আবিষ্কৃত নিয়মগুলোর মধ্যে। আমরা দেখব নিউটনীয় বিজ্ঞানে একটি মুহূর্তের বিশ্ব বলে সম্পূর্ণ স্থানিক বিশ্ব আমরা ভাবতে পারতাম। কিন্তু আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব সমন্বয় ঘটিয়ে যে চার-মাত্রিক স্থান কাল সন্ততির ধারণা সৃষ্টি করেছে, সেখানে কালনির্ভর স্থান নেই। ফলে 'এখন সেখানে' এবং 'তখন এখানে' বলে কোনো ধারণা অর্থ বহন করে না। বলতে হবে 'এখন এখানে' এবং 'তখন সেখানে'। তেমনি তাপবলবিদ্যায় অসংখ্য কণিকা যেখানে শৃঙ্খল অবস্থা থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় যায়, সেখানে প্রক্রিয়াটি প্রত্যাবর্তী নয়। অর্থাৎ সময় এর দিকনিরপেক্ষতা হারায়।

নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের এলাকায় ও মৌলিক কণিকাগুলোর আচরণে সময় ধরা দেয় নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে। সময়ের প্রতিসাম্যতা অর্থাৎ সময়কে উল্টোদিকে প্রবাহিত করলে সমীকরণের যে নিত্যতা বজায় থাকার কথা তা এখানে ভেঙে পড়ে। নতুন সব প্রতিসাম্যের নিয়ম, যথা প্যারিটি প্রতিসাম্য অর্থাৎ একটি কণিকা ও আয়নায় তার প্রতিবিম্বকে একত্রে হিসাবে আনলে নিত্যতা বজায় থাকবে, এমন একটি উপলব্ধি আমরা পাই। এতেও সার্বিক প্রতিসাম্যের নিয়ম রক্ষা পেল না। ফলে, চার্জ প্রতিসাম্য অর্থাৎ

বৈদ্যুতিক চার্জ ও অন্যান্য চার্জ যথা স্ট্রেঞ্জনেস (Strangeness)-কে উল্টে দিয়ে যে প্রতিকণিকা পাওয়া যায় তা হিসাবে আনতে হবে। অর্থাৎ সার্বিক সংরক্ষণের নিয়ম যদি পেতে হয় তাহলে সময়, প্যারিটি ও চার্জ প্রতিসাম্যকে একত্রে ব্যবহার করতে হবে যা T C P প্রতিসাম্যরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কৃষ্ণবিবরের মধ্যে যখন প্রবেশ করি আমরা, তখন আবার নতুন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। কৃষ্ণবিবরের কেন্দ্র কোনো স্থানিক বিন্দু নয়, কালিক বিন্দু—এই অর্থে যে, সময় এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সময়ের কি শুরু বা শেষ আছে? এ প্রশ্নের একটি গ্রহণযোগ্য জবাব যখন আমরা পেয়ে যাই মহাবিশ্বের উদ্ভব সম্পর্কে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে, এরপরই চলে আসে স্ট্রিং-তত্ত্বের নতুন সম্ভাবনা, যেখানে শুরুর আগেও শুরু আছে—সময়ের এমন ধারণা পাই। এই স্বীকার্য লঙ্ঘিত হল।

আমরা দেখব আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব, কোয়ান্টাম সংখ্যায়নিক বিদ্যা, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, কৃষ্ণবিবরে আপেক্ষিকতার সাধারণতত্ত্ব ও কোয়ন্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ এবং সবশেষে স্ট্রিং-তত্ত্বে সময় নতুন সব বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করছে।

সময়কে তাই বুঝতে হবে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির আলোকে এর বিবর্তনের ধারায়। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি যত সমন্বিত হবে, সময়ের ধারণায় যে বৈচিত্র্য, তা তত অভিসারী হবে। কোনোদিন একীভূত তত্ত্ব যদি প্রকৃতির সবগুলো বলকে সমন্বিত করতে পারে এবং প্রকৃতির সব ঘটনাকে একটি সমীকরণে আনা যায়, তখন হয়তো সময়ের একটি একক অভিন্ন চিত্র সম্ভব হবে।

পাঠক যদি বইটি পড়ে বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন এই ভেবে যে, সময় কী? এর কোনো সহজ ও সুনির্দিষ্ট জবাব পাওয়া গেল না, তাহলে তার জন্য সান্ত্বনা হল : সময়ের ধারণা যদি সম্পূর্ণ বোধগম্য হত, সময় নিয়ে নতুন কোনো প্রশ্নই যদি না থাকত, তাহলে আগামী দিনগুলোতে সময় নিয়ে ভাবার ও গবেষণার কোনো সুযোগ থাকত না। নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানে বা ল্যাপলেসের কার্যকারণের নিশ্চয়তার নীতিতে বর্তমানের সব তথ্য জানা থাকলে সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব। ভবিষ্যৎ সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে পূর্বনির্ধারিত। ভবিষ্যৎ অতীতের মধ্যে বন্দি, যেমন বর্তমানও।

কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নীতি অনুসারে সময় একটি স্বাধীন সজীব গতিশীল অনির্বচনীয় এক রাশি, এই অর্থে যে, আগামী দিন কী ঘটবে তা জানতে হলে আগামী দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কালনিরপেক্ষ সমীকরণ দিয়ে ভবিষ্যতের সব ঘটনা হিসাব করা যাবে না। সময়কে এভাবে জানাও এক নতুন উপলব্ধি সময়-সম্পর্কে। সময় যে কুয়াশাবৃত প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছিল আদিম মানুষের মনে, সেখানে থেকে আমরা অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু এখানে অনেক রহস্য অনুদ্ঘাটিত।

বইটি পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে হতে পারে অনেক কথা বারবার ঘুরে এসেছে। কিন্তু আসলে সেটা পুনরাবৃত্তি নয়, যদিও অনুরূপতা আছে। উঁচু পাহাড়ে ওঠার যে ট্রেনের যাত্রা তা পাক খেয়ে চলে। এই ট্রেনে চড়ে মনে হতে পারে ট্রেনটি চক্রাকারে ঘুরছে। আসলে প্রতিপাকে ট্রেনটি কিছুটা উচ্চতা লাভ করে। সময় সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি

তেমনি ধাপে ধাপে গভীরতা অর্জন করেছে নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পথ ধরে। প্রতিটি নতুন তত্ত্ব সময়ের অভিধা বদলে দিয়েছে, এর সঙ্গে নতুন অর্থ সংযোজন করে। সময়ের শরীর থেকে যেন শব্দগুলো এই নতুন অর্থ শোষণ করে নেয়। পরিশেষে পাঠকের সঙ্গে একটি অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারি, তা হল : বইটি লেখা শেষ করে, আমার নিজের মনে হয়েছে সময় আসলে এক প্রহেলিকা। বইটি পড়া শেষ করে পাঠকের যদি একই উপলব্ধি জাগে, অবাক হব না। একটি ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। রিচার্ড ফাইম্যান কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উপরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতাদের উল্লেখ করে বললেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিশ্বের নয়জন মাত্র বোঝে বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পৃথিবীর কেউই বোঝে না। "অতএব আমার বক্তৃতা বুঝতে পারার জন্য দুঃখ করবেন না। শুধু উপভোগ করুন"। সময় প্রসঙ্গে হয়তো একই কথা সত্যি।

সূচিপত্র

সময় প্রসঙ্গে ১৫
সময়-নিরূপণ যুগে-যুগে ২৫
বৃহৎ সময় ২৮
ক্ষুদ্র সময় ৩১
প্রাথমিক ঘড়ি ৩৭
আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আলোকে নিউটনীয় নানা ধারণার রূপান্তর ৪৫
সময়ের উপরে আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের প্রভাব ৭৭
কৃষ্ণবিবর ও সময় ৮৯
সময় কি পেছন দিকে যেতে পারে? ১১০
সময়ের শুরু নিয়ে নতুন প্রশ্ন : স্ট্রিং তত্ত্বের আলোকে ১২০
সময়ের ধারণা সৃষ্টিতে নানা সূত্র ১২৮
সময়ের পিছন দিকে ভাবা ১৪২
মনস্তাত্ত্বিক সময় ১৫৩

সূর্যোদয় দেখে ঘুম থেকে জাগি। ঘড়ি দেখে অফিসে যাই। ক্যালেন্ডারে ছুটির তারিখটি চিহ্নিত করে রাখি। শীতের ফসলের জন্য কৃষক দিন গোনে—কবে পৌষ আসবে! রাখাল প্রতীক্ষা করে গোধূলি-লগ্নে গৃহে ফিরবে বলে। এ সবকিছুতেই সময়ের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট।

যখন প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করেন অতীতকে জানতে, ঐতিহাসিক অতিবাহিত সময়ের মধ্যে ঘটনার বিন্যাস খোঁজেন, অথবা ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে আমরা যখন পরিকল্পনা করি, ফসল বুনি, তখন সময় অতীত অথবা ভবিষ্যৎ হয়ে আমাদের বর্তমান চিন্তায় প্রবেশ করে।

সময় চলে যাচ্ছে বলে মানুষ দুঃখ করেছে চিরকাল। তুলির আঁচড়ে দুর্লভ মুহূর্তকে ধরে রাখতে প্রয়াসী হয়েছে শিল্পী। ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা বা ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে কবি কবিতা রচনা করেছে। সময়ের প্রভাবমুক্ত হতে দার্শনিক সন্ধান করেছে সময়-নিরপেক্ষ সত্যের। আর বিজ্ঞানী? সে জানতে চেয়েছে সময়কে ঘটনার মধ্যে, কখনো পৃথিবীর বিবর্তনে, মহাবিশ্বের বিস্ফোরণে, কখনো পারমাণবিক ঘটনায়। সময়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তার অবলম্বন হয়েছে কখনো পর্যবেক্ষণ, কখনো গাণিতিক সূত্র।

কালনির্ভরতা বলতে আমরা যা বুঝি তা বস্তুত সব গতিশীল বস্তুতেই উপস্থিত। নদীর জলের প্রবাহে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণে, ঘড়ির কাঁটার সচলতায়, অণু-পরমাণুর কম্পন অথবা এর আভ্যন্তরিক ইলেকট্রনের পরিক্রমায় কালের প্রভাব বিদ্যমান। কারণ বস্তুর স্থান পরিবর্তন সময়ের মধ্যেই ঘটে আর এই পরিবর্তনের হারকেই আমরা গতি বলি। তবু নদীর জল, ঘড়ির কাঁটা, গ্রহ-নক্ষত্র, অণু-পরমাণু এসবই অচেতন জড়বস্তু। জড়বস্তু তার নিজস্ব চেতনায় সকালকে দুপুর থেকে পৃথক করতে পারে না অথবা গ্রীষ্মকে হেমন্ত থেকে। যাকে আমরা কালচেতনা বলি তা শুধু প্রাণিজগতেই পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আবির্ভাবেরও শতকোটি বছর আগে থেকে উদ্ভিদের মধ্যেও কালের প্রভাব চলে আসছে। বস্তুত প্রাণিজগতের প্রতিটি উদ্ভিদ বা জীবই এক-একটি কালযন্ত্ররূপ। কারণ একটি বিশেষ কালক্রমের মধ্যদিয়ে এদের জন্ম, সংবর্ধন ও অবক্ষয়। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটি বিশেষ সময়ের পর্যায়ে এদের

অস্তিত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ কনভোলভোলাস সময় মেপে ঠিক তিনটায় পাপড়ি মেলে, ওয়াটার লিলি ফোটে সাতটায়, মেরি গোল্ড ন'টায়। আসলে প্রতি ঘণ্টার নিয়মে এখন ফুল-ফোটা থেকে কেউ কেউ পুষ্পঘড়ির বাগান তৈরি করেছেন ইউরোপে। এই সময়সচেতনতা থেকেই সোনালি টিট্রির পাখি নির্ভুল নিয়মে প্রশান্ত সাগর পাড়ি দেয় দু-হাজার মাইল দূরের হাওয়াই দ্বীপে বছরের বিশেষ সময়ে।

প্রাণিবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখছেন যে, প্রাণিব্যবস্থায় এই যে কালচেতনা, তার মধ্যে দুটো জিনিস লক্ষ্য করার আছে। একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ঘড়ি যা একটি পর্যায়কালে বিশিষ্ট এবং অন্যটি হচ্ছে বাহ্যিক। বাইরের সময়ের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সময়ের পর্যায়কে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেবার ব্যাপারে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আভ্যন্তরিক পর্যায়কাল প্রত্যেক গাছের জন্যে ভিন্ন, এমনকি একই জাতের গাছ একই আবহাওয়ায় বড় হয়েও পর্যায়কালে পৃথক হতে পারে। এই পর্যায়কাল সামগ্রিক গাছটির ব্যাপার নয়, আরো সূক্ষ্ম জীবকোষগুলোর মধ্যে এর নিয়ন্ত্রণ ঘটে। বাহ্যিক পরিবেশ এই আভ্যন্তরিক পর্যায়কালকে বদলায় না, শুধু নতুন করে মিলিয়ে নেয়—যেমন আমরা প্রয়োজনবোধে একটি ঘড়ির সময়কে মিলিয়ে নিতে পারি এর পর্যায়কালকে অপরিবর্তিত রেখে।

বাহ্যিক জগতের সঙ্গে এই-যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠা এবং আভ্যন্তরিক একটি কালের ছন্দে নিরবধি সময় মেনে চলা— একেই আমরা প্রাণিজগতের কালচেতনা বলতে পারি। প্রাণীদের মধ্যে এমন একটি ব্যবস্থা আছে বলেই 'জীব ঘড়ি' কথাটি প্রাণিবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন।

কিন্তু সময়-সম্পর্কে সচেতন বুদ্ধিগত চিন্তা সহজাত কালচেতনারও উন্নততর রূপ। নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কালকে যাচাই করার মনীষিতা মানুষই শুধু অর্জন করেছে দীর্ঘদিনের সাধনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভেতর দিয়ে।

একটি লিভারে চাপ দেয়ার সঙ্গে খাবার পাবার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেখা গেছে—যতক্ষণ এই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ত্রিশ সেকেন্ডের কম ততক্ষণ পর্যন্ত ইঁদুর এই সম্পর্কের ব্যাপারটা মনে রাখতে পারে অর্থাৎ লিভার চেপে খাবার সংগ্রহ করে। কিন্তু ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি ব্যবধান হলে দুই ঘটনার মধ্যেকার সম্পর্ক ইঁদুর বুঝতে পারে না। অর্থাৎ ইঁদুরের ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি ত্রিশ সেকেন্ডের কম। বানরের বেলায় এই অগ্রিম চিন্তা নব্বই সেকেন্ড পর্যন্ত প্রসারিত। এদিক থেকে মানুষের বাইরে সবচাইতে উন্নত জীব হচ্ছে শিম্পাঞ্জি। সময়-সম্পর্কে এদের সচেতনতা অনেকটা আদিম মানুষের মতো। এর প্রমাণ ওরা পাথর-ভাঙার জন্যে অস্ত্র তৈরি করতে পারে এবং এমন সব মানসিক কৌশল ব্যবহার করে থাকে যা অঙ্ক কষার মতোই বুদ্ধিনির্ভর।

একটি ছয় বছরের শিশু সবকিছু সম্পর্কে সচেতন হয়েও নিকট অতীত ও নিকট ভবিষ্যতের বাইরে ভাবতে পারে না। এক অর্থে সে বর্তমানের মধ্যে বন্দি।

বর্তমানকে ঘিরে একটি ক্ষুদ্র সময়রেখার উপরে তার সচেতন অস্তিত্ব। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার আগের বর্তমানটি চলে যায় অতীতে, আর ভবিষ্যৎ ছিল তেমন একটি কালবিন্দু বর্তমান হয়ে ওঠে।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সময়সচেতনতার যেমন সম্পর্ক আছে, মানুষের ক্রমবিকাশের সঙ্গেও সময়সচেতনতার তেমন একটি সম্পর্ক আছে। মানুষের মস্তিষ্ক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসঙ্গে ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে তার সময়চেতনা। চার লাখ বছর আগের যেসব আদিমানব চীনে বাস করত তারাও আগুন ব্যবহার করত এবং সেজন্যে আগুন তৈরির ইন্ধন সংগ্রহ করে রাখত আগে থেকেই। প্রস্তরযুগের মানুষ যেসব অস্ত্র নির্মাণ করেছে শিকার করার জন্যে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে অনাগত সময় সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা তারা অর্জন করেছিল। সভ্যতার অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার ব্যবহার, গণিতের চর্চা মানুষের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করেছে। ক্রমশ উন্নততর প্রজ্ঞা ও কৌশলে মানুষ সময়কে মাপতে শিখেছে দীর্ঘতর বিস্তারে এবং সূক্ষ্মতর এককে। প্রশ্ন উঠেছে : সময় কী? এর কি শুরু আছে অথবা শেষ? সময়ের প্রবাহ কি একমুখো? এর গতিকে কি মন্থরতর অথবা স্তব্ধ করা যেতে পারে?

আমরা দেখব সময়ের সঙ্গে এসব প্রশ্নের জবাব কেমন করে বদলে গেছে, এমনকি প্রশ্নগুলো পর্যন্ত। আধুনিক সভ্যতা তাই সময়ের বিবর্তনে শুধু ঘটেনি, ঘটেছে সময়-সম্পর্কে মানুষের ধারণার বিবর্তনেও।

সময় কী? এ প্রশ্ন তুললেই আমাদের মনে পড়ে ঘড়ির কথা। ঘড়ির কাঁটাটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে আর কাঁটার অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে সময়কে মাপছি।

ঘড়ি যদি বন্ধ হয়ে যায়? তখন সূর্য থাকবে আকাশে অথবা রাতের বেলা নক্ষত্র। এছাড়া আছে গাছের ফুল ফোটা, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, পরমাণুর কম্পন, তেজস্ক্রিয় পরমাণুর রূপান্তর। কিন্তু এ সবকিছুতেই সময়ের সম্পর্ক গতির সঙ্গে, কোনো-না-কোনো পরিবর্তনের সঙ্গে। একক সময়ে যে সরণ তাকেই বলে গতি। ফলে সময়ের ধারণা ছাড়া গতিকে বুঝার উপায় নেই, অথচ সেই গতি দিয়েই সময়কে বুঝতে হচ্ছে। আসলে স্থান, কাল ও গতি—এই তিনের মধ্যে দুটোকে জানলে তৃতীয়টিকে জানা যায়। যখন বলি কোনো নক্ষত্রের দূরত্ব এক আলোকবর্ষ, তখন আসলে আলোর গতি ও ওই নক্ষত্র থেকে আলো আসতে যে-সময় লাগল তা থেকে দূরত্ব বের করছি।

স্থান কী? তা আমরা মোটামুটি অনুধাবন করতে পারি। এমনকি একে মাপতেও পারি একটি স্কেল দিয়ে সময় বা গতির ধারণা ছাড়াই। কিন্তু সময় কী? জানতে চাইলেই পাঠিয়ে দেয়া হয় গতি জেনে আসতে, গতিকে মাপতে গেলেই ফিরে আসতে হয় সময়ের কাছে। দুইয়ের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই সময়কে রহস্যময় করে তুলেছে।

সময় নিয়ে গোলকধাঁধার ব্যাপারটি বহুদিন আগে থেকে মানুষের জানা। এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেও সেন্ট অগাস্টিনাস বলেছিলেন, "কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে সময় কী?—মনে হয় জানি, কিন্তু জবাব দিতে গেলেই বুঝতে পারি জানি না।"

সময় নিয়ে গ্রিক দার্শনিকরাও একসময় এমন আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন যে শেষপর্যন্ত তাঁরা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন গতি বলে কিছু নেই। ফলে সময়ের ব্যাপারটাও অবাস্তব মায়া মাত্র।

গতি থেকেই যে সময়ের ধারণাটির জন্ম একথা প্রথম স্পষ্ট করে বলেছিলেন অ্যারিস্টোটল। কিন্তু গতিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল ভুল। যেমন, তিনি মনে করতেন হালকা বস্তুর চেয়ে ভারী বস্তু অধিক বেগে পতিত হয় এবং কোনো বস্তুকে গতিশীল রাখতে ক্রমাগত বল প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। বেগ এবং বলের সঠিক সংজ্ঞাও অ্যারিস্টোটল দিতে পারেননি।

অ্যারিস্টোটলের ভ্রান্ত ধারণাগুলো কয়েকশো বছর ধরে বিজ্ঞানের জগতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। গতিবিদ্যায় নিউটনের পূর্ববর্তীদের মধ্যে যাঁর অবদান সবচাইতে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন গ্যালিলিও। বিভিন্ন ঢালুতলের ওপর দিয়ে ধাতব বল গড়াতে দিয়ে এবং জলঘড়ির সাহায্যে সময় মেপে তিনি দেখালেন যে ঢাল বাড়িয়ে দিলে গতির হার বাড়তে থাকে। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে গতিবিদ্যায় কোনো বস্তুর গতি, অর্থাৎ দূরত্ব অতিক্রমণের হারটাই একমাত্র প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নয়, কী হারে গতি পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ ত্বরণটাও গুরুত্বপূর্ণ। ত্বরণের এই ধারণাটি সে-সময় ছিল বিপ্লবাত্মক। গ্যালিলিওর পরীক্ষালব্ধ ফল ও ত্বরণের ধারণাকে কাজে লাগালেন নিউটন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বলবিদ্যার সূত্র আবিষ্কারে।

আপেক্ষিক গতির ধারণাটি নিউটন অত্যন্ত সাবলীলভাবে উপস্থিত করলেন। দুটো বস্তুর মধ্যে যদি আপেক্ষিক গতি থাকে তাহলে পরম করে বলার উপায় নেই কোন্‌টা গতিশীল, কোন্‌টা স্থির অর্থাৎ সরলরেখায় অপরিবর্তী গতিমাত্রেই আপেক্ষিক। পরম গতি বলে কিছু নেই।

এখানে একটি বড় প্রশ্ন দেখা দিল। সময় মাপার জন্যে আমরা গতিকে ব্যবহার করছি—সেই গতি যদি আপেক্ষিক হয়, সময়ও কি আপেক্ষিক? নিউটন এ প্রশ্ন প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি বললেন, গতির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে কিন্তু সময় নিরপেক্ষভাবে অপরিবর্তী ধারায় প্রবাহিত। সময়ের গতিধারার কোনো রদবদল ঘটে না। গতি দিয়ে সময় মাপা যেতে পারে কিন্তু সময়ের সঙ্গে গতির কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই। সময়কে এমন পরম, নিরলম্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে বাস্তব সুবিধা ছিল কিন্তু এর সমর্থনে পরীক্ষালব্ধ সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না।

সময় যদি এমন পরম ও নিরপেক্ষ হয় তাহলে তা মাপব কেমন করে? নিউটনে মনে করেছিলেন ঘূর্ণনগতি থেকে তা করা যাবে। ঘূর্ণনগতিকে তাঁর পরম

মনে হয়েছিল এবং প্রস্তাব করেছিলেন যে পানিভর্তি বালতিকে পাকানো দড়িতে ঝুলিয়ে ঘুরতে দিলে, পানির উপর দিকে উঠে আসার পরিমাণ থেকে পরম সময় মাপা সম্ভব হবে। কিন্তু নিউটনের নিরপেক্ষ ঘূর্ণনগতির ধারণাটি নির্ভুল ছিল না এবং পরবর্তী অনেক বিজ্ঞানীর চোখে তা ধরাও পড়েছিল। তবু সময়ের পরমতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। নিরপেক্ষ অপরিবর্তী ধারায় সময় চলছে—এই ধারণাটি একটি স্বতঃসিদ্ধের মতো প্রতীত হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী সবার মনে।

সময় দিয়ে দার্শনিকরা যতই তাত্ত্বিক আলোচনায় গেলেন, সময় ততই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক রহস্যময় ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হল। নিরুপায় হয়ে বিখ্যাত দার্শনিক কান্ট মানুষের জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। এক হল অভিজ্ঞতালব্ধ আর অন্যটি হল অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। স্থান ও সময়কে তিনি অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব বা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বলে চালাতে চাইলেন।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান নিয়ে কথা বলতে রাজি নয়। তাঁদের সব তথ্যই পরীক্ষিত হতে হবে, সব তত্ত্বই শেষপর্যন্ত পরীক্ষানির্ভর।

ফলে সময় কী? এ প্রশ্নের এমন দার্শনিক জবাব তাঁদের মনঃপূত হল না। এই অবস্থার পরিবর্তন এল বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আইন্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে। মজার ব্যাপার হল, যে পরীক্ষার ওপরে ভিত্তি করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের জন্ম তা সরাসরি সময়-সম্পর্কিত ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা ভাবতেন আলো হচ্ছে ইথারতরঙ্গ। এই ইথার সর্বব্যাপী। পৃথিবী যেহেতু এই ইথার-রাজ্যে ঘুরছে, একটি ইথারস্রোত নিশ্চয়ই তাহলে সৃষ্টি হবে। আলোর গতির ওপরে তার একটি প্রভাবও পড়বে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির দিকে আলোকতরঙ্গ এই ইথারস্রোতের প্রতিকূলে প্রবাহিত বলে একটু মন্থর হয়ে যাবার কথা এবং আহ্নিক গতির বিপরীতদিকে একই কারণে একটু দ্রুততর হওয়া প্রত্যাশিত। ১৮৮৭ সালে দুজন বিজ্ঞানী—মাইকেলশন ও মরলি আলোর গতির এই পার্থক্য পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন।

তাহলে কি ইথার নেই? আলোর গতি কি কারো ওপরে নির্ভর করে না? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নানারকম তত্ত্ব উপস্থিত করলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কেউই সময়ের নিরপেক্ষ পরম সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন না। এর দীর্ঘ বিশ বছর পর এল আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব। আইনস্টাইন বললেন, আলোর গতি যে পৃথিবীর গতির ওপরে নির্ভর করছে না, এটা একটা পরীক্ষালব্ধ ফল। এই ঘটনাকে গভীর তাৎপর্যে নিতে হবে। আলোর গতির অপরিবর্তিতা ব্যাখ্যা করতে আইনস্টাইন বললেন, সময়কে নিরপেক্ষ ধরে নেয়ার কোনো পরীক্ষালব্ধ ভিত্তি নেই। সময় গতির ওপরে নির্ভর করে, এটা ধরে নিলেই সব চুকে যায়। স্বভাবতই কথাটা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিগোচর নয়। কেমন যেন অস্বাভাবিক, অদ্ভুত মনে হয় ভাবতে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বা বিচারে যা অস্বাভাবিক মনে হয় তা যে

সবসময় ভুল নয় তার দৃষ্টান্ত তো আরো আছে। রেললাইন ধরে হাঁটার সময় আমাদের কি মনে হয় লাইনদুটো সমান্তরাল? কিন্তু মেপে প্রমাণ করতে হয় আমাদের সহজাত ধারণাটি ভুল। গতি যে আপেক্ষিক তাই কি আমাদের সাধারণ বিচার মানতে চায়?

আমরা যখন বলি ট্রেনে চড়ে তিরিশ মাইল বেগে যাচ্ছি—কথাটার অর্থ কী? অর্থ হল পৃথিবীর তুলনায় ট্রেনটি তিরিশ মাইল বেগে যাচ্ছে! কিন্তু পৃথিবী তো স্থির হয়ে নেই, সেও ঘুরছে অক্ষের ওপরে, সেইসঙ্গে ছুটছে কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তখন ভাবব ঠিক আছে পৃথিবীর গতির সঙ্গে আমার ট্রেনের গতি যোগ করে ট্রেনের পরম গতি জানতে পারব। কিন্তু পৃথিবীর গতিও ঠিক করছি সূর্যের তুলনায় এবং সূর্যও স্থির হয়ে নেই। যদি মহাকাশে কোথাও কিছু স্থির হয়ে থাকত তাহলে তার তুলনায় আমাদের পরমগতি বের করতে পারতাম; কিন্তু মহাবিশ্বে কোনোকিছু স্থির হয়ে আছে কি না জানার উপায় নেই। কারণ যে-কোনোভাবে গতি বের করতে যাই তাই আপেক্ষিক গতি। তা হলে আমরা বুঝলাম পরম গতি বের করা সম্ভব নয়।

নিউটন কিন্তু এখানেই থামলেন না, তিনি এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, পরম নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই। পরম গতির ধারণাটি আসলে অর্থহীন—ভিত্তিহীন সহজাত মাত্র; বিজ্ঞানভিত্তিক বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক নয়। সময়ের বেলাতে এসে আইনস্টাইন একই ধরনের কথা বললেন। আমাদের মনে যে বদ্ধমূল ধারণা রয়ে গেছে যে সময়ের চলা কোনোকিছুর ওপরে নির্ভর করে না—আমি যত দ্রুতই ছুটি না কেন, আমার ঘড়ি চলুক আর নাই চলুক, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু যদি স্তব্ধ হয়ে যায়, সময় তবু চলবে নির্দিষ্ট গতিতে—এটি একটি সহজাত ধারণা। আমরা আগেই বলেছি নিউটনও এই ধারণা সমর্থন করেছিলেন, তবু এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

আইনস্টাইন বললেন : আমার ঘড়িতে আমি যে সময় দেখছি সেটা আমার সময় অন্য একজন যদি ভিন্ন এক কাঠামোতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আমার তুলনায় ছুটতে থাকে তাহলে তার ঘড়ির সময় আমার ঘড়ির সময়ের সঙ্গে মিলতেই হবে এমন কী প্রমাণ আছে? বরং যদি সময়কে গতির ওপরে নির্ভরশীল ধরে নেয়া যায় তা হলে আলোর গতি কেন অপরিবর্তী তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের আলোতে সময় কী? এ প্রশ্নের জবাব দাঁড়াল : আমার ঘড়িতে আমি যা দেখছি তাই আমার সময়। তা হলে আমার ঘড়ি আর তোমার ঘড়ি কি এক নয়? 'বিশ্ব সময়' বলে কি কিছু নেই? আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে এসব প্রশ্নের সোজা জবাব—'না'। যদি ভাগ্যক্রমে আমার এবং তোমার মধ্যে কোনো আপেক্ষিক গতি না থাকে তা হলে আমার ঘড়ি আর তোমার ঘড়ি একই সময় দেবে কিন্তু দুজনের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকলে দুজনের ঘড়ি ভিন্ন

সময় দেবে। তাহলে কার ঘড়ি আস্তে চলবে? আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র অনুসারে এর জবাব হল : আমার হিসাবে তোমার ঘড়ি মন্থর আর তোমার হিসাবে আমার ঘড়ি মন্থর। তাহলে কার ঘড়ি ঠিক? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে একটি বিশ্বঘড়ি দরকার যা বিশ্বের সময় বলে। তা যেহেতু নেই, আমাদের মেনে নিতে হবে দুজনার ঘড়িই ঠিক এবং তা নিজ-নিজ কাঠামোতে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনে পরম সময়ের ধারণাটি বদ্ধমূল থাকবে ততক্ষণই শুধু এসব জবাব বুঝতে অসুবিধা হবে।

এখন নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, ঘড়ি হাতে যদি দৌড় দিয়ে প্রমাণ করতে পারতাম আমার ঘড়ির তুলনায় অন্যের ঘড়ি ধীরে চলতে শুরু করেছে কি না, তাহলে বেশ মজা হত। আসলে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না শুধু এই কারণে যে সেক্ষেত্রে আমার গতি আলোর গতির সঙ্গে তুলনামূলক হতে হবে। আসলে আপেক্ষিক গতি যদি সেকেন্ডে সাড়ে আঠারো হাজার মাইল হয় তা হলেও সময়ের পার্থক্য হবে মাত্র এক-শতাংশের। অবশ্য আলোর গতিতে ছুটতে পারলে মনে হবে অন্যের ঘড়িটি চলছেই না।

আসলে এই দৌড়ের পরীক্ষাটা আমরা অন্যভাবে করে নিতে পারি। দেখা গেছে মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে একধরনের কণিকা মিয়ন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। প্রতি পাঁচ লাখ ভাগের এক ভাগ সেকেন্ডে এদের সংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে যায়। এই হিসাবে হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়া ও পাদদেশে ধরা পড়া মিয়নের সংখ্যার যে পার্থক্য হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। পাদদেশে যতগুলো মিয়ন-কণিকা পৌছার কথা তার অনেক বেশি ধরা পড়েছে। এর ব্যখ্যা হল : মিয়ন-কণিকাগুলো আলোর তুল্য গতিতে ছুটে আসে বলে এর নিজস্ব সময় আমাদের সময়ের তুলনায় অনেক মন্থর। ফলে ছুটন্ত এই মিয়ন-কণিকার আয়ু আমাদের ঘড়ির তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। হিসাবটি আপেক্ষিক তত্ত্বের সঙ্গে সুন্দর মিলে যায়। কারো হয়তো মনে হতে পারে তাহলে বেশ মজা। যদি আলোর গতিতে ছুটতে পারে মানুষ কোনোদিন, তাহলে সে অমর হবে। এ-ধরনের কল্পনার বিরুদ্ধে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে। যে-কোনো বস্তুকে আলোর কাছাকাছি গতিতে নিয়ে যেতে অসম্ভব বেশি শক্তির প্রয়োজন, কারণ দ্রুতগামী বস্তুর ক্ষেত্রে ভর বেড়ে যায়। সেও আপেক্ষিক তত্ত্বের হিসাবে। দ্বিতীয়ত, দ্রুতগতিতে ছুটলে আমার সময়টা অন্যের কাছে অবশ্য মন্থর মনে হবে, কিন্তু আমার নিজের কাছে তা মনে হবে না। ফলে আমি যদি ভীষণ দ্রুতগামী রকেটে করে ঘুরেও আসি, আমার কাছে কিন্তু আমার জীবন দীর্ঘ মনে হবে না। মনে হবে শুধু যদি অন্যের ঘড়িতে সেটা যাচাই করি।

আমরা কে না চাই কখনো-কখনো সময়ের পেছনদিকে ফিরে যেতে? পথের ঐ বৃদ্ধটি যদি যুবক হতে পারত! কিংবা ফিরে যেতে পারত আগের সেই কিশোর বা শিশুজীবনে! ভাঙা দালানটার ধসে-পড়া ইটগুলো পুরোনো জায়গায় ফিরে গিয়ে

একশো বছর আগের সেই বাড়িটা যদি তৈরি হত! এর জানালার ভাঙা কাচগুলো অবশ্য তখন ফিরে এসে আস্ত কাচটা তৈরি করত। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লোহাগুলোতে যে মরচে ধরেছে, তা বিপরীত বিক্রিয়ায় আরো সেই মরচেহীন লোহায় রূপান্তরিত হত। এমন অনেক কিছু।

আমরা দেখছি গতি ও পরিবর্তনের মধ্যদিয়েই মাত্র সময়কে আমরা বুঝতে পারি। গতি ও পরিবর্তন সময়ের মধ্যে হচ্ছে এটাই শুধু নয়, গতি ও পরিবর্তন ছাড়া সময়ের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণের কোনো বিকল্প পথ নেই। অন্তত বৈজ্ঞানিকভাবে নেই।

সময় কি পেছনদিকে যেতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে তাই বিশ্বের ঘটনাবলির দিকেই আমাদের তাকাতে হবে।

একটি দোলক-ঘড়ির দোলকটার দিকে তাকালে মনে হয় ওর গতিটা কেমন প্রতিসম। গতিটা উল্টো করে দিলে কোনো ক্ষতি হত না। গতিবিজ্ঞানের নিয়ম এতে বাদ সাধত না। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো যে আকাশে পরিক্রম করছে, ঘর্ষণহীনভাবে ওদের সবার গতি উল্টো করে দিলেও কোনো অসুবিধা হত না। আসলে কেউ যদি নভোমণ্ডলের একটি চলচ্চিত্র গ্রহণ করে প্রজেক্টারে উল্টো করে চালায়, তাহলে বোঝার উপায় নেই ওটা উল্টো। সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হবে গতিবিজ্ঞানের নিয়মে। একইভাবে পরমাণুর মধ্যে যে ইলেকট্রোন ঘুরছে তাদের গতি উল্টো করে দিলেও কোনো অসুবিধা হয় না। বিশ্বের বড় ও জটিল ঘটনাগুলো শেষপর্যন্ত অণু-পরমাণুর গতি ও চলাচল থেকেই সৃষ্ট। ফলে আণুবীক্ষণিক গতিগুলোকে বিপরীতমুখী করতে প্রকৃতির নিয়মের কোনো বাধা যদি না থাকে তাহলে বিশ্বের সবকিছুই উল্টোদিকে চলতে বাধা কী? গতি দিয়েই যখন সময়ের বিচার—গতি উল্টো হলে সময়ও উল্টোদিকে প্রবাহিত হবে।

এইখানে একটি নতুন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি আমরা—প্রকৃতির একটি নতুন নিয়মের। নিয়মটি হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্বের বা অনেক সংখ্যার। নিয়মটি অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া এবং এর মূল বক্তব্য হল : বিচ্ছিন্নভাবে কিছু-কিছু ঘটনার পূর্বানুবৃত্তি ঘটতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা মিলে যে যৌগিক ঘটনাসমষ্টি বিশ্বের যে ঘটনাপ্রবাহ তার পূর্বানুবৃত্তি নেই। অন্য কথায় বলতে পারি বিশ্বের বিশৃঙ্খলা বাড়ছে। আমার টেবিলের গোছানো বইগুলো ক্রমাগত বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব নিয়মে এলোমেলো বইগুলো গোছানো হয়ে যাবে না।

ব্যাপারটি বোঝার জন্যে আরো একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ভাবা যাক একটি মসৃণ মেঝেতে বেশ অনেকগুলো মার্বেল আছে। তার মধ্যে কয়েকটি মার্বেলই শুধু বেগবান, বাকিগুলো স্থির হয়ে আছে। ছুটাছুটির সময় থেমে থাকা মার্বেলের সঙ্গে সংঘর্ষে এই গতিশীল মার্বেলগুলোর গতিশক্তি ধীরে-ধীরে অন্য মার্বেলগুলো পেতে থাকবে এবং শেষপর্যন্ত সবগুলো মার্বেলের মধ্যে শক্তি ভাগাভাগি হয়ে যাবে। এই

এলোমেলো বিক্ষিপ্ত গতিশীল মার্বেলগুলো কি সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদের সব শক্তিকে দু-একটি মার্বেলকে ফিরিয়ে দেবে আবার? সম্ভাবনার নিয়ম বলছে : না—তা সম্ভব নয়। তাপপ্রবাহের ক্ষেত্রে এইরকম একটি ব্যাপারই আসলে ঘটে। যেখানে উত্তাপ বেশি সেখানে অণু-পরমাণুগুলো বেশি বেগবান অর্থাৎ বেশি গতিশক্তির অধিকারী। স্বল্প উষ্ণ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প গতিশক্তির অধিকারী কণিকার সঙ্গে সংঘাতে এরা শক্তি হারায়। এর অর্থ হল তাপ উচ্চ-উষ্ণতা থেকে নিম্ন-উষ্ণতায় প্রবাহিত হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু ঘটনামালা ক্রমাগত একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে যাচ্ছে, তাই সময়ও একদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সময় উল্টোদিকে প্রবাহিত হবার অর্থ দাঁড়াত—আমার হাত থেকে যে গ্লাসটি পড়ে ভেঙে গেল তা উল্টো ঘটনাপ্রবাহে ভাঙা কাচের টুকরোগুলোর সংযোজনে আস্ত গ্লাসে রূপান্তরিত হওয়া।

বিশ্ব চরম বিশৃঙ্খলার দিকে যাচ্ছে—সময়ের সম্মুখে যাওয়ার এই ব্যাখ্যা থেকে, 'সময়ের কি শেষ আছে?'—এ প্রশ্নের জবাব আমরা পেতে পারি। ক্রমাগত বিশৃঙ্খলার দিকে যেতে যেতে কোনো-এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতে চরম বিশৃঙ্খলায় পৌছবে। যেখানে যত শক্তি শৃঙ্খলিত হয়ে আছে সব প্রবাহিত হয়ে মিশে যাবে অন্য সবকিছুর মধ্যে। কোনোকিছুই কোনোকিছু থেকে বেশি উত্তপ্ত থাকবে না, নক্ষত্ররা জ্বলে-জ্বলে তার সব শক্তি বিলিয়ে দেবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো রূপান্তরিত হবে নিষ্ক্রিয় বস্তুকণায়। মহাজাগতিক ধূলিকণায় ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো তাদের সুশৃঙ্খল গতি হারাবে। মোটকথা পরিবর্তনের মতো কিছুই আর থাকবে না বলে সময় স্তব্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষের পরে কি আবার শুরু হতে পারে না? এক বান্ডেল গোছানো তাসকে যদি ক্রমাগত মিশাতে থাকি তাহলে ক্রমাগত বেশি এলোমেলো হতে হতে চরম এলোমেলো অবস্থায় পৌছবে। এর পরেও যদি অনেক অনেক সময় ধরে তাসগুলো মিশাতে থাকি তাহলে এমন সম্ভাবনা কি নেই—যে-কোনো একসময় তাসগুলো আবার গোছানো হয়ে উঠবে? অর্থাৎ হরতনগুলো সব সংখ্যা অনুসারে সাজানো হবে—রুহিতনগুলো তেমনি সাজানো হবে ইত্যাদি। আসলে এ-ধরনের চিন্তা অবশ্যই করা যেতে পারে; কিন্তু মনে রাখতে হবে মহাবিশ্ব এক বান্ডেল তাসের তুলনায় কত বেশি জটিল। ফলে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে শৃঙ্খল হয়ে ওঠা অর্থাৎ সময়ের শেষের পরে শুরু করার সম্ভাবনা কী পরিমাণ দূর-কল্পনা!

কিন্তু যার শেষ আছে তার কি শুরু আছে? ঘটনার পরিবর্তনের বিচারে সময়কে যাচাই করতে গিয়ে বলা যায় : মহাবিশ্বে গতির যখন সূচনা হল তখনই সময়ের শুরু। বিশ্বজগৎ যদি মহাবিস্ফোরণের মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে—যেমনটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন, তাহলে সময়েরও তখনই শুরু। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন দূরের নক্ষত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে এবং

যতবেশি দূরের তত দ্রুত সরে যাচ্ছে। আসলে সরে যাওয়ার দ্রুততা থেকেই দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। সেই হিসাবে মহাবিশ্বের সব নক্ষত্র ঘনীভূত অবস্থায় যখন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে, তাকেই কি সময়ের সূচনা বলব?

সময়-নিরূপণ যুগে-যুগে

সময় সম্পর্কে মানুষের চেতনা ও সময়-নিরূপণের যন্ত্র— দুইই পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে এবং বিবর্তিত হয়েছে সময়ের সঙ্গে।

সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, মাস, বছর—এমনি করে সময় বয়ে যাচ্ছে জলের প্রবাহের মতো—এমন একটি ধারণা, সহজাত ও চিরন্তন হয়ে আসেনি মানুষের কাছে আদিকাল থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে অনেক দার্শনিকের ভাবনা, অসংখ্য বিজ্ঞানীর উদ্ভাবন আর প্রকৌশলীর নির্মাণকুশলতা জমা হয়ে জন্ম দিয়েছে পঞ্জিকা ও ঘড়ির। সময়কে আমরা মাপতে শিখেছি হ্রস্ব ও দীর্ঘ পরিসরে।

শিকারের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে থাকা, শীত আসবে বলে আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ—এসব সময়নির্ভরতা পুরোপলীয় যুগের মানুষের জীবনেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সময় মেপে ও আগে থেকে সময় গণনা করে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল কৃষিসভ্যতার সূচনায়। টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস উপত্যকায় মানুষ যখন স্থায়ী ঘর বাঁধল এবং খাবারের জন্যে প্রকৃতির কৃপার ওপরে নির্ভরতা কাটিয়ে শুরু করল ফসল বুনতে, তখনো প্রাকৃতিক আবহাওয়া ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তার জীবনযাত্রা গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ল। কখন ফসল বুনতে হবে? কখন বন্যা আসবে? এসব হিসাবের জন্যে জন্ম হল পঞ্জিকার। পাথর ও হাড়ের ওপরে প্রাচীন মানুষের অঙ্কিত চাঁদের বিভিন্ন অবস্থার চিত্রের আবিষ্কার থেকে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা—সময়-গণনার প্রথম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে চাঁদ।

আমাদের দৃশ্যমান পরিপার্শ্বে যা সবচাইতে আকর্ষণীয়, নির্ভুলভাবে নিয়মতান্ত্রিক, তা হল আকাশে জ্যোতিষ্কদের চক্রগতি। দিন-রাত্রির ভিত্তি পৃথিবীর অক্ষীয় ঘূর্ণন, আপাতদৃষ্টিতে যা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তরূপে পরিলক্ষিত। চাঁদের পরিবর্তী দশা থেকে এসেছে মাসের হিসাব, সম্ভবত সপ্তাহের হিসাবও। আর বছরের হিসাব এসেছে সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর কক্ষীয় আবর্তন থেকে। আপাতদৃষ্টিতে এই পর্যায়ক্রমিক গতির পর্যবেক্ষণ ও গণনা খুব সহজ মনে হয়—কিন্তু এ সমস্ত গতিকে সমন্বিত করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব পঞ্জিকা নির্মাণের কাজটি মোটেই সহজভাবে ঘটেনি। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, কঠোর সাধনা ও দীর্ঘ গাণিতিক হিসাব ব্যয়িত হয়েছে এর পেছনে এবং তার পরেও—এখনো

সম্পূর্ণ নির্ভুল পঞ্জিকা আমরা পাইনি, একটি কাজ চালাবার মতো পঞ্জিকা দাঁড় করানো গেছে মাত্র।

প্রথম উল্লেখযোগ্য পঞ্জিকা সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল এখন থেকে পাঁচ সহস্র বছর আগে। সুমেরিয়ানরা তখন জটিল এক সভ্যতার সূত্রপাত করেছিল। জলা আর মরুভূমি নিম্ন মেসোপেটেমিয়ায় ফসল ফলাতে তাদের বাঁধ নির্মাণ করতে হয়েছে; জল নিষ্কাশনের জন্যে পয়োনালি কাটতে হয়েছে; গম, বার্লি, আর শসাক্ষেতে জল সিঞ্চন করতে হয়েছে। সময় গণনা করে জমিতে চাষ দিতে হয়েছে, বুনতে হয়েছে বীজ, কাটতে হয়েছে ফসল। সেইসঙ্গে বিকিকিনির জন্যে হাটবার ছিল বিশেষ বিশেষ সময়ে। দেবতার পূজা ও ধর্মীয় উৎসব ছিল। আর এ সবকিছুর জন্যেই সূক্ষ্ম দিনপঞ্জির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। দেবতা বা দেবতার প্রতিভূ রাজার হয়ে পুরোহিতরাই পরিচালনা করত সবকিছু এবং তাদের মধ্যে ছিল পঞ্জিকা তৈরির বিশেষজ্ঞ, যারা কাদামাটির উপরে লিখে রাখতে শিখেছিল।

বেবিলোনিয়ানদের দলিল থেকে যতটা জানা গেছে তাতে মনে হয় চাঁদের পরিবর্তী দশা থেকে বছরকে বারোটি চান্দ্রমাসে ভাগ করেছিলে সুমেরিয়ান পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞরা। প্রতিটি মাস ছিল ত্রিশদিনের। কিন্তু আসল সমস্যা হল দিন, মাস ও বছর জ্যোতিষ্কজগতের যে পর্যায়ক্রমিক গতির ওপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা পরস্পরের সঙ্গে মেলে না পুরোপুরি। যেমন সূর্যকে পরিক্রমণের কাল নিয়ে যে বছর, তা পূর্ণসংখ্যক দিনের সমষ্টি নয়। তিনশত পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টার কাছাকাছি। আর চাঁদের দশা পরিবর্তন থেকে যে মাসের হিসাব তা প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিনে। ফলে ত্রিশদিনের সুমেরিয়ান মাসের পঞ্জিকায় বছর আর মাসের মধ্যে হিসাবের গড়মিল দেখা দিত। এইজন্যেই প্রতি তিনবছরে প্রায় একটি অতিরিক্ত মাস যোগ করে সমন্বয় রাখার চেষ্টা চলত রাজার আদেশে। সুমেরিয় ও বেবিলনিয়দের বিশ্বাস ছিল জ্যোতিষ্কগুলো এক-একটি দেবতা। সুতরাং চাঁদ ও সূর্যের চক্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দেবতাদের ব্যাপার; ফলে মানুষের পক্ষে তাল মিলিয়ে চলা ছাড়া পথ নেই।

বেবিলনীয়দের পঞ্জিকা-সংশোধনের জটিল ব্যবস্থা প্রায় পনেরো শতাব্দী ধরে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণের ফলে পঞ্জিকা-বিশেষজ্ঞরা খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশত অব্দের দিকে আবিষ্কার করলেন যে প্রতি উনিশ বছরে চাঁদ ও সূর্যের পর্যায়ক্রমিক গতির মধ্যে দশাগত মিল পাওয়া যায়, কারণ উনিশ সৌরবছরে পূর্ণ দুইশত পঁয়ত্রিশ চান্দ্রমাস পাওয়া যায়। গ্রিকরা এই বিশেষ চক্রকে ব্যবহার করেছিল তাদের পঞ্জিকায়, যদিও বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে।

প্রাচীন মিশরে চান্দ্রমাস ও সৌরবছরের মধ্যেকার ঝামেলা দূর থেকে পরিত্রাণ পেতে নির্দিষ্ট ৩৬৫ দিনের বছরের সূত্রপাত হয়। তাদের মাস ছিল ত্রিশ দিনের। শুধু বছরের পাঁচটি দিন তারা অতিরিক্ত যোগ করে নিত যা ব্যয়িত হত ধর্মীয়

অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যদিয়ে। কিন্তু এর পরেও প্রতি বছরে প্রায় ছ'ঘন্টা করে পিছিয়ে যেতে থাকল সৌরবছর থেকে। ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়েছিল ঠিকই এবং টলেমি ও গ্রেটেস প্রতি চার বছরে একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করার কথা প্রস্তাবও করেছিল। কিন্তু মিশরের রক্ষণশীল পুরোহিতরা বাদ সাধল। জুলিয়াস সিজার ক্ষমতায় আসলে রোমের পঞ্জিকায় সংশোধন আনলেন তিনি। সৌরবছরের সঙ্গে পঞ্জিকাকে মিলানোর জন্যে খৃষ্টপূর্ব ছয়চল্লিশ অব্দকে তিনি ঘোষণা করলেন ৩৬৫ দিনের পরিবর্তে ৪৪৫ দিনের হিসাবে। সেইসঙ্গে প্রতি চার বছরে একটি করে দিন বাড়ানোর ব্যবস্থা অর্থাৎ লিপইয়ার শুরু হল। পঞ্জিকায় সপ্তাহের ধারণাটি এল ইহুদিদের ধর্মীয় কর্মসূচি থেকে। সাতদিনে সপ্তাহের হিসাবটি চান্দ্রমাস থেকে হয়তো এসে থাকবে, কারণ মোটামুটিভাবে সাতদিন অর্ধচন্দ্র ও পূর্ণিমার আন্তঃস্থ সময়।

জুলিয়াস পঞ্জিকায় এরপরেও ত্রুটি থেকে গেল, কারণ ঠিক ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় সৌরবছর হয় না। প্রতি একশত আটাশ বছরে এই ত্রুটির কারণে একটি করে দিন বেড়ে যেতে থাকে। ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি লিপইয়ার ব্যবস্থার আর-একটি সংশোধন প্রয়োগ করলেন এবং তা হল প্রতি চার শতাব্দীতে তিনটি লিপইয়ার বাদ দেয়া। এর ফলে গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা প্রতি ৩ হাজার ৩২৩ বছরে মাত্র ১ দিনের ব্যবধান ঘটায় সৌরবছরের সঙ্গে। ইংল্যান্ডের এই পত্রিকা গৃহীত হয়েছে মাত্র ১৭৫২ সালে। ততদিনে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তার ১১ দিনের ব্যবধান ঘটেছিল। রাশিয়ায় এই সংশোধন আনা হয় ১৯১৮ সালে। বিপ্লবের পরে সে-বছর থেকে ১৩ দিন বাদ দিতে হয়েছিল।

আমরা যে পঞ্জিকা এখন ব্যবহার করি তা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করেছেন। সপ্তাহ, মাস আর বছরের মধ্যে সমন্বয় আসা সম্ভব নয় এই পঞ্জিকায়। ফলে প্রতিবছর সপ্তাহের একই দিন দিয়ে শুরু হয় না। এই ত্রুটি দূর করার জন্যে একটি নতুন বিশ্বপঞ্জিকায় প্রস্তাব এসেছে ১৯৩০ সালে এলিজাবেথ এসোলিসের কাছ থেকে, যা জাতিসংঘে পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। এই পঞ্জিকায় বছরকে চারটি সমান তেরো-সপ্তাহের পর্যায়ে ভাগ করা হবে। ফলে ৩১, ৩০ ও ৩০ দিনের এই ত্রৈমাসিক পর্যায়গুলো সবসময়েই শুরু হবে রোববারে এবং শেষ হবে শনিবারে। ৩৬৫ দিনের বছরে যে বাকি দিনটি থাকবে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ডিসেম্বরে এবং তার নাম হবে 'বিশ্বদিন'। লিপইয়ার হলে লিপইয়ার বছরে আরো একটি অতিরিক্ত দিন থাকবে সপ্তাহের বাইরে, যা যুক্ত হবে জুন মাসের শেষে এবং তাকে বলা হবে 'লিপইয়ার দিন'। বিশ্বপঞ্জিকার পক্ষে যুক্তিগত সমর্থন পাওয়া গেছে; কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি, বিশেষ করে ইহুদি এবং প্রটেস্টান্টদের রক্ষণশীলতা ও জনসাধারণের জড়তা এর প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।

বৃহৎ সময়

সময় সম্পর্কে আমাদের সব অভিজ্ঞানই কোনো-না-কোনো পরিবর্তন বা ঘটনার পরিলক্ষণে জন্ম নেয়। সময়কে কত ছোট বা কত বড় পরিসরে আমরা জানতে পারি বা মাপতে পারি তা নির্ভর করে কত সূক্ষ্ম বা দীর্ঘমেয়াদি ঘটনা আমাদের চোখে ধরা পড়ে তার ওপর। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করলে সময়ের দৈর্ঘ্য, মিনিট, ঘন্টা, দিন, বছর পেরিয়ে কয়েক দশক পর্যন্ত পৌঁছে বড়জোর, তারপর কালের দিগন্ত যেন অসীমের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়, আমাদের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে।

অন্যদিকে প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি মাটি খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের তারিখ নির্ধারণ করেন; জীবাশ্মবিজ্ঞানী, যিনি প্রস্তরীভূত জীবদেহ থেকে প্রাণীর বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধান করেন; ভূবিজ্ঞানী, যিনি স্তরীভূত শীলা থেকে ভূপৃষ্ঠের বয়স হিসাব করেন; অথবা নভোবিজ্ঞানী, যিনি নক্ষত্রের জন্মতারিখ নির্ধারণ করেন এর বর্ণালি থেকে— এরা সবাই পরিবর্তনকে এত দীর্ঘসময়ের পরিসরে প্রত্যক্ষ করেন যে মিনিট বা ঘন্টা সেখানে কালের বিচারে ধরাই পড়ে না। সময়ের পরিমাপ ঘটে এসব ক্ষেত্রে সহস্র, লক্ষ, কোটি বছরে।

এই বৃহৎ সময়চেতনা একটি সাম্প্রতিক ব্যাপার বলতে পারি। তিনশো বছর আগেও বৃহৎ সময়ের ধারণা অনুপস্থিত ছিল।

এই চেতনা লাভ করতে দীর্ঘ প্রস্তুতি লেগেছে—যেমন ধারণার দিক থেকে, তেমনি বস্তুগত আবিষ্কারের দিক থেকেও।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাধারণ মানুষ সবাই ভাবতেন পৃথিবী, সূর্য ও নক্ষত্রের এই বিশ্বজগৎ যেমনটি আছে তেমনটি চিরদিন ছিল। যেন বিশ্বলোক সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত অবস্থায় কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে, কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন তারপর থেকে ঘটেনি—ঘটবেও না।

এই স্থিতিশীল অপরিবর্তনীয় বিশ্বের ধারণা থেকে বৃহৎ সময়ের ধারণা আসা সম্ভব ছিল না। বিশ্বজগৎ যে একটি দীর্ঘমেয়াদী বিবর্তনের মধ্যদিয়ে চলছে— এই ধারণাটির সঙ্গে বৃহৎ সময়ের ধারণাটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। লক্ষ বা কোটি বছরের হিসাব কখনোই আমাদের মনে স্থান পায় না, যতক্ষণ না আমরা উপলব্ধি করি যে ঐ দীর্ঘকালের মাপে কোনো পরিবর্তন ঘটছে কোথাও।

বিবর্তনশীল বিশ্বের ধারণা তাই বৃহৎকাল চেতনার ভিত্তিস্বরূপ, যার জন্যে কেউ-কেউ একে সময়ের আবিষ্কার বলতে চেয়েছেন। সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণার জগতে এই প্রচণ্ড উত্তরণ—এই বিপ্লব বাস্তবভাবে সমর্থিত হয়েছে দীর্ঘ সময়কে মাপার নানারকম কৌশল উদ্ভাবনের মধ্যদিয়ে। আমরা দেখব ভূপৃষ্ঠের স্তরবিন্যাস; জীবাশ্ম, তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙন; অপসৃয়মান নক্ষত্রের আলোর রং পরিবর্তন—এসব থেকে লক্ষ-কোটি বছরের পরিমাপ আমরা করতে পারছি। বৃহৎ সময় মাপার এইসব বিস্ময়কর ঘড়ি প্রকৃতি-ই তুলে দিয়েছে আমাদের হাতে।

ফ্রান্সের কঁতো দ্য বাফঁই (Comte De Buffon) সম্ভবত প্রথম, যিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। পৃথিবী একটি জ্বলন্ত উজ্জ্বল গোলক হিসেবে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কোনো ধূমকেতুর আকর্ষণে—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেন। এজন্যে বিভিন্ন আকারের ও নানারকম পদার্থের গোলককে উত্তপ্ত করে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন এদের ঠাণ্ডা হতে কত সময় লাগে। পৃথিবীর মতো একটি বড় গোলক বর্তমান তাপমাত্রায় নেমে আসতে প্রায় পঁচাত্তর হাজার বছর লেগেছে বলে তিনি হিসাব করেন।

সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বয়স অবশ্য বাফোঁর নির্ণীত বয়সের প্রায় ৬০ হাজার গুণ বেশি। কিন্তু একটি পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক প্রয়াস হিসেবে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের ধারাকে অবলম্বন করে প্রাচীন ঘটনার তারিখ নির্ধারণের সূত্র তিনিই উদ্ভাবন করেন। তাঁর মতে পুরোনো দলিল থেকে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ নির্ধারিত হয়—ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে লুকানো ধ্বংসাবশেষ থেকেও তেমনি প্রকৃতির ইতিহাস উদ্ধার করতে হবে।

দীর্ঘ সময়ের পরিমাপ যে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের মধ্যে চিহ্নিত হয়ে আছে—এই তত্ত্বটি প্রথম উপস্থিত করেন জেমস হাটন। রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসা, ভূমিচাষ সবকিছুর অভিজ্ঞতা নিয়ে হাটন শেষপর্যন্ত হয়ে উঠলেন ভূবিজ্ঞানী—শৌখিনতায় আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ দক্ষতায়। সদ্য-চাষ-করা পাহাড়ি জমিতে যখন বৃষ্টি নামত, হাটন লক্ষ্য করতেন উচ্চভূমি থেকে মাটি ধুয়ে ধুয়ে কেমন করে জমাট বাঁধছে নিচে এসে। সমুদ্রের ঢেউ যে-রেখা ফেলছিল বালুচরে, তার সঙ্গে অদ্ভুত মিল তিনি খুঁজে পেলেন স্তরীভূত পাহাড়ের শিলায়। তাঁর কাছে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, প্রস্তরের এক-একটি স্তর এক-একটি কালের অধ্যায়। হাটন পাথরের স্তরবিন্যাস থেকে পরিমাণগতভাবে সময়-নির্ধারণে সচেষ্ট হননি, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাবধানী। তাঁর মতে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের ক্রমাগত ক্ষয়ে যাওয়া, স্তরে স্তরে জমাট বাঁধা আবার ক্ষয়ে যাওয়া—এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটছে অনন্তকাল ধরে। ফলে ভূপৃষ্ঠের স্তরবিন্যাসের মধ্যদিয়ে দীর্ঘকালের ব্যাপ্তিটাই আমরা জানতে পারি; কিন্তু কোথায় এর শুরু কোথায় শেষ, তা জানতে পারি না।

দীর্ঘ অতীতকে এই অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ধার করলেন ইংল্যান্ডের উইলিয়াম স্মিথ। জরিপের কাজের ভিতর দিয়ে, পাহাড়-পর্বতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়, কখনো উঁচু পাহাড়ে ওঠার দৃশ্যে, কখনো বিশেষ এলাকার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে, কখনো ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে নানারকম প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম পরিলক্ষণে সময় মাপার সূত্র খুঁজে পেলেন স্মিথ। ভূতত্ত্বের জন্য চরম গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আবিষ্কারটি হল—ভূপৃষ্ঠের ইতিহাসের সঙ্গে প্রাণীর ইতিহাস সম্পৃক্ত হয়ে আছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে সন্ধানকৃত জীবাশ্মের পরিচয় থেকে সময়ের পরিচয় মিলবে। যদি সময়ের সঙ্গে পৃথিবী বদলে থাকে তাহলে সেই সময়কার প্রাণী এবং উদ্ভিদও বদলেছে। প্রকৃতি ভূপৃষ্ঠকে ওলটপালট করলেও গাছ ও প্রাণীদের মৃতদেহের চিহ্ন কালের সাক্ষী হয়ে আছে।

স্মিথের বিখ্যাত স্তরমানচিত্র ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ধারায় বৃহৎ সময় মাপার একটি কৌশলই শুধু তুলে দেয়নি। আমাদের হাতে—দীর্ঘ সময়ের ধারণাটিও স্পষ্ট করে তুলেছে সবার কাছে।

ক্ষুদ্র সময়

সময়কে কত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে? কত সূক্ষ্ম সময়ের ক্ষুদ্রতম পরিসর? এক সেকেন্ড কতটা সময়? সৌরদিনের পরিপ্রেক্ষিতে সেকেন্ডকে আমরা যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছি তা কি অপরিবর্তী? অর্থাৎ পৃথিবী নিজ অক্ষের উপরে একপাক ঘুরে আসতে যে সময় নেয় তাকে ৮৬ হাজার ৪০০ ভাগ করে যে সেকেন্ড, তা কি সব সময়ই এক? এসব প্রশ্ন ক্রমাগতই যে গুরুত্ব পাচ্ছে এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে বিজ্ঞানীদের মতে তার পেছনে দুটো কারণ আছে। প্রথমত, সময়ের সূক্ষ্ম পরিমাপের ওপরে আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতা ক্রমেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠছে; দ্বিতীয়ত সময় মাপার যন্ত্রের বিবর্তন ও পরিশুদ্ধি, সেইসঙ্গে সময় মাপার নতুন কৌশলের উদ্ভাবন ঘটছে ক্রমাগত।

রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাম প্রতিটি যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে তড়িৎচুম্বক তরঙ্গকে আমরা ব্যবহার করছি। এই তরঙ্গের গতি এতবেশি যে সেকেন্ডের কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে শত ফুট দূরত্ব এ অতিক্রম করে। আলোর গতির ভিত্তিতে সেকেন্ড তাই অত্যন্ত দীর্ঘ সময়। তড়িৎচুম্বক তরঙ্গের কম্পনহার যখন বৃদ্ধি পায়, সময়ের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ তখন বিশেষ করে জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ মেগাসাইকেল কম্পনহারে যখন রেডিও বা টেলিভিশন তরঙ্গ প্রেরিত হয় অথবা রাডারের ক্ষেত্রে যখন এই কম্পনহার হাজার মেগাসাইকেলে পৌঁছে তখন এই কম্পনমানকে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নতুবা সেকেন্ডের কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের হেরফেরে তরঙ্গের দশা যাবে বদলে, যোগাযোগ যাবে বিগড়ে।

যেখানে অনেকগুলো জেনারেটর সমন্বিতভাবে কাজ করছে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে, সেখানে এদের ঢেউ খেলা শক্তিপ্রবাহের মধ্যে একটি ছন্দ আছে। এ যেন অনেকগুলো দোলনার একই তালে দোলা। এই ছন্দে বিচ্যুতি ঘটলে ভোল্টেজের ভারসাম্য হারিয়ে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদনকেন্দ্র জ্বলে যেতে পারে।

ভাবা যেতে পারে তড়িৎচুম্বক তরঙ্গের নানা উৎস, দ্রুতগামী নানা যন্ত্র— সবকিছুর সমন্বয়ে আমাদের এ নগরসভ্যতা যেন একটি কনসার্ট। এর সবগুলো সংগীতযন্ত্র যদি তাল মিলিয়ে চলে তবেই মাত্র আকাঙ্ক্ষিত সুরটি সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৌশল সভ্যতার এই ছন্দ, এই সুর ও ঝঙ্কার নিয়ন্ত্রণ করছে সময়। সময়ের

একটুকু হেরফেরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হতে পারে, মহাশূন্যযানের উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হতে পারে, রাডারের দূরত্ব নির্ধারণ ভুল হতে পারে, যুদ্ধের জয়-পরাজয় বদলে যেতে পারে, ভেঙে পড়তে পারে আকাশচারী জেটপ্লেন দুর্ঘটনায়। অলিম্পিকের দৌড় প্রতিযোগিতার ফলাফল পর্যন্ত খালি-চোখের বিচারে গৃহীত নয়, সেখানে আলোকচিত্র-বিচার চাই অর্থাৎ সেকেন্ডকে ভাঙা চাই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে। রোগীর স্নায়ুর বিকলতা এখন ডাক্তার নির্ধারণ করছেন স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ-সংকেতের প্রবাহযোগ্যতা মেপে। এখানে অসিলোস্কোপ ব্যবহার করে ডাক্তার পরিমাপ করছেন সংকেত বহন সময় কতটা বদলে গেছে রোগীর স্নায়ুর ক্ষেত্রে। এক সেকেন্ড এক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়, তাই সেকেন্ডকে ভাঙতে হচ্ছে আবার।

বিদ্যুৎপাতের মতো আকস্মিক ঘটনা যা সেকেন্ডের দশ হাজার ভাগের একভাগ সময়ে শেষ হয়ে যায়, তাও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে ক্যামেরার সাহায্যে। ডিনামাইট কীভাবে বিস্ফোরিত হয় তার প্রতিটি ধাপের নকশা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে বিশেষ কৌশলে দ্রুত ক্যামেরার সাহায্যে। সেকেন্ড এখানে খণ্ডিত হচ্ছে লক্ষাধিক ভাগে। কিন্তু সময়ের সূক্ষ্ম বিভাজন যেখানে সবচাইতে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হল মৌলিক কণিকার পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায়। পরমাণু ভাঙার শক্তিশালী এক্সিলারেটর এমনসব কণিকারও জন্ম দিচ্ছে যার আয়ুকাল সেকেন্ডের লক্ষ-কোটি-কোটি ভাগের এক ভাগ। এক সেকেন্ড সেখানে শুধু দীর্ঘ সময় নয়, প্রায় অনন্তকাল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষুদ্র সময়ের চেতনাই শুধু আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়নি, এর প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ঘটেছে। কেবলমাত্র গবেষণাগারে নয়, খেলার মাঠে, হাসপাতালে, দৈনন্দিন জীবনেও। কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের চেতনা ও তার উপযোগ কোনোটাই সম্ভব হত না, ক্ষুদ্র সময় মাপার যন্ত্র অর্থাৎ ঘড়ির উদ্ভাবন ও অভিব্যক্তি না ঘটলে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক ঘড়ির সূচনা হবার আগপর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সময় মাপার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। সূর্যঘড়ি, বালিঘড়ি, জলঘড়ি এসব ব্যবস্থাই আকার ও আয়তনে পরিবর্তিত হয়েছে ক্রমাগত, কিন্তু উন্নতি ঘটেনি সময়ের পরিমাপে নির্ভুলতা অর্জনে। ইউরোপের প্রথম যান্ত্রিক ঘড়িটি নির্মিত হয়েছিল একটি ওজনের স্পন্দমান গতির ওপরে ভিত্তি করে। ঘড়ির একটিমাত্র কাঁটাকে এই ভরদণ্ড সময়ের দিকে ঠেলে দিত এর ইতস্তত চলাচলের পথে। অনেক উন্নতি করার পরও এই ঘড়ি দিনে কয়েক মিনিট পর্যন্ত ব্যবধান ঘটাত সময়ের।

এরপর সপ্তদশ শতাব্দীতে এল দুটো বড় উদ্ভাবন। একটি হল দোলক, অন্যটি হেয়ার স্প্রিং। দোলকের সমতালে দোলন অর্থাৎ একই পর্যায়কালে দোল খাওয়ার বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে সময়কে অনেক নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব হল। ঘড়ি এখন ঘণ্টার সঙ্গে মিনিটও দেখাতে শুরু করল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জর্জ গ্রাহাম পেন্ডুলাম ঘড়ির সংশোধন ঘটান তাপমাত্রার পরিবর্তনজনিত ত্রুটির বিরুদ্ধে। দোলকের দৈর্ঘ্য যাতে তাপমাত্রা-নিরপেক্ষ থাকে সেজন্যে বিশেষ শঙ্কর-ধাতু ব্যবহৃত হল দোলকের দণ্ডের জন্যে। দিনে এক সেকেন্ডের মধ্যে নির্ভুলতার নিশ্চয়তা পাওয়া গেল।

বৈদ্যুতিক ঘড়ি আবিষ্কৃত হবার পর তড়িৎপ্রবাহের পর্যায়কালকে ব্যবহার করা হল সময় মাপার কাজে। পর্যায়কাল বা কম্পনহারের পরিবর্তন অবশ্য বৈদ্যুতিক ঘড়ির সময়কে প্রভাবিত করে নির্ভুল সময় নির্ধারণে ব্যাঘাত ঘটাল এখানেও। রেডিও প্রেরণকেন্দ্রে সূক্ষ্ম সময় পরিমাপের প্রয়োজনটাই দেখা দিল বেশি করে এবং বৈদ্যুতিক ঘড়ির সংশোধনও এল এখান থেকে। টিউনিং ফর্ককে আঘাত করে দেখা গেছে এর কম্পনহার বেশ লক্ষণীয়ভাবে স্থির থাকে। প্রকৌশলীরা দেখলেন টিউনিং ফর্কের এই কম্পনকে যদি জেনারেটরের তড়িৎপ্রবাহের কম্পনহারকে নিয়ন্ত্রণ করাবার কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে অপরিবর্তী কম্পনহারের তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যাবে। ফলে বৈদ্যুতিক ঘড়িও অধিক নির্ভুলভাবে সময় দেবে।

কিন্তু টিউনফর্কের চেয়েও কম পরিবর্তী কম্পন-উৎস খুঁজে পাওয়া গেল কোয়ার্জ কেলাসে। বেতারতরঙ্গ প্রেরণের ক্ষেত্রে সময় সঠিকভাবে মাপার চেয়েও বেশি প্রয়োজন কম্পনহারকে সুনির্দিষ্ট রাখা, কারণ কম্পনহারের এতটুকু পরিবর্তনে রেডিওতরঙ্গের দিক থেকে পাশাপাশি দুটো বেতারকেন্দ্রের মধ্যে প্রাবরণ ঘটাতে পারে। এই ব্যতিচার এড়ানোর জন্যে সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বেতারতরঙ্গের ব্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অবশ্য কম্পনহারকে নির্দিষ্ট করার অর্থই পর্যায়কালকে নির্দিষ্ট করা। কোয়ার্জ কেলাসের স্পন্দক ব্যবহার করে উচ্চ কম্পনমানের তরঙ্গ সৃষ্টি তাই একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা। ভালোভাবে নির্মিত একটি কোয়ার্জ কেলাসের কম্পন শতকোটি ভাগের এক ভাগের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কোয়ার্জ কেলাস নিয়ে আর-একটি সুবিধা হল, এর যান্ত্রিক কম্পন একটি আনুষঙ্গিক মৃদু তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে, যার কম্পনহার ঐ যান্ত্রিক কম্পনহারের সমান। এই কম্পমান তড়িৎপ্রবাহকে রেডিও সম্প্রচারের জন্যে ব্যবহার করা হয়। সুস্থিত কম্পনের এই তড়িৎপ্রবাহকে বৈদ্যুতিক ঘড়ি চালাবার কাজে ব্যবহার করলে তার সময়ও স্বভাবতই খুব নির্ভুল হবে। ১৯২৮ সালে ডব্লউ ম্যারিসন প্রথম এই কেলাস-ঘড়ি যখন নির্মাণ করেন, এর নির্ভুলতা ছিল সারাদিনে সেকেন্ডের হাজার ভাগের একভাগ। তখনকার সবচাইতে ভালো দোলক ঘড়ি এর তুলনায় দশ ভাগের একভাগও নির্ভুল ছিল না।

কেলাস-ঘড়ির পর এল অ্যাটোমিক ক্লক বা পারমাণবিক ঘড়ি। কেলাস যেমন একটি স্পন্দনশীল ব্যবস্থা পরমাণু অথবা কয়েকটি পরমাণুর সমন্বয়ে সৃষ্ট, অণুও তেমনি একটি স্পন্দনশীল ব্যবস্থা; শুধু পার্থক্য এই যে অণু বা পরমাণু আরো সূক্ষ্ম এবং এর স্পন্দনহার আরো বেশি অপরিবর্তী। এই তথ্য ব্যবহার করেই বিজ্ঞানীরা

১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডারস্ এ নির্মাণ করেন অ্যামোনিয়া কোয়ার্জ ঘড়ি। অ্যামোনিয়া অণুর একটি বৈশিষ্ট্য হল একটি নির্দিষ্ট কম্পনহারের রেডিওতরঙ্গকে সে শোষণ করতে পারে। এই কম্পনহারটি হল ২৩ হাজার ৮৭০ মেগাসাইকেল। অ্যামোনিয়া অণু আসলে দেখতে একটি পিরামিডের মতো। এই পিরামিডের ভূমি হল তিনটি নাইট্রোজেন-পরমাণুর একটি ত্রিভুজ এবং এর শীর্ষ হল হাইড্রোজেন-পরমাণু। ২৩ হাজার ৮৭০ মেগাসাইকেল রেডিওতরঙ্গ অ্যামোনিয়া গ্যাসের মধ্যদিয়ে পাঠালে এই অণুটি বিশেষভাবে স্পন্দিত হতে থাকে অর্থাৎ এর হাইড্রোজেন-পরমাণুটি নাইট্রোজেন-পরমাণুদের তৈরি ত্রিভুজের মধ্যদিয়ে ওঠানামা করতে থাকে। এর ফলে ঐ বিশেষ রেডিওতরঙ্গটির শক্তি অ্যামোনিয়া গ্যাস শোষণ করে নিতে পারে।

একটি কোয়ার্জ কেলাস থেকে ২৩ হাজার ৮৭০ মেগাসাইকেলের রেডিওতরঙ্গকে অ্যামোনিয়া গ্যাসভর্তি একটি বাক্সের মধ্যদিয়ে পার করলে দেখা যাবে যতক্ষণ রেডিওতরঙ্গের কম্পনমান নির্দিষ্ট ২৩ হাজার ৮৭০ মেগাসাইকেল থাকছে, ততক্ষণ এই তরঙ্গ অ্যামোনিয়া গ্যাস শোষণ করবে; কিন্তু এর কম্পনহারের কোনো পরিবর্তন ঘটলে অ্যামোনিয়া এই তরঙ্গ শোষণ করবে না, ফলে তা অ্যামোনিয়া বাক্সের ভিতর দিয়ে পার হয়ে যাবে। অ্যামোনিয়ার বাক্সের ভিতর দিয়ে পার হয়ে আসা রেডিওতরঙ্গের সঙ্গে সরাসরি উৎস থেকে আসা তরঙ্গের তীব্রতা তুলনা করে আমরা বুঝতে পারি কোয়ার্জ কেলাসটির কম্পনহারের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না। দুই তরঙ্গের তীব্রতার পার্থক্যকে কোয়ার্জ কেলাসের কম্পনহার নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগিয়ে অ্যামোনিয়া ঘড়িকে এত নির্ভুল করা যেতে পারে যার সময়ের পরিবর্তন দশ কোটিতে একভাগের বেশি হবে না।

প্রায় একই পদ্ধতিতে সিজিয়াম-ঘড়ি নির্মিত হয়েছে। এখানে অ্যামোনিয়া-অণুর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় সিজিয়াম-পরমাণু। সিজিয়াম-ঘড়ির সময় আরো নির্ভুল অর্থাৎ বিচ্যুতি আরো কম—প্রায় হাজার কোটি ভাগের একভাগ। তিন হাজার বছরে এই ঘড়ি সময় হারায় মাত্র এক সেকেন্ড। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখানেই থামতে রাজি না। বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে তাঁরা কাজ করছেন হাইড্রোজেন-পরমাণুর কম্পনমানকে প্রমাণ (Standard) হিসেবে ব্যবহার করতে। তত্ত্বানুসারে হাইড্রোজেন-ঘড়ি অবিশ্বাস্যরকম নির্ভুল সময় দিতে সক্ষম হবে। এর সময়ে বিচ্যুতি ঘটবে বড়জোর হাজার-লক্ষ-কোটি ভাগের এক ভাগ, যার অর্থ হল সৌরজগতের বয়সে এ ঘড়ি সময় হারাবে দুই মিনিট মাত্র।

সময়কে যখন এমন নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব হচ্ছে নতুন উদ্ভাবিত পারমাণবিক ঘড়িতে, তখন একটি প্রশ্ন স্বভাবতই এসে যায়—এক সেকেন্ড আসলে কতটা সময়?

আমরা সময়ের যত ক্ষুদ্র এককেই যাই না কেন, যতক্ষণ এর মূল উৎস সৌরদিন, অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির ওপরে ভিত্তি করে সময়ের

একক দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করছি, ততক্ষণ আমরা আসলে সময় সম্পর্কে সেই প্রাচীন সুমেরিয়ান এবং ইজিপশিয়ানদের ধারণাকেই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু পৃথিবী কি নিজ অক্ষের ওপরে একপাক ঘুরে উঠতে সবসময় একই পরিমাণ সময় নিচ্ছে? আসলে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে পৃথিবীর এই পাক-খাওয়া গতি অর্থাৎ ঘূর্ণনগতি কখনো একটু দ্রুততর হচ্ছে, কখনো একটু মন্থরতর। এর কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটছে এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণজনিত বাধা সামান্য হলেও কিছুটা প্রভাব রাখছে এর ঘূর্ণনগতিতে। পৃথিবীর জলও একটি প্রভাব রাখছে। বিশেষ করে শীতের ঋতুতে পাহাড়ের চূড়ায় যখন বরফ জমছে প্রচণ্ড, তখন কার্যত পৃথিবীর ভরকেন্দ্র কিছুটা সরে যাচ্ছে। যদি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ভূপ্রকৃতি এক হত তাহলে অবশ্য একই সময়ে এক মেরুতে বরফ জমা ও অন্য মেরুতে বরফ গলে যাওয়ার ফলে পারস্পরিক প্রতিবিধান ঘটত। কিন্তু তা ঘটে না, কারণ দক্ষিণ মেরুতে ভূমি অপেক্ষাকৃত কম। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির উপরে জোয়ার-ভাটার প্রভাবও ভূ-পদার্থবিদরা আবিষ্কার করেছেন, এবং সেটা গ্রহণের অবস্থান থেকে।

আমরা জানি গ্রহণগুলো ঘটে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষগতির ফলে, এবং যেহেতু পৃথিবীর কক্ষগতির পরিবর্তন ঘটছে না বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা, অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার কাল পৃথিবীর জন্যে সব সময়ই এক; তাই পৃথিবীতে গ্রহণ ঘটার সময়টা বদলাচ্ছে না। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ এলাকায় গ্রহণ দেখা যাবে তা নির্ভর করে এলাকাটা গ্রহণ দেখার মতো অবস্থানে আছে কি না তার ওপর। দূর অতীতে পৃথিবীর যেখানে গ্রহণ দেখা গেছে বলে দলিল আছে এবং পৃথিবীর অপরিবর্তী ঘূর্ণনগতি ধরে হিসাব করলে যেখানে গ্রহণ দেখা যাবার কথা তার মধ্যে গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। এর ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে, দিনের দৈর্ঘ্য সমপুঞ্জিতভাবে বছরে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড করে বেড়েছে গত হাজার বছর ধরে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গড় সৌরদিনকে ৮৬ হাজার ৪০০ ভাগ করে যে সেকেন্ডের ধারণা তা ধ্রুব নয় বরং কক্ষপথে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকাল অর্থাৎ কক্ষ-বছরটাই সময় মাপার অধিক নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। আর এইজন্যেই আন্তর্জাতিকভাবে ১৯০০ খৃস্টাব্দের বছরটির দৈর্ঘ্যকে ৩১,৫৫৬,৯২৫.৯৭২৭ ভাগ করে তার একভাগকে সেকেন্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ১৯৫৬ সালে। কিন্তু পরমাণুর নিজস্ব স্পন্দন কম্পনহার, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি ব্যাপার স্বভাবতই পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি বা অক্ষগতির ওপরে নির্ভরশীল নয়। ফলে সময়ের দৈর্ঘ্য মাপার যে কালিক স্কেল, যাকে আমরা সেকেন্ড বলছি, তার ভিত্তি পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি অথবা পারমাণবিক ঘটনার ভিত্তিতে নেয়া যেতে পারে এবং এই ভিত্তিগুলো পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। এক সেকেন্ড কতটা সময়? এ প্রশ্নের জবাব তাই

অনুপম নয়। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরীণ কম্পনহারের ভিত্তিতে একে সংজ্ঞায়িত করলে এই সেকেন্ডের দৈর্ঘ্যকে অবিশ্বাস্যরকম অপরিবর্তীরূপে আমরা পেতে পারি। অবশ্য সেটা আপেক্ষিক তত্ত্বের কারণে এর নিজস্ব জড় ব্যবস্থাতেই মাত্র।

সবচেয়ে ক্ষুদ্র সময় কী? এ প্রশ্নের জবাব ভাববাদীদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ সময়কে নিরপেক্ষ একটি প্রবহমান জিনিস ধরলে একে সীমাহীনভাবে খণ্ডিত করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু পদার্থবিদের কাছে সময়ের সংজ্ঞার্থ নির্ধারক একমাত্র ঘটনা। সময়ের সম্পর্ক ঘটনা অর্থাৎ পরিবর্তনের সঙ্গে। ঘটনার মধ্যদিয়েই সময়ের উপলব্ধি। ফলে ক্ষুদ্রতম সময়ের পরিসরে যে ঘটনা ঘটতে পারে সেই ঘটনাই ক্ষুদ্রতম সময়কে সংজ্ঞায়িত করবে। আর এজন্যে আমাদের যেতে হবে মৌল কণিকার জগতে, বিশাল শক্তিধর এক্সিলারেটর বা পরমাণু-ভাঙার যন্ত্র যেখানে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙে ফেলছে আর সদ্যজন্মা ক্ষণায়ু মৌল কণিকা বাবল্ চেম্বারের মধ্যদিয়ে তার ক্ষণিক যাত্রাপথের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে বুদবুদ সৃষ্টি করে। এমন ক্ষণায়ু কণিকাও সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে যা এই বাবল্-চেম্বারেও ধরা পড়ে না। এদের আয়ুকাল সেকেন্ডের দশ হাজার কোটি কোটি ভাগের একভাগ অর্থাৎ একটি প্রোটন-কণিকার একপাশ থেকে অন্যপাশ পর্যন্ত যেতে আলোর যে-সময় লাগে সেইটুকু সময়। তাহলে কি বলব এটাই ক্ষুদ্রতম সময়!

প্রাথমিক ঘড়ি

পরিবর্তন মানুষকে সময়ের ধারণা দিয়েছে এবং যে-কোনো পর্যায়বৃত্ত গতিকে সে-সময় মাপার ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যৌথজীবনের জটিলতায় এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলির সঙ্গে জীবনযাত্রার সমন্বয় ঘটাতে সময়কে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রমাগত, আর মানুষ নানা কৌশল উদ্ভাবন করেছে সময় মাপার। উন্নততর সময় মাপার যন্ত্রের উদ্ভাবন ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়তর করেছে বিভিন্ন ঘটনা ও কাজের সম্পর্ক। ফলে জীবনযাত্রা উন্নত ও জটিলতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। ঘড়ির উন্নয়নের সঙ্গে সভ্যতার উত্তরণের এই পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যেই ঘড়ির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস এত আকর্ষণীয়। অবশ্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই শুধু নতুন সময় মাপার যন্ত্র আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করেনি মানুষকে, বরং প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অগ্রসরতা যখনই নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে তার সামনে, তার যান্ত্রিক প্রকৌশলে সেই অভিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে উন্নততর ঘড়ি নির্মাণে।

কোনো দাঁড়ানো বস্তুর ছায়া থেকে সময় মাপার কৌশলই সম্ভবত প্রাথমিক ঘড়ি মানুষের। আকাশে সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ার দৈর্ঘ্য যায় বদলে। ফলে ছায়ার দৈর্ঘ্য থেকে অতিক্রান্ত সময় অনুমান করতে শুরু করে মানুষ। মিশরে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্যে যে ছায়াঘড়ি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হত, তা ছিল আসলে একাট আড়াআড়ি দণ্ড, যার ছায়া একটি লম্বা হাতলের ওপরে এসে পড়ত। হাতলের ওপরে দাগ কাটা থাকত ঘণ্টায়। সকালের দিকে আড়াআড়ি দণ্ডটি থাকত পূর্বদিকে কিন্তু দুপুরের পরে এটাকে ঘুরিয়ে দেয়া হত পশ্চিমদিকে।

খৃস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে বেবিলনীয় আর-একরকম ছায়াঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছিল যেখানে একটি ঘনাকার (cubic) কাঠের বা পাথরের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার গর্ত কেটে এর কেন্দ্রবিন্দুতে একটি নির্দেশ-কাঁটা দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। এই নির্দেশ-কাঁটার ছায়া যে-পথে চলত তা একটি বৃত্তাকার চাপের মতো সৃষ্টি করত। যেহেতু এই চাপের আকার ও অবস্থান বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয় তাই কয়েকটি চাপ আঁকা হত সুবিধামতো এবং প্রতিটি চাপকে সমান বারো ভাগে ভাগ করা হত যাতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানকে সমান ১২ ঘণ্টায় বিভক্ত করা যায়।

আরবরা ছায়াঘড়িকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল, ফলে নানা ধরনের ঘড়ি তারা নির্মাণ করেছিল ত্রিকোণমিতিকে ব্যবহার করে। বেলনাকার, শঙ্কু এবং অন্যান্য আকারের তলের বেলায় ঘন্টার রেখাগুলো কেমন হবে তার তত্ত্ব দিয়েছিলেন আবু-আল হাসান এবং সেইসঙ্গে সমান দৈর্ঘ্যের ঘণ্টা মাপার কৃতিত্বও তাঁরই পাওনা।

রাতের বেলায় ছায়াঘড়ি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, তাই জলঘড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছিল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দেরও আগে। বালতির আকারের একটি পাত্রে পানি রাখা হত এবং এর তলার দিকে একটি ছিদ্র দিয়ে পানি পড়তে থাকত। পানির চাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না বলে ঘন্টাগুলো সমান করা বেশ অসুবিধা ছিল, তবে পাত্রের গা ক্রমাবনত করে তৈরি করার জন্যে এবং পানির সান্দ্রতার পরিবর্তনের কারণে আংশিকভাবে এই ত্রুটি সংশোধিত হত। মিশরের কাছ থেকে জলঘড়ির প্রচলন রোমে এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে এবং নানারকম উন্নয়ন ঘটে নির্মাণকৌশলের। একাদশ শতাব্দীতে চীনে যে জলঘড়ি নির্মিত হয় তা ছিল রীতিমতো জটিল ও সূক্ষ্ম। পানির পাত্র থেকে পানি এসে পড়ত পানি ঢালার সঙ্গে সংযুক্ত বালতিতে। অনেকগুলো বালতি চক্রাকারে সাজানো থাকত এবং যতক্ষণ একটি বালতি না ভরত ততক্ষণ চাকাটা থেমে থাকত। পানির ভারে যখন চাকাটা ঘুরে উঠত একধাপ, তখন আর-একটা বালতি আসত পানির নির্গমন-পথে। চাকাটি শব্দ করে এক ধাপ ঘুরে ওঠার সঙ্গে সময় নির্দেশক কার্ডসহ ছবি প্রদর্শিত হত।

সময় মাপার আর যেসব কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কৃত হবার আগে, তাদের মধ্যে রয়েছে বালিঘড়ি, বাতিঘড়ি এবং মোমবাতি ঘড়ি। বালিঘড়িতে কাচের পাত্রের ছিদ্রপথে বালি নির্গত হবার সময়টাকে ব্যবহার করা হত সময় মাপার কাজে। বাতিঘড়ির ক্ষেত্রে কতটা তেল শেষ হয়ে যাচ্ছে তা থেকে সময় মাপা হত। আর মোমবাতি ঘড়ির ক্ষেত্রে মোম পুড়ে নিঃশেষ হবার সময়টা নির্দেশ দিত সময়ের।

ঘড়ির বিবর্তনে যান্ত্রিক ঘড়ির উদ্ভাবন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। দোলক ঘড়িরও প্রায় তিন শতাব্দী আগে এর সূচনা হয়েছিল। এই ঘড়ির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল একটি স্পন্দনশীল বা দোলায়মান গতিকে ব্যবহার করে একটি চাকাকে পর্যায়ক্রমে ধাপে-ধাপে মুক্তি দেয়া। ইংরাজিতে যাকে escapement বলে। পরবর্তী উন্নত যান্ত্রিক সব ঘড়িতেই এই কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত দুপাশে দুটো দণ্ডের আনুভূমিক দণ্ডটির দুপাশে দুটো নিয়ন্ত্রক ওজন আটকানো থাকে এবং অভিলম্বী দণ্ডটি কাজ করে ডামি হিসাবে। এর সঙ্গে দুটো অভিক্ষিপ্ত অংশ থাকে। ওজন সুদ্ধ আনুভূমিক দণ্ডটি দোলার সময় অভিক্ষিপ্ত বা বেরিয়ে আসা অংশদুটো escapement চাকায় দাঁতকে পর্যায়ক্রমে মুক্তি দেয়। এই

দাঁতওয়ালা চাকাটি দড়ির জড়ানো একপ্রান্তে ঝুলানো ওজনের নিচের দিকে পড়ার টানে ঘুরতে চেষ্টা করে। ফলে যখনই মুক্তি পায় তখন এই চাকার ঘাতটি দোলায়মান দণ্ডটিতে সঞ্চারিত হয়। আনুভূমিক দণ্ডটির দোলনকাল নির্ধারিত হয় এর নিয়ন্ত্রক ওজনের অবস্থান ও মানের দ্বারা। এই যান্ত্রিক ঘড়ি প্রাথমিক অবস্থায় খুব সঠিক সময় নির্দেশ করতে না-পারলেও পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মাণের পথে সহায়ক হয়েছে অনেক পরিমাণে।

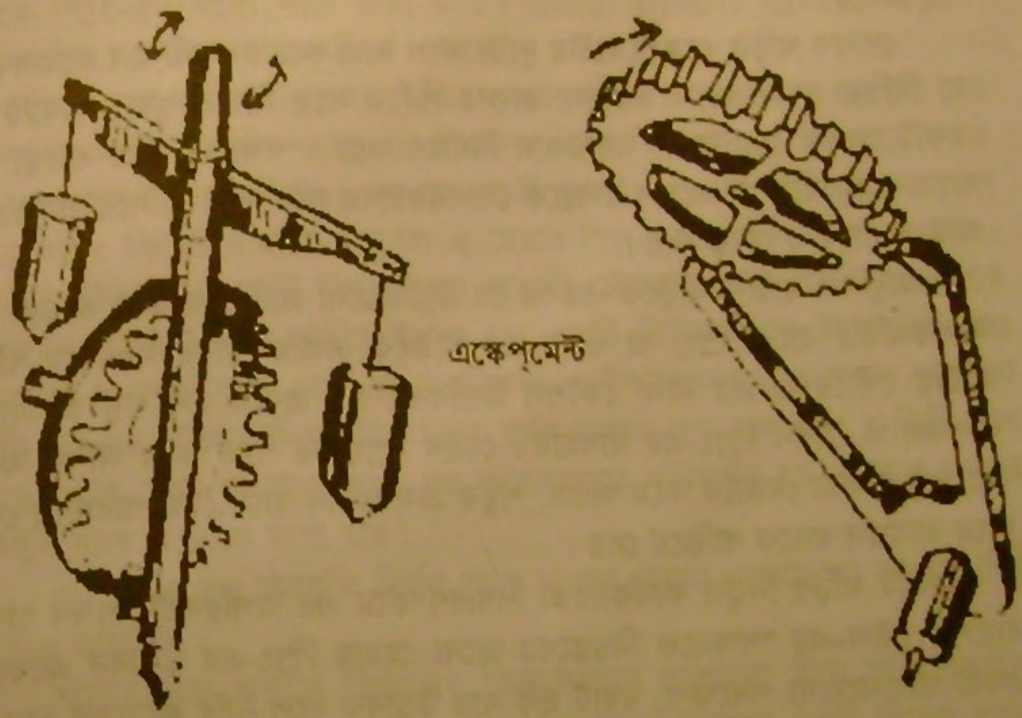

এস্কেপমেন্ট

প্রথম এস্কেপমেন্ট ঘড়ি কেমন করে এল তার সূত্র খুঁজে পেতে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে ঐতিহাসিকদের। ১৯৫৫ সালে কেমব্রিজের প্রফেসর প্রাইস ও প্রফেসর জসেফ সিডহাসের যৌথ চেষ্টায় শেষপর্যন্ত ঘড়ির বিবর্তনের ইতিহাসে যে বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল এতদিন, তার সমাধান মিলল ১০৮৮ খৃষ্টাব্দের চীনে নির্মিত প্লানেটরিয়ামের মধ্যে যা একই সঙ্গে ঘড়ির কাজও করত। দণ্ড ঘুরাবার ব্যবস্থাসহ ডাণ্ডা, চাকা ইত্যাদির সমন্বয়ে এই ব্যবস্থা জটিল ও মুগ্ধকর। সম্ভবত এ-ধরনের এসকেপমেন্ট ঘড়ির সূচনা হয়েছিল আরো আগে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীতে চীন দেশেই, ইউরোপে যখন অন্ধকার যুগ চলছিল।

নির্ভুল সময় মাপার ক্ষেত্রে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিওর দোলন-সম্পর্কীয় আবিষ্কার একটি বিরাট অগ্রগতি সাধন করল। তিনি দেখালেন যে দোলকের দোলনকাল এর ওজন ও দোলন-বিস্তারের ওপরে নির্ভর করে না, শুধু দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্যের ওপরে নির্ভর করে। গ্যালিলিওর আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই

ক্রিশ্চান হিউসেন দোলনঘড়ি নির্মাণ করলেন. গ্যালিলিওর মৃত্যুর ষোলো বছর পর। এরপর দ্রুত নির্মাণকৌশলের উৎকর্ষ ঘটতে লাগল। সূক্ষ্মভাবে সময় মাপার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে দেখা দিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। ১৬৭০ সালে উইলিয়াম ক্রিমেন্ট সেকেন্ড পেন্ডুলাম নির্মাণ করলেন। ঘড়িকে আবদ্ধ করা হল কাচের বাক্সে। তাপমাত্রার পরিবর্তনে দোলনকাল যাতে বদলে না যায় সেজন্য নানা কৌশল উদ্ভাবিত হল। এককেন্দ্রীয় লোহা ও দস্তার নলদণ্ড ব্যবহার করা হল দোলকের দণ্ড হিসেবে। এরপর আরো সহজ পথ এল ইন্‌ভার নামক সঙ্কর ধাতুর আবিষ্কারে।

দোলক ঘড়ির এস্কেপমেন্টের দুটো অংশ কাজ করে। একটি হল এস্কেপ হুইল যা বিভিন্ন আকারের দাঁতওয়ালা চাকার সারির সঙ্গে গিয়ার করা। অন্যটি হল একটি স্পন্দক দোলক যা পর্যায়কাল নির্ধারণ করে। স্পন্দকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা থাকে এমনভাবে যে এস্কেপ চাকাকে দোলনকালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পর্যায়ক্রমে আটকে রাখে ও ছেড়ে দেয়।

আধুনিক যান্ত্রিক ঘড়িতে এরপর যে উন্নতিগুলো সাধিত হয়েছে তা হল সব আপতবর্তিত হারে স্প্রিং. যা ওজন-এর শক্তিকে চাকার সারির মধ্যদিয়ে ঘড়ির কাঁটায় পৌছে দেয়ার নানা কৌশল উদ্ভাবন। এর একটি হল শঙ্কু আকারের কপিকল ও মেইন স্প্রিং-এর ব্যবহার। মেইন স্প্রিং-এর প্যাঁচ কমে আসার ফলে এর ঘূর্ণনক্ষমতা যেভাবে কমে আসে, শঙ্কুর ক্রমবর্ধমান ব্যাস সেই পরিমাণে সেই হারে আবর্তন বলকে বাড়িয়ে দেয়।

একটি ঘড়ির নির্ভুল কার্যকারিতা নির্ধারণ করে এর অপরিবর্তী স্পন্দন হার। ব্যালেন্স হুইল-এর স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে হেয়ার স্প্রিং-এর উদ্ভাবন এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, রবার্ট হুক যার উদ্ভাবক বলে দাবি করেছেন ১৬৬০ সালে। পেন্ডুলামের মতোই হেয়ার স্প্রিং-এর কাজ হল চালকশক্তির তারতম্যের ওপরে নির্ভর না করে অপরিবর্তী হারে ব্যালেন্স হুইলের পর্যায়ক্রমিক গতি নিয়ন্ত্রণ করবে। হেয়ার স্প্রিং আসলে একটি স্টিলের সূক্ষ্ম ফিতা-পেঁচানো অবস্থায় যার ভিতরের প্রান্ত ঘর্ষণহীনভাবে একটি আঙটার সাহায্যে ব্যালেন্সের সঙ্গে লাগানো এবং অন্যপ্রান্ত ছোট্ট পেরেক বা বোতামের সাহায্যে ঘূর্ণনব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। হেয়ার স্প্রিং-এর প্যাঁচ খাওয়া ও খোলার মধ্যদিয়ে ব্যালেন্স-হুইলের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত হয়। হেয়ার স্প্রিং-এর সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতা পকেটে রাখার মতো ছোট ঘড়ি নির্মাণ সম্ভব করেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে।

প্রয়োজনের তাগিদে যে নিপুণতর যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে পারে তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জন হ্যারিসনের ক্রনোমিটারের উদ্ভাবন। ১৭০৭ সালে স্যার ক্লাউডসলি সমুদ্রে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন, কারণ স্থানীয় সময় ও প্রাথমিক সময়ের তুলনা করে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্যে যে নির্ভুল ঘড়ি দরকার তা তাঁর ছিল না। এর

ফলে চারটি জাহাজ ও দুহাজার লোক নিয়ে তিনি হারিয়ে যান ও প্রাণ হারান। এই ঘটনার ফলে বৃটিশ সরকার তখনকার হিসাবে বিশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন, সূক্ষ্ম সময়-মাপক ঘড়ি নির্মাণের জন্য যা অন্তত অর্ধ ডিগ্রির মধ্যে দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে পারবে। পরপর চারটি ক্রনোমিটার বানাবার পর শেষপর্যন্ত ১৭৬১ সালে তিনি কৃতকার্য হয়ে পুরস্কার লাভ করেন।

এরপর অনেকরকম সংযোজন ঘটেছে ঘড়িতে। যেমন স্টপওয়াচ যা থামিয়ে একটি সময়ের পর্যায়কে মাপা যায়, বা স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি যা যে-কোনো রকম ঝাঁকি থেকে স্প্রিং-এর মধ্যে শক্তি জমা করে। এছাড়া জুয়েলের ব্যবহার ঘড়িতে ঘর্ষণজনিত বাধা ও ক্ষয়কে কমিয়ে এনেছে।

কিন্তু এসব যান্ত্রিক উন্নয়নকে অতিক্রম করে ঘড়ির জগতে নতুন অগ্রগতি এল বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক ওয়াচ-এর উদ্ভাবনে। বৈদ্যুতিক শক্তিকে তিনভাবে মূলত ব্যবহার করা হয়েছে ঘড়িতে। এক হল একটি কুণ্ডলী ও একটি স্থায়ী চুম্বকের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যালেন্স ও হেয়ার স্প্রিং-এর স্পন্দনকে চালনা করা। দ্বিতীয় উপায় হল একটি বিদ্যুৎ-চুম্বক অস্থায়ী চৌম্বকপদার্থের তৈরি ব্যালেন্সকে আকর্ষণ করানো এবং তৃতীয় উপায় হল একটি টিউনফর্ককে ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে অনুনাদী করা এবং এর অপরিবর্তী ও উচ্চকম্পনমানকে কাজে লাগানো ঘড়ি চালনায়। ইলেকট্রনিক এই ঘড়িতে ঘর্ষণ অত্যন্ত কম বলে এবং ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে থেমে যাওয়ার আগে এর স্পন্দনহারের পরিবর্তন হয় না বলে অত্যন্ত নির্ভুল সময় এ থেকে মাপা যায়।

এরপর যে বড় অগ্রগতি নির্ভুল সময় মাপার ক্ষেত্রে এসেছে তা হল আণবিক ঘড়ির আবিষ্কার।

অ্যামোনিয়া-অণুতে ত্রিভুজের তিনকোণায় সাজানো তিন হাইড্রোজেন-পরমাণুর মধ্যদিয়ে নাইট্রোজেন-পরমাণুর স্বাভাবিক ওঠানামা একটি বিশেষ হারেই মাত্র ঘটতে পারে এবং সেই হারটি হচ্ছে সেকেন্ডে ২ হাজার ৩৮৭ কোটি সাইকেল। একটি কোয়ার্জ কেলাসের কম্পন থেকে তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে তা থেকে ২ হাজার ৩৮৭ কোটি সাইকেলের রেডিওতরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় এক্ষেত্রে। যতক্ষণ এ নির্দিষ্ট কম্পনহারের রেডিওতরঙ্গ অ্যামোনিয়া-ভর্তি চেম্বারের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়, অ্যামোনিয়া-অণুগুলো তা শোষণ করে নেয়। কম্পনহারের কোনো ব্যতিক্রম হলেই অ্যামোনিয়া-অণুগুলো তা শোষণ করে নিতে পারে না বলে চেম্বার থেকে এই রেডিওতরঙ্গের শক্তিটা পার হয়ে আসে। রেডিওতরঙ্গের সঙ্গে সরাসরিভাবে আসা এবং অ্যামোনিয়া চেম্বারের মধ্যদিয়ে আসা তরঙ্গের তুলনা থেকে বোঝা যায় কোয়ার্জ কেলাসটার কম্পনহার নির্ধারিত কম্পনহার থেকে কোনদিকে সরে গেছে এবং সেভাবে এর কম্পনহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পারমাণবিক ঘড়ির আর-একটি দৃষ্টান্ত হল সিজিয়াম ঘড়ি। এক্ষেত্রে কম্পনহারকে ৩০,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব,

যার অর্থ হল দশ হাজার বছরে এক সেকেন্ডের বেশি ভুল হবে না এই ঘড়িতে। সিজিয়ামের পরিবর্তে রুবিডিয়াম বা হাইড্রোজেন-পরমাণু ব্যবহৃত হতে পারে নির্ভুল সময় মাপার জন্যে এবং পরিকল্পনা চলছে এমন ঘড়ি নির্মাণের যা দিয়ে লক্ষ-কোটি ভাগের এক ভাগের মধ্য নির্ভুলভাবে সময়কে মাপা সম্ভব হবে।

পরমাণুর কম্পনকে পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ রেডিওতরঙ্গকে মোচন করার ব্যাপারটিকে ব্যবহার করে নির্মাণের পরিবর্তে পরমাণুর কম্পনকে সরাসরি ব্যবহার করার চেষ্টা এখন সফল হয়েছে, যার ফলে *MASER clock* আমরা পেতে পারি। এর ফলে সময়কে আরো একধাপ সূক্ষ্মভাবে মাপা সম্ভব হবে।

পরিবর্তনের সঙ্গে দীর্ঘ সময়কে যিনি সবচেয়ে বেশি গভীরভাবে সম্পৃক্ত করেছেন তিনি হলেন চার্লস ডারউইন। তাঁর 'অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থ বৃহৎকালের ধারণার ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছে। দীর্ঘ বিশ বছরের পরিশ্রমে সংগ্রহ-করা অসংখ্য দৃষ্টান্ত-সম্বলিত তার নিশ্ছিদ্র যুক্তি প্রমাণ করল, প্রাণিজগতের উদ্ভব ঘটেছে এক প্রচণ্ড দীর্ঘকালব্যাপী, ধীরগতি বিবর্তনের মধ্যদিয়ে। বিবর্তনের ধারণাটি অবশ্য ডারউইনের সম্পূর্ণ নতুন দেয়া নয়, এমনকি তাঁর পিতামহ এরাসমাস ডারউইনও প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড সামাজিক ও ধর্মীয় বাধার বিরুদ্ধে বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠা করার যে অকাট্য যুক্তি চার্লস ডারউইন উপস্থিত করেছিলেন সেটাই ছিল বিপ্লবাত্মক।

প্রাণিজগতের বিবর্তন হারের কিছু প্রমাণ থেকে ডারউইন অনুমান করলেন যে, পৃথিবীতে সমগ্র বিবর্তন ঘটতে অন্তত কয়েক হাজার লক্ষ বছর লেগেছে। কিন্তু পৃথিবীর বয়স নিয়ে সংঘাত বাধল বিখ্যাত পদার্থবিদ উইলিয়াম টমসনের সঙ্গে। টমসন তাপবিদ্যার সূত্র ধরে দেখালেন সূর্য যে-হারে তাপ বিকিরণ করছে তাতে ৫০ কোটি বছরের বেশি এর বয়স হতে পারে না, এবং জীবনধারণের মতো তাপমাত্রায় পৃথিবী নিশ্চয়ই কয়েক নিযুত বছরের বেশি আগে নেমে আসেনি।

পৃথিবীর বয়স নিয়ে ডারউইন ও টমসনের বিরোধ মেটানো তখন সম্ভব হয়নি। কারণ সূর্যের শক্তির উৎস সম্পর্কিত সঠিক তথ্য তখনো ছিল অনাবিষ্কৃত, সেই সঙ্গে দীর্ঘ সময় মাপার নিপুণতর পদ্ধতিগুলোও।

এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল হেনরি বেকরেলের তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভেঙে ভিতর থেকে রশ্মি নির্গত হবার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত। রাসায়নিক প্রক্রিয়া অথবা বাহ্যিক তাপ বা চাপ দ্বারা এর বিকিরণ-হার নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বলা যেতে পারে এই তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার বৃহৎ সময়কে মাপা ও বোঝার ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জল, স্থল, বায়ুতে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অবস্থিতি এমন নিপুণ একটি ঘড়ি তুলে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে যে, যে-কোনো প্রস্তরখণ্ড বা জীবাশ্মের বয়স এখন সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব।

তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম থেকে সময় মাপার কৌশলটি অবশ্য আবিষ্কার করেন লর্ড রাদারফোর্ড। একটি তেজস্ক্রিয় বস্তুর প্রতিটি পরমাণুর ভেঙে পড়ার একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা আছে যা ঐ বিশেষ জাতের প্রতিটি পরমাণুর ক্ষেত্রেই সমান। ফলে যতটা সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক সংখ্যক পরমাণু ভেঙে পড়ে, ঠিক তত সময় পরই আবার বাকি পরমাণুর অর্ধেকসংখ্যক ভেঙে পড়ে। ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে-কোনোসংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণুর অর্ধেকসংখ্যক ভেঙে যাবার সময় হল ৪৫০ কোটি বছর। রাদারফোর্ড দেখলেন যে একটি তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম-পরমাণু ভেঙে সিসায় রূপান্তরিত হবার সময় এর থেকে আলফা কণিকারূপে নির্গত রশ্মি আটটি হিলিয়াম-পরমাণুর সৃষ্টি করে। ফলে একটি প্রস্তরখণ্ডে কতটা হিলিয়াম গ্যাস ও কতটা ইউরেনিয়াম আছে তার তুলনা থেকে হিসাব করা সম্ভব কত সময় ধরে ইউরেনিয়াম ঐ পাথরে তেজস্ক্রিয়ভাবে সিসা তৈরি করে আসছে।

এই কৌশলটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল যে হিলিয়াম গ্যাস খুব সহজেই উড়ে যায়, ফলে এর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ কষ্টসাধ্য। ১৯৩০ সালে এই সমস্যা দূর হল ইউরেনিয়াম ও সিসার আইসোটোপ আবিষ্কৃত হবার পর। আইসোটোপের বৈশিষ্ট্য হল এদের পারমাণবিক ওজন আলাদা। কিন্তু নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনের সংখ্যা অভিন্ন বলে এদের রাসায়নিক ধর্মও অভিন্ন। সাধারণত ইউরেনিয়াম (U^{238}) যখন ভেঙে পড়ে তখন যে সিসা দেয় তার পারমাণবিক সংখ্যা হল ২০৬ (Pb^{206}), পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহার্য অর্থাৎ ফিসনযোগ্য ইউরেনিয়াম (U-235) যে সিসার আইসোটোপ দেয় তা হল Pb^{207}। থরিয়াম ভেঙে যে সিসার আইসোটোপ দেয় তা হল Pb^{208}। এছাড়া যে সিসা স্বাভাবিকভাবে থাকে অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বিভাজনের দ্বারা সৃষ্ট নয় এমন আইসোটোপ Pb^{204}-ও থাকতে পারে পাথরে।

বিভিন্ন এসব সিসার আইসোটোপের পরিমাণ থেকে তুলনা করে ভিন্ন ভিন্ন হিসাবগুলো মিলিয়ে মিশ্র হিসাব দ্বারা কোনো ইউরেনিয়াম-ধারণকারী প্রস্তরখণ্ডের বয়স নির্ধারণ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে প্রাচীনতম যে-পাথরের বয়স নির্ধারণ করা গেছে তা প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর। কিন্তু পৃথিবীর বয়স স্বভাবতই তার চেয়ে বেশি। বিভিন্ন হিসাবমতে এখন মনে করা হচ্ছে এই বয়স প্রায় সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো কোটি বছর।

তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদির সাহায্যে সময় নির্ণয়ের একটি অসুবিধা হল, এদের অর্ধজীবন দীর্ঘ হওয়াতে সময়ের হিসাবটাও অনিশ্চিত থেকে যায়, ফলে প্রায় কোটি বছরের মধ্যে হিসাব ভুল হতে পারে। কার্বন আইসোটোপ C^{14} থেকে বয়স নির্ধারণের যে কৌশল উইলার্ড এফ লিবি আবিষ্কার করেছেন ১৯৪৬ সালে তা নতুন এক পথ খুলে দিয়েছে সময়-মাপার। বিশেষ করে

সেইসব পদার্থের যা কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ। কার্বন আইসোটোপ C^{14}-এর অর্ধায়ু বা হাফ লাইফ হচ্ছে ৫ হাজার ৬০০ বছর। এই আইসোটোপের সৃষ্টি হয় নাইট্রোজেন-পরমাণু থেকে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে। অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে এই আইসোটোপ যে CO_2 তৈরি করে, সাধারণ CO_2-এর তুলনায় তার পরিমাণ মাত্র শতকোটি ভাগের একভাগ। কোনো গাছ যখন এই কার্বন আইসোটোপের তৈরি CO_2 গ্রহণ করে তখন তা এর দেহে শোষিত হয়ে যায়। কিন্তু গাছটি মরে যাবার পর এই তেজস্ক্রিয় C^{14} ও সাধারণ C^{12} রূপান্তরিত হতে থাকে। ফলে C^{14} ও C^{12}-এর পরিমাণ তুলনা করে গাছটি কতদিন আগে মারা গেছে তা নির্ধারণ সম্ভব। সব প্রাণীদেহেই যেহেতু কার্বন রয়েছে, ফলে কার্বনের এই আইসোটোপ থেকে সব জীবাশ্মেরই বয়স নির্ধারণ সম্ভব। প্রত্নতত্ত্বের অনেক সমস্যা সময়-মাপার এই পদ্ধতিতে সমাধান করা গেছে।

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে দীর্ঘ সময় মাপার কৌশলটি এতই সার্বিক যে অসম্ভব দীর্ঘ সময় এর দ্বারা নিরূপণ সম্ভব। যেমন সিসার আইসোটোপ Pb^{204}-এর অর্ধজীবন বা হাফলাইফ হল একশো চল্লিশ হাজার কোটি বছর। ফলে এই আইসোটোপটি নিঃশেষিত হবার অনেক আগেই সূর্যের মৃত্যু ঘটবে।

আমরা যদি মহাবিশ্বের বয়স মাপতে চাই এর সৃষ্টির সময় থেকে, সে পথও প্রকৃতি আমাদের কাছে তুলে দিয়েছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টির আদিপর্বে অণু-পরমাণু যখন ছিল না; এমনকি প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদি মৌলিক কণিকাগুলোও প্রচণ্ড চাপে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অন্য এক অজ্ঞাত রূপ নিয়েছিল; প্রচণ্ড ঘনীভূত অস্থির সেই বিশ্ব মহাবিস্ফোরণের মধ্যদিয়ে যখন এর বস্তুপিণ্ডকে ছড়িয়ে দিল চতুর্দিকে; সেই মুহূর্ত থেকে এখন পর্যন্ত কতকাল প্রবাহিত হয়েছে তা ধরা রয়েছে দূরতম নক্ষত্রের আলোর রঙে। কারণ বিশ্বসৃষ্টির মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বের বিভিন্ন ছায়াপথ পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে এবং ছায়াপথ যত দূরের ততবেশি দ্রুত তা অপসৃত হচ্ছে। এই দ্রুতগতিতে সরে যাবার ফলে এর আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যাচ্ছে— অর্থাৎ লাল হয়ে যাচ্ছে। যেমন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলে দূরে চলে যাওয়া ট্রেনের শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হতে থাকে অর্থাৎ শব্দের কম্পনমান যায় কমে। এই হিসাব থেকে মহাবিশ্বের জন্ম এক হাজার বা দেড় হাজার কোটি বছর আগে। এরও আগে কি সময় ছিল? দেড় হাজার কোটি বছর আগের কোনো ঘটনা আমরা মাপতে পারি না, ফলে এর চেয়ে দীর্ঘতর অতীত আমাদের বিজ্ঞানচেতনায় নেই।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আলোকে নিউটনীয় নানা ধারণার রূপান্তর

সময় সম্পর্কে আমাদের আধুনিক যে ধারণা তা বিকাশ লাভ করেছে দীর্ঘ এক বিবর্তনের ধারায়, যা সম্ভবত এখনো অসম্পন্ন। অভিজ্ঞতা লাভ ও জ্ঞানের বিকাশের যে নানা ক্ষেত্র, তা সময়ের ধারণাতেও বৈচিত্র্য এনেছে। ধর্মযাজক, দার্শনিক, কবি, শিল্পী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবেত্তা, জীববিজ্ঞানী, ভূবিজ্ঞানী, পদার্থবিদ—সবাই প্রভাব রেখেছেন সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা নির্মাণে ও উপলব্ধি সৃষ্টিতে। বস্তুত সময় শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞান বা তাত্ত্বিক ধারণার বিষয়রূপেই উপলব্ধ হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে সময় মেনে চলার প্রয়োজনে এবং সময় মাপার নানা কৌশলের উদ্ভাবন ও এদের ব্যবহারের ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের মনেও একটি কালিক চেতনার উদ্ভব ঘটেছে।

সময় সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ ও সেই ধারণার রূপান্তরে অভিজ্ঞতার বিচিত্র জগৎ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রভাব নিয়ে আলোচনা প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সনাতনী পদার্থবিদ্যার সৃষ্ট সময়ের ধারণাকে এমন গভীরভাবে বদলে দিয়েছে যে, এই পরিবর্তন বা রূপান্তরের নাটকীয়তা এবং এর আনুষঙ্গিক অভিঘাত উপলব্ধি করতে নিউটনীয় সময়ের ভিত্তি কী? তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সময় ও আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার পটভূমিরূপে সময় সম্পর্কে আপেক্ষিতার তত্ত্বপূর্ব সনাতনী পদার্থবিদ্যার ধারণাটি তাই সংক্ষেপে উল্লিখিত হবে প্রথমে।

সনাতনী পদার্থবিদ্যার সময়ের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে গ্যালিলিও একজন প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি। ১৬৩৮ সালে প্রকাশিত *Discourse on two New Sciences* গ্রন্থের গতিবিদ্যার অংশে সময়ের সুষম সরলরৈখিক প্রবাহের ধারণাকে গ্যালিলিও উপস্থিত করেন। জ্যামিতিক সরলরেখার সঙ্গে সময়ের তুলনা টানার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি না হলেও এই ধারণাকে সুস্পষ্ট করা এবং গাণিতিকভাবে উপস্থাপনায় তাঁর অবদান ছিল মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গতিবিদ্যার বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করার ভেতর দিয়ে সরণ, গতি, ত্বরণ ও সময়ের ধারণাকে গাণিতিক ও পরিমাপযোগ্য ভৌতরাশিরূপে গ্যালিলিও ব্যবহার করেছেন।

সময় নির্বস্তুক, প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শন-অসাধ্য গাণিতিক রাশি হলেও, তা যে পরিমাপযোগ্য একটি ভৌত ধারণারূপে পদার্থবিদ্যায় স্থান পেয়েছে তা গতিবিদ্যার উদ্ভবের কল্যাণে। এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, গ্যালিলিও-এর উদ্ভাবিত গতিবিদ্যা (Kinematics) নিউটনের বলবিদ্যার (Dynamics) ভিত্তি ও পটভূমিরূপে কাজ করেছে।

গালিলিও-এর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হবার তিরিশ বছর পর লেখা সময় সম্পর্কে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বই হল, আইজাক ব্যারোর *Geometircal Lectures*. আইজাক ব্যারোর এই বক্তৃতামালার গুরুত্ব রয়েছে দুইদিক থেকে। প্রথমত সময় সম্পর্কে জ্যামিতিক ও গাণিতিক ধারণাকে তিনি গভীর ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, দ্বিতীয়ত সময় সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ধারণা নিউটনের ওপরে গভীর প্রভাব রেখেছে। নিউটন ১৬৬৯ সালে ব্যারোর স্থলাভিষিক্ত হন কেম্ব্রিজের লুকাসিয়ান অধ্যাপকের পদে।

ব্যারো খুব সাবধানতার সঙ্গে সময়ের ধারণাকে গতির ধারণা থেকে পৃথক করেন। তাঁর মতে সময় কোনো প্রকৃত অস্তিত্বকে বুঝায় না, কিন্তু অস্তিত্বের নিরবচ্ছিন্নতা ও পারম্পর্যকে সম্ভব করার একটি উপায়রূপে কাজ করে; যেমন স্থান একটি দৈর্ঘ্যকে স্থান করে দেয় মাধ্যমরূপে, কিন্তু এর নিজস্ব কোনো দৈর্ঘ্য নেই। সময় কোনো গতিকে বুঝায় না এবং স্থিরতাকেও বুঝায় না। আমরা চলি অথবা থেমে থাকি, সময় এর নিজস্ব ধারায় অতিবাহিত হয়। সময় গতিকে মাপতে সাহায্য করে। গতি না থাকলে সময়ের প্রবাহকে আমরা মাপতে পারি না। সময়কে তাই শেষপর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে ধরে নিতে হয় এবং একে কোনো একটি সুষম গতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন, কোনো নক্ষত্র, সূর্য বা কোনো গ্রহের গতি। কিন্তু ব্যারো গ্রহ-নক্ষত্রের গতিকে সময় মাপার মৌলিক বা প্রধান মাপকাঠিরূপে মাপতে চাননি। বরং যেসব ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটে এবং নানাভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ধরা পড়ে, সেগুলোই সময়ের পরিমাপক।

ব্যারো সময়কে মূলত একটি গাণিতিক ধারণারূপে গণ্য করতেন, যার সঙ্গে জ্যামিতিক রেখার মিল রয়েছে নানাদিক থেকে। একটি রেখাকে যেমন অনেকগুলো বিন্দুর সমাবেশরূপে গণ্য করা যায়, সময়ও তেমনি অনেকগুলো মুহূর্তের সমাবেশ, যা একটি মুহূর্তের প্রবাহ মাত্র। তিনি সময়কে একটি সরল বা একটি বক্র রেখার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন। এখানে তার ধারণা গ্যালিলিও-এর সময়ের ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল এবং তিনি অনেকটা মুক্ত ও সাধারণীকৃত ধারণা নিয়ে সময়কে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। গ্যালিলিও সময়ের একটি বিরতিকে একটি সরলরেখার অংশরূপে দেখতে চেয়েছেন। ব্যারো একটি

রেখার সঙ্গে সময়কে তুলনা করলেও, এই তুলনাকে বেশিদূর নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সময়কে তিনি মনে করতেন কোনো জিনিসের অব্যাহতভাবে টিকে থাকা। দুটো জিনিসের উদ্ভব ও অবসান যদি একই সঙ্গে ঘটে তাহলেই শুধু বলা হবে তারা একই সময় ধরে টিকে ছিল।

মোটকথা তিনি সময়কে একটি পৃথক বস্তুগত অস্তিত্ব দিতে চাননি। বরং একটি গাণিতিক ধারণা এবং বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্যকে তুলনা করার অবলম্বনরূপে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। সময় যে আমাদের চলা বা থেমে থাকা, এবং আমাদের জেগে থাকা অথবা ঘুমিয়ে থাকার ওপরে নির্ভর করে না, বরং নিজস্ব ধারায় চলে—সময় সম্পর্কে ব্যারোর এই ধারণা নিউটনকে যে প্রভাবিত করেছিল, তা আমরা নিউটনের ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত প্রিন্সিপিয়ায় দেখতে পাই। নিউটন এখানে বলেছেন যে, পরম এবং গাণিতিক বিশুদ্ধ সময়ের নিজস্ব প্রকৃতি থাকে এবং নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হয় সুষমভাবে। বাহ্যিক কোনোকিছুর দ্বারা প্রবাহিত হয় না। নিউটন এটি স্বীকার করেছেন যে, বাস্তবে হয়তো এমন কোনো বস্তু পাওয়া সম্ভব নয় যার সাহায্যে সময়ের সুষম প্রবাহকে মাপা যাবে। কিন্তু একটি আদর্শ ও সুষমভাবে প্রবাহিত সময়ের অস্তিত্ব থাকতে হবে।

নিউটনের প্রদত্ত এই সময়ের ধারণার সঙ্গে সময় সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণার বেশ মিল আছে। আমরা সাধারণভাবে এই ধারণাই পোষণ করি যে, সময়ের কোনো শুরু বা শেষ নেই। সময় অনন্ত। সময় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সুষমভাবে প্রবাহিত এবং যা-কিছু ঘটুক না কেন, তা সময়কে প্রভাবিত করে না। নিউটনের প্রদত্ত সময়ের ধারণা সমকালীন অনেক দার্শনিকদেরও প্রভাবিত করেছিল। আমরা দার্শনিক লকের ১৬৯০ সালে প্রকাশিত *Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থে এর প্রতিফলন দেখতে পাই। লক সেখানে বলেছেন যে, সময় হচ্ছে এক অন্তহীন রেখার মতো—যাকে বদলানো যায় না, বিকৃত করা যায় না বা বৃদ্ধি করা যায় না। সময় হচ্ছে সমস্ত ঘটনার পরিমাপক। এই মুহূর্তটি সমস্ত বস্তুজগতের জন্য অভিন্ন, যেন সবমিলে একটি অস্তিত্ব; আমরা সত্যিকার অর্থে বলতে পারি যে, এই বিশেষ মুহূর্তে বিশ্বের যা-কিছু আছে তা একটি মুহূর্তের মধ্যে অবস্থান করছে।

সময় সম্পর্কে নিউটনের প্রদত্ত ধারণা সাধারণ্যে এবং কিছু দার্শনিকদের কাছে গৃহীত হলেও, কিছু কিছু দার্শনিক যথার্থভাবেই এর সমালোচনা করেন। যেমন কোনো কোনো দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, সময় যদি কোনোকিছুর প্রবাহ হয় তাহলে তাকে হতে হবে সময়ের মধ্যেই ঘটনার প্রবাহের এক রাশি। কিন্তু এ-ধরনের বক্তব্যের কোনো অর্থ হয় না। অন্যদিকে সময়কে যদি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা হয়, অর্থাৎ সময় যদি সব ঘটনা ও বস্তুনিরপেক্ষ হয়, তাহলে

সময়ের প্রবাহ সুষম নয়—এ কথারও কোনো অর্থ হয় না। এখন সময়ের প্রবাহ সুষম নয়, একথার যদি অর্থ না পাওয়া যায়; সময়ের প্রবাহ সুষম, একথারও কোনো অর্থ থাকে না।

দার্শনিকদের এই কূটতর্কের উত্তরে হয়তো বলা যেতে পারে, নিউটন একজন পদার্থবিজ্ঞানী যাঁর মূল লক্ষ্য পরিমাপযোগ্য বাস্তব ধারণা নিয়ে কাজ করা, দার্শনিক বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া নয়। কিন্তু এই যুক্তিতেও নিউটনের প্রদত্ত সময়ের ধারণাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ নিউটনের পরম, সুষম আদর্শ সময় যেমন পরিমাপযোগ্য নয়, তেমনি অপরিহার্যও নয়। আমরা লক্ষ্য করব যে, নিউটনের গতিবলবিদ্যার সূত্রে সময় যেভাবে আসে এবং যেভাবে পরিমাপযোগ্য হয়ে ওঠে, সেখানে পরম, নিরপেক্ষ, অনন্ত সময়ের কোনো অবস্থান নেই। বরং বলতে পারি নিউটন সময় সম্পর্কে যে-ধারণা উপস্থিত করেছিলেন, সেটা ছিল তার আপন প্রত্যয়—একধরনের স্বজ্ঞা বা উৎপ্রেক্ষা। বিজ্ঞানের জগতে স্বজ্ঞা বা উৎপ্রেক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সত্য; কিন্তু তা শেষপর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত না হলে, বৈজ্ঞানিক ধারণারূপে উত্তীর্ণ হয় না। সময় সম্পর্কে নিউটনের ধারণা যে টিকে ছিল তার কারণ তার বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার প্রতি সাধারণ্যে ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে নিঃশর্ত ভক্তি।

নিউটনের সমকালীন বিখ্যাত গণিতবেত্তা ও দার্শনিক লাইবনিজ সময় সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি সময়ের পরম ও নিরপেক্ষ অস্তিত্বকে স্বীকার না করে, ঘটনাকে মৌলিক বলে মনে করতেন। তাঁর মতে একটি মুহূর্ত বলতে একগুচ্ছ ঘটনার একই সঙ্গে সংঘটিত হওয়া বোঝায়। এখানে ঘটনা বা ঘটনাসমষ্টিই মুহূর্তটিকে সংজ্ঞায়িত করছে। লাইবনিজ সময়কে একটি বিমূর্ত ধারণা বলে গ্রহণ করেছিলেন, যার নিজস্ব কোনো বাস্তবতা নেই। তাঁর কাছে সময় ছিল ঘটনামালা যে পরম্পরায় ঘটে, তারই পর্যায় বা বিন্যাস। লাইবলিজের সময় সম্পর্কিত দর্শনের ভিত্তি ছিল এই যে, কোনোকিছুই কারণ ছাড়া ঘটতে পারে না। অর্থাৎ সমস্ত ঘটনামালা কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত একটি সমন্বিত গঠন।

লাইবনিজ যুক্তি প্রয়োগ করেন এইভাবে : ধরা যাক কেউ প্রশ্ন করছে : বিধাতা সবকিছু যখন সৃষ্টি করেছেন, কেন তার একবছর আগে তা সৃষ্টি করলেন না? ধরা যাক এ থেকে কেউ সিদ্ধান্তে এলেন যে, বিধাতা সবকিছু একসময় সৃষ্টি করেছেন যা তিনি একবছর আগেও করতে পারতেন, এবং তা না করার জন্য কোনো কারণ ছিল না। এই সিদ্ধান্ত তখনই গ্রহণযোগ্য, যদি সময় সমস্ত ঘটনা-নিরপেক্ষ হয়। কারণ সেক্ষেত্রে ঘটনামালা কেন একসময় না ঘটে অন্য সময় ঘটবে তার কোনো কারণ নেই—যদি ঘটনাগুলোর ঘটার পর্যায় ঠিক থাকে। লাইবনিজ এ থেকে দাবি করলেন যে, ঘটনা-নিরপেক্ষভাবে সময়ের পরম অস্তিত্ব

আছে—এই কল্পনা গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে মহাবিশ্ব এখন যেমন, এবং এক বছর আগে মহাবিশ্ব সৃষ্ট হলে যা হত, তার মধ্যে পার্থক্য করার কোনো উপায় নেই। কোনো মুহূর্তের চাইতে, যে ঘটনামালার দ্বারা সেই মুহূর্তটি চিহ্নিত, তা বেশি মৌলিক। সময় সম্পর্কে লাইবনিজের এই তত্ত্বকে সময়ের সম্পর্কভিত্তিক তত্ত্ব বা *relational theory of time* বলা হয়। এর মূলকথা হল : আমরা সময়ের ধারণা পাই ঘটনা থেকে, সময় থেকে ঘটনার ধারণা লাভ করি না।

লাইবনিজের ধারণা হচ্ছে আমরা যখন দুটো ঘটনাকে যুগপৎ ঘটনা বলি তার অর্থ দুটো ঘটনা একই সময়ে ঘটেছে তা নয়। বরং দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটেছে বলে দুটো ঘটনার কাল অভিন্ন, অর্থাৎ একটি মুহূর্তকে দুটো ঘটনা মিলে নির্ধারণ করেছে। যেসব ঘটনা যুগপৎ ঘটেনি তাদের মধ্যে কালিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য আমরা নিচের ধারণাটি ব্যবহার করতে পারি। সমস্ত ঘটনা যা একই সঙ্গে অর্থাৎ যুগপৎ ঘটেছে, তাদেরকে একত্রে মহাবিশ্বের একটি পর্যায় বলতে পারি। এই পর্যায়গুলো একটির-পর-একটি সাজানো—যেমন গতকাল, আজ ও আগামীকাল। আমরা দেখব, সময় সম্পর্কে লাইবনিজের এই ধারণা, পদার্থবিদ্যার আধুনিক অগ্রগতির আলোকে নিউটনের সময়-সম্পর্কিত ধারণার চাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু অষ্টদাশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিউটনের কালিক ধারণা বেশি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে এই ধারণাটিই সময় সম্পর্কে গ্রহণ করেছে যে, একটি অনন্য অভিন্ন বিশ্বজনীন পরম সময় নিজস্ব অধিকারেই প্রবহমান। বিশ্বের সবকিছু ঘটেছে এই পরম সময়ের মধ্যে। নিউটনের এই পরম সময় যে সমর্থন লাভ করেছে, তার সবটাই নিউটনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ঘটেছে বলা যাবে না। শিল্পবিপ্লবের ভেতর দিয়ে যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবার ফলে ঘড়ির কাঁটার একটানা গতিকে সময়ের প্রবাহের সঙ্গে মানুষ এক করে নিয়েছে। পরম সময়ের ধারণা এমন গভীরভাবে মানুষের মনে স্থান করে নেয় যে, এর কোনো পরিবর্তন মনস্তাত্ত্বিকভাবে তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। এর একটি দৃষ্টান্ত হল প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে সময়কে গ্রীষ্মকালে এক ঘন্টা আগিয়ে দেওয়াকে মানুষ পরম সময়ের ওপর হস্তক্ষেপ বলে প্রতিহত করতে চেয়েছে।

সময় সম্পর্কে নিউটনের ধারণা ব্যাপকভাবে গৃহীত ও গভীরভাবে সমর্থিত হবার পটভূমিতে আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে। স্বভাবতই এই তত্ত্ব প্রচণ্ড এক অভিঘাত সৃষ্টি করে সময় সম্পর্কে মানুষের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ধারণা ও বিশ্বাসে।

নিউটনের সময়ের ধারণায় ফাটল আবিষ্কার

নিউটনের গতিবলবিদ্যার নিয়মকে ভিত্তি করে যে পদার্থবিদ্যা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে আলো সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের তত্ত্বকে সমন্বিত করতে গিয়েই আইনস্টাইন সময়ের মূল প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এখানে সবচেয়ে যেটি লক্ষণীয় বিষয় তা হল, সময় সম্পর্কে নিউটনের ধারণা বা বিশ্বাস নিউটনের উদ্ভাবিত গতিবলবিদ্যার সূত্রের অনিবার্য ফসল নয়। এমনকি সম্পর্কযুক্তও নয়। বস্তুত নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে পরম সময় নির্ধারণের কোনো পথ নেই। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত গ্রন্থ প্রিন্সিপিয়াতে নিউটন বলেছেন যে, একটি স্থানকে যদি একটি সরলরেখায় সুষম গতি দেয়া যায় অথবা স্থির করে রাখা হয়, এর মধ্যে বস্তুমালার যে পারস্পরিক গতি তার কোনো পরিবর্তন হবে না। এর অর্থ হল, আমরা যদি কোনো যান্ত্রিক পরীক্ষা চালাই পৃথিবীর উপরে স্থাপিত কোনো ল্যাবরেটরিতে, এবং একই পরীক্ষা পরিচালনা করি একটি জাহাজে যা অপরিবর্তী গতিতে একটি সরলরেখায় চলছে, তাহলে একই ফল আমরা পাব উভয়ক্ষেত্রে। যেমন, একটি পাথরকে যদি পড়তে দেয়া যায় উপর থেকে তাহলে দুই ক্ষেত্রেই একই ঘূরণ আমরা দেখতে পাব।

আসলে নিউটনের তত্ত্বই কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে : বস্তুর ওপরে গতিবলবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে আমাদের নির্ধারণ করবার উপায় নেই যে, পরীক্ষাগারটি মহাশূন্যের মধ্যে স্থির হয়ে আছে অথবা একটি সুষম সরলরৈখিক গতিতে কোনো একদিকে ছুটছে। আপেক্ষিক গতির এই নিয়ম সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ম্যাক্সওয়েলের আলোকতরঙ্গের বেলায় ধারণাগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করে। কারণ ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গকে মনে করা হত বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত স্থির একটি ইথারসমুদ্রে সৃষ্ট ঢেউয়ের প্রবাহ, যার গতি সেকেন্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার। নিউটনের গতিবলবিদ্যার সূত্র থেকে পরম গতি নির্ধারণের সমস্যা ছিল। কারণ, কোনো পরম স্থির কাঠামো আমাদের জানা ছিল না। ইথারকে এখন সেই পরম স্থির কাঠামোরূপে কল্পনা করা হল।

আইনস্টাইনের বয়স যখন মাত্র ষোলো বছর, একটি বিষয় তাঁর কাছে বিরাট এক ধাঁধারূপে প্রতীয়মান হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি যদি আলোর গতিতে আলোর তরঙ্গ মুখের ওপর বসে ছুটতে থাকেন ইথারের ভেতর দিয়ে, তাহলে তিনি কী দেখবেন? আপেক্ষিক গতির সাধারণ নিয়মে আলোর তরঙ্গ অর্থাৎ ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গগুলো তখন প্রবহমান না হয়ে ঢেউখেলা পাহাড়ের মতো অবিচল মনে হবার কথা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আইনস্টাইন জানতেন যে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব নির্ভুল।

কারণ নানা পরীক্ষায় এই তত্ত্ব উত্তীর্ণ হয়েছে। আইনস্টাইনের মনে তখন এই ধারণার উদয় হল যে নিউটনের বলবিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন পদার্থবিদ্যার সূত্র আপেক্ষিক গতি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোনো স্থির কাঠামো এবং এর সঙ্গে সুষম গতিতে সরলরেখায় ধাবমান কাঠামোতে একইভাবে প্রযোজ্য—পদার্থবিদ্যার অন্যসব নিয়ম বা সূত্রের জন্যেও তা সত্য হতে হবে, এবং তা আলোর গতির ক্ষেত্রেও। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের বীজ তাঁর এই ধারণার মধ্যেই রোপিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে দীর্ঘ নয় বছর ধরে তাঁর এই ধারণাটির বিকাশ ঘটাতে হয়েছে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে। এর প্রধান কারণ, গতি ও সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তাঁর এই নতুন ধারণার বিরোধ ছিল প্রচণ্ড। আইনস্টাইন ভিয়েনার পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিক আর্নস্টম্যাকের যৌক্তিক দৃষ্টবাদের (Logical positivism) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত তিনি এই দর্শনকে অতিক্রম করে যান। এখানে উল্লেখ্য যে, আর্নস্টম্যাক আইনস্টাইনকে প্রভাবিত করলেও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদের মূলকথা হল, যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি এবং কোনো প্রতিজ্ঞা তখনই মাত্র অর্থ বহন করে, যদি তা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের দ্বারা যাচাইসাধ্য হয়। আইনস্টাইন যে-অর্থে এই দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে বলা যায়, তা হল তিনি তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে অপর্যবেক্ষণসাধ্য ধারণাকে বর্জন করেন, এবং আমরা যা পর্যবেক্ষণ করতে পারি তার মধ্যে সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হন।

আইনস্টাইন উপলব্ধি করেন যে, সময়ের পরিমাপ করা হয় যুগপৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে ভিত্তি করে। তাঁর কথায় : আমাদের সমস্ত বিচারে, যেখানে সময় উপস্থিত, যুগপৎ ঘটনার বিচার অনিবার্যভাবে উপস্থিত। অর্থাৎ আইনস্টাইন এই ধারণা উপস্থিত করেছেন যে, কোনো কালিক ব্যবধানের হিসাব করতে হলে যুগপৎ ঘটনার বিচার করে তা করতে হবে। যেমন একটি ট্রেনের ষ্টেশনে পৌঁছা ও ঘড়ির কাঁটার একটি নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করা। এইখানে এসে আইনস্টাইন আকস্মিকভাবে উপলব্ধি করলেন যে যুগপত্তের এই ধারণা অব্যবহিত ঘটনার জন্য সুস্পষ্ট হলেও, স্থানিক ব্যবধানে সংঘটিত দুই ঘটনার বেলায় এই যুগপত্তের ধারণা প্রযোজ্য নয়। আইনস্টাইনের অনুধাবনে যে ঘটনাটি দর্শকের কাছে সংঘটিত হল এবং যা দূরে সংঘটিত হল, তাদের মধ্যে যুগপত্ত নির্ভর করে দূরের ঘটনাটির আপেক্ষিক অবস্থান এবং ঘটনাকে প্রত্যক্ষকারীর সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রণালীর উপরে। দূরে সংঘটিত কোনো ঘটনার দূরত্ব যদি জানা থাকে, এবং সেইসঙ্গে ঘটনা থেকে সংকেত যে-গতিতে প্রত্যক্ষকারীর কাছে পৌঁছল তার মান, তাহলে সে ঘটনাটি ঘটার মুহূর্ত হিসাব করতে পারে এবং তা সম্পর্কিত করতে পারে তার

পূর্ব-অভিজ্ঞতার কোনো মুহূর্তের সঙ্গে। এই হিসাবটির করণ (Operation) প্রতিটি পর্যবেক্ষণকারীর জন্য ভিন্ন। কিন্তু এই বিষয়টি আইনস্টাইন উত্থাপন করার আগে এটি সবাই প্রচ্ছন্নভাবে ধরে নিয়েছিলাম যে, আমরা যখন কোনো ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার সময়ের সঙ্গে সেই ঘটনা সংঘটিত হবার সময়কে সম্পর্কিত করার নিয়মটি জানি, তখন সমস্ত প্রত্যক্ষিত ঘটনাকে একটি পরম সময়ের অনুক্রমের মধ্যে সাজাতে পারি, যা সব প্রত্যক্ষকারীর জন্য এক। আইনস্টাইন শুধু একে একটি নিছক অনুকল্পরূপেই মনে করলেন না, বরং বিভিন্ন জায়গায় থেকে কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষকারী যে, তাঁদের হিসাবের ভিত্তিতে, সেই ঘটনার জন্য অভিন্ন মুহূর্ত নির্ধারণ করবেন—এই অনুকল্পকেই বর্জন করার যুক্তি উপস্থিত করলেন।

আইনস্টাইনের মতে দূরে সংঘটিত ঘটনামালার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের তাৎক্ষণিক কোনো সংযোগ নেই। সময় সম্পর্কে সনাতনী তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বব্যাপী যুগপত্তের ধারণার ভিত্তিতে মনে করা হত যে, এ-ধরনের সংযোগ সম্ভব। আলোর গতি শূন্যের মধ্যে পর্যবেক্ষকের অথবা আলোর উৎসের আপেক্ষিক গতির ওপরে নির্ভর করে না, ফলে ধ্রুব; এবং যেসব প্রসঙ্গকাঠামো পরস্পরের সঙ্গে সুষম গতি রক্ষা করে, সেগুলোতে পদার্থবিদ্যার একই নিয়ম বা সূত্র প্রযোজ্য। এই দুই স্বীকার্যকে ভিত্তি করে আইনস্টাইন দেখালেন যে, পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট গতিতে চলছে এমন দুই পর্যবেক্ষকের কাছে একই ঘটনা যুগপৎ নয়। অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে একটি অভিন্ন একক মুহূর্ত বলে কিছু নেই। সময় কোনো পরম-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নয়। যে যুগপত্তের ধারণাকে ভিত্তি করে সময়কে পরিমাপ করা হয় তা যখন সংজ্ঞায়ন অসাধ্য, পর্যবেক্ষকের গতি নিরপেক্ষভাবে। সময়ও পর্যবেক্ষকের গতি নিরপেক্ষ নয়।

আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের স্বীকার্য প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, যেসব পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি আছে তাদের কাছে একই ঘটনা সাধারণভাবে ভিন্ন সময়ে ঘটবে। একজন পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে কোনো প্রসঙ্গকাঠামো যদি আপেক্ষিক গতিতে চলে, তাহলে সেই কাঠামোতে রাখা কোনো ঘড়ি পর্যবেক্ষকের কাছে মন্থরগতিতে চলবে। অর্থাৎ সেখানে সংঘটিত ঘটনামালার ক্ষেত্রে কালিক সম্প্রসারণ ঘটবে। যেমন, যমজ ভাইয়ের একজন যদি রকেটে করে দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়, এবং অন্য ভাই যদি পৃথিবী থেকে সেই ভাইয়ের সময় গণনা করে, সে দেখবে তার নিজের তুলনায় তার ভাইয়ের বয়স ধীরগতিতে বাড়ছে। মজার ব্যাপার হল, রকেটযাত্রী ভাই একইভাবে দেখবে যে পৃথিবীতে অবস্থানকারী তার ভাই তার তুলনায় ধীরগতিতে বার্ধক্য লাভ করছে। এর কারণ, পরমভাবে গতি নির্ধারণ সম্ভব নয় বলে, প্রত্যেকের কাছেই মনে হবে অন্যজন ছুটছে তার তুলনায়। যেহেতু সময় গতি-নিরপেক্ষ নয়, এবং বিশ্বজুড়ে

অভিন্ন একক সময় বলে কিছু নেই, পরমভাবে এটি মীমাংসিত হবার প্রয়োজনও নেই, কার বয়স আসলে ধীরগতিতে বাড়ছে। দুজনের বক্তব্যই আপন প্রসঙ্গকাঠামোর সাপেক্ষে সঠিক। যদি পরিমাপগতভাবে পরস্পরের সময় হিসাব করতে হয়, তাহলে দেখা যাবে, পৃথিবীতে অবস্থানকারী ভাইয়ের কাছে নিজের অতিবাহিত সময় যখন T_0, একক রকেটযাত্রী ভাইয়ের অতিবাহিত সময় তখন তার কাছে $T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, এখানে v হচ্ছে দুজনের আপেক্ষিক গতি এবং c আলোর গতি। রকেটযাত্রী ভাইয়ের নিজস্ব ঘড়ি কিন্তু তার কাছে স্বাভাবিক গতিতে চলবে। তার কাছে বরং মনে হবে তার নিজের ঘড়িতে অতিবাহিত সময় যদি T_0 হয়; তার কাছে ভাইয়ের ঘড়িতে অতিবাহিত সময় হল $T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

আইনস্টাইনের ষোলো বছরের সেই ধাঁধাটির সমাধান এখন পাওয়া গেল। প্রথমত আলোর গতিতে ছোটা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি এমন কোনো ঘড়িকে কল্পনাও করা যায় যা আলোর গতিতে ছুটছে, তাহলে সেখানে সংঘটিত সমস্ত ঘটনাই সময়ের বিন্দুতে জমাট বেঁধে গেছে বলে অন্যের কাছে মনে হবে। সময় সেখানে স্তব্ধ হয়ে যাবে।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশিত হবার প্রায় দুই দশক আগে, ১৮৮৭ সালে, মাইকেলসন ও মর্লি তাঁদের বিখ্যাত এক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। এই পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল ইথারের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর গতি পরমভাবে পরিমাপ করা। ইথারকে যদি মনে করা হয় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এক মাধ্যম, যার ভিতর দিয়ে আলোক তরঙ্গ প্রবাহিত, তাহলে পৃথিবী যে সূর্যকে সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিতে প্রদর্শন করছে, তা আলোর গতিকে প্রভাবিত করার কথা। অর্থাৎ কেউ যদি পৃথিবীর গতির দিকে কোনো আলো পাঠিয়ে প্রতিফলিত অবস্থায় একে ফিরিয়ে আনে, এবং একই আলোকে পৃথিবীর গতির আড়াআড়ি পাঠিয়ে একই দূরত্ব থেকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে নিয়ে আসে— দুইয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঘটার কথা। এই ব্যাপারটি বোঝার জন্য আমরা কল্পনা করতে পারি : একজন এক স্রোতস্বিনী নদীর স্রোতের দিকে সাঁতার কেটে যাচ্ছে এবং স্রোতের বিরুদ্ধে ফিরে আসছে একবার, এবং আর-একবার স্রোতের আড়াআড়ি সাঁতার কেটে যাচ্ছে এবং ফিরে আসছে। দুই ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন-কাল কিন্তু ভিন্ন হবে। মাইকেলসন ও মর্লি চমৎকার এক যন্ত্রের সাহায্যে আলোর ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটি চালালেন। তাঁরা আলোকে প্রেরণ করলেন ৪৫° কোণ করে রাখা এমন এক আয়নার উপরে যার ভিতর দিয়ে অর্ধেক আলো প্রতিসরিত হয়ে চলে যায় দশ মিটার দূরে রাখা এক আয়নার দিকে, এবং

বাকি অর্ধেক আলো যায় ৯০° কোণ করে দশ মিটার দূরে রাখা অন্য এক আয়নার দিকে।

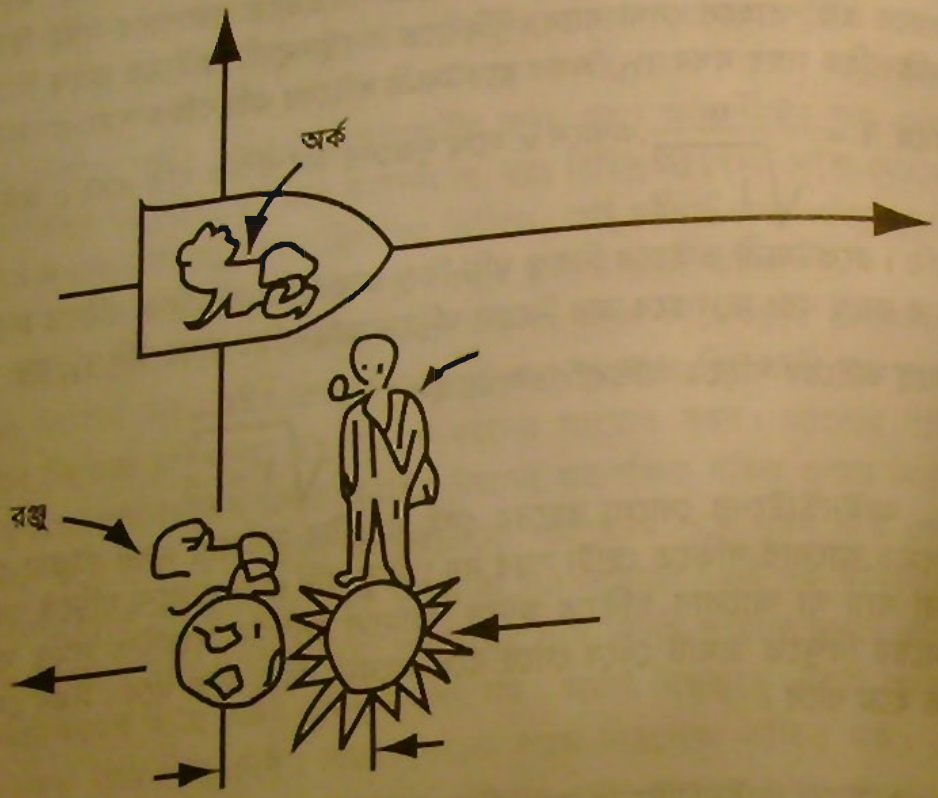

চিত্রে রঞ্জু আর মঞ্জু দুই যমজ ভাই। রঞ্জু ছুটছে রকেটে করে প্রায় আলোর গতিতে। মঞ্জু বুড়ো হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু রঞ্জু তার দৃষ্টিতে ছোট শিশুভাই হয়ে আছে। কারণ, রঞ্জুর অবস্থান-ফ্রেম থেকে মঞ্জুর সময় চলছে অত্যন্ত ধীরে।

এই দুই আলোই প্রতিফলিত হয়ে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়। ইথারকে যদি পরম স্থির একটি মাধ্যমে ভাবা হয়, আলোর গতি এই দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে, এবং এই দুই আলোর রশ্মি একই সময়ে ফিরে না এসে একটু ভিন্ন সময়ে ফিরে আসবে। সময়ের এই ব্যবধান যদি এত সামান্যও হয় যা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক ভগ্নাংশ অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট, তাহলেও তা তাঁদের উদ্ভাবিত ইন্টারফেরোমিটারে ধরা পড়বে। বস্তুত মাইকেলসন ও মর্লির ইন্টারফেরোমিটারটি একটি পারদের উপরে ভাসমান রাখা হয়েছিল এবং ইন্টারফেরোমিটারটিকে ৯০° ঘুরিয়ে এদের পারস্পরিক অবস্থানের বিনিময় ঘটানো হয়। যে বাহুটা ছিল পৃথিবীর গতির দিকে, তা হয়ে যায় পৃথিবীর গতির আড়াআড়ি, এবং অন্য বাহুটি পৃথিবীর গতির দিক। এই ব্যবস্থায় হিসাব করে দেখা গেল যে, ইথারের মধ্যে পৃথিবীর গতি যদি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার হয়, তাহলে অনিবার্যভাবেই ইন্টারফেরোমিটারে তা ধরা পড়ার কথা।

বস্তুত পৃথিবীর গতি ইথারের তুলনায় দশ কিলোমিটারের কম হলেও তা ধরা পড়ার কথা ছিল এই যন্ত্রে। কিন্তু ব্যতিচারজনিত ফ্রিঞ্জের যে পরিবর্তন, অর্থাৎ সরে যাওয়া, ধরা পড়ার কথা, তা পাওয়া গেল না। পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে প্রচণ্ড গতিতে, এ ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সে সময়; তা না হলে সূর্যকে প্রদর্শন করার তত্ত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারত এই পরীক্ষা থেকে।

১৮৯০ সালের প্রথমদিকে ফিজরাল্ড ও লরেঞ্জ প্রত্যাশিত এই ফ্রিঞ্জের পরিবর্তনের অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন এই বলে যে, ইন্টারফেরোমিটারের যে বাহুটি পৃথিবীর গতির দিকে তা কিছুটা সংকুচিত হচ্ছে। বস্তুত তাঁরা এই সংকোচনকে এমনভাবে হিসাবে ধরলেন যাতে ফ্রিঞ্জের পরিবর্তন না-ঘটার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে আলোর গতি আলোর উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতিনিরপেক্ষ হবার ফলে স্থান এবং কাল পৃথকভাবে পরম এবং গতিনিরপেক্ষ থাকছে না। মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষার ফল একটি সহজ ব্যাখ্যা পাচ্ছে এর ফলে। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষার ফলটি জানতেন কি না তা নিশ্চিত করে আমরা জানি না। কারণ, আইনস্টাইন তাঁর স্মৃতি থেকে ভালোভাবে এটি উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু একথা বলা যায় যে, এই পরীক্ষার ফল আইনস্টাইনকে তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে অতটা প্রভাবিত করেনি যতটা বলা হয়ে থাকে নানা গ্রন্থে। বরং নিউটনের আপেক্ষিকতার ধারণাকে আইনস্টাইন ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থে রূপ দিতে গিয়েই তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের প্রবাহকে গতিবিদ্যার সঙ্গে একীভূত করেছেন। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সময় সম্পর্কে যে নতুন ধারণা সৃষ্টি করেছে তা সহজে গৃহীত না হবার পথে মূল বাধা যৌক্তিক নয় বরং আমাদের চিন্তার জড়তা।

বহুদিন ধরে সময় সম্পর্কে নিউটনের প্রদত্ত ধারণা এমন দৃঢ়ভাবে মানুষের মনে গ্রথিত হয়ে গেছে যে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে সময়ের আপেক্ষিকতা মানুষ গ্রহণ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই জড়তার সৃষ্টিতে নিউটনের ব্যক্তিত্ব কাজ করেছে, কিন্তু নিউটনের গতিবিদ্যার তত্ত্ব নয়। কারণ আমরা উল্লেখ করেছি নিউটনের গতিবলবিদ্যার সূত্রে সময় কিন্তু পরম নয়। কারণ পরমগতি পরিমাপ করার কোনো পথ নেই নিউটনের গতিবলবিদ্যার সূত্রে। আরো দুটো ব্যাপার সময় সম্পর্কে আমাদের সনাতনী ধারণাকে বদ্ধমূল করেছে। এর একটি হল যান্ত্রিক ঘড়ির প্রবর্তন। যান্ত্রিক ঘড়ির একটানা চলা মানুষের মনে সময়ের অন্তহীন পরম প্রবাহের ধারণাকে সমর্থন করেছে। অন্যটি হল, সময় সম্পর্কে দার্শনিকদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা—যেমন ইমানুয়েল কান্ট স্থান, কাল ও কার্যকারণকে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত নিউটনের প্রদত্ত ধারণাকেই দার্শনিকরা তাদের নানা যুক্তি প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আমরা একটি ব্যতিক্রম দেখতে পাই লাইবনিজের প্রদত্ত সময়ের ধারণায়। লাইবনিজ সময়কে সম্পর্কিত করেন ঘটনার সঙ্গে। তাঁর ধারণা ছিল সময় শুধু ঘটনার পরপর ঘটার পর্যায়কে বোঝায়। একে আমরা বলি সময়ের Relational concept বা সম্পর্ক-ধারণা। লাইবলিজ অবশ্য যুগপত্তের ধারণাকে অস্বীকার করেননি; কিন্তু সময়কে প্রতিটি ঘটনার জন্য অনন্য মনে করতেন। অর্থাৎ সময়ের কণাবাদ বা বিচ্ছিন্ন এক-একটি অস্তিত্ব বলে মনে করতেন। লাইবনিজের সময়ের ধারণা সম্পূর্ণভাবেওআইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার প্রদত্ত ধারণার সঙ্গে না মিললেও অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে সময়কে স্থান থেকে পৃথক করে দেখা হয় না। স্থান ও কাল মিলে যে ঘটনা সেটাই একটি বিন্দু, স্থান ও কালের মিলিত চারমাত্রিক জগতে। সময় তাই নির্ভরশীল ঘটনার পর্যবেক্ষকের যে আপেক্ষিক গতি, তার উপরে। প্রত্যেকের নিজের ঘড়ি যে সময় দেয় সেটা তার সময়। অর্থাৎ যে ঘড়ির সঙ্গে সময় পরিমাপকের কোনো আপেক্ষিক গতি নেই সেটা হল তার স্থানীয় সময়। সে যদি অন্য কোনো ঘড়ি দেখে যা তার সঙ্গে বিশেষ গতিতে ছুটছে, সে সময় হবে ভিন্ন। অর্থাৎ সে ঘড়ি চলছে ধীরে। একইভাবে অন্য কেউ যদি এই ব্যক্তির সঙ্গে আপেক্ষিক গতিতে চলে তাঁর কাছে মনে হবে প্রথম ব্যক্তির ঘড়ি চলছে ধীরে।

সময় সম্পর্কে আপেক্ষিকতার এই ধারণা কোনো তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ব্যাপার নয়। গতিশীল কোনো বস্তুর সময় যে অন্য দর্শকের কাছে ধীরে চলে এটা একটি পরীক্ষালব্ধ ফল। যেমন, মেজন-কণিকার বেলায় দেখা গেছে সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের দুইভাগ সময়ে এর লুপ্ত হবার কথা। কিন্তু ওই মেজন-কণিকা আলোর প্রায় কাছাকাছি গতিতে ছোটে বলে, আমরা যারা এই কণিকাকে দেখি তাদের কাছে ওর সময় চলে ধীরে। ফলে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে এটি টিকে থাকে এবং আমাদের হিসাবে অনেক বেশি দূরত্ব এই কণিকা অতিক্রম করে লুপ্ত হবার আগে। কণিকা ত্বরক বা particle accelerator-এ চার্জযুক্ত কণিকার গতিপথ হিসাব করতে আপেক্ষিকতার তত্ত্বের হিসাবটি অনিবার্যভাবেই প্রয়োগ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে নিউটনীয় কালিক ধারণাকে মেনে চলেছি, তার কারণ আমাদের দেখা সমস্ত বস্তুই চলছিল আলোর গতির তুলনায় অনেক কম গতিতে। কিন্তু পর্যবেক্ষণের জগৎ যেখানে দ্রুতগতির বস্তুদের নিয়ে, সেখানে আইনস্টাইনের প্রদত্ত সময়ের ধারণা শুধু বাস্তব নয়, অনিবার্য হয়ে ওঠে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সময়ের প্রচলিত ধারণাকে কীভাবে বদলে দিয়েছে তার কিছু ব্যাখ্যা পটভূমিসহ একই শিরোনামের পূর্ববর্তী প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সময় সম্পর্কে আমাদের ভৌত

ধারণা ও দার্শনিক উপলব্ধিকে এত গভীর ও মৌলিকভাবে প্রভাবিত করেছে যে, যৌক্তিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গণিতের ব্যবহার ছাড়া বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাই পাঠকের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠার ঝুঁকি নিয়েও, বিষয়টির আরো একটু গভীরে প্রবেশ করতে চাই।

এখানে একটি সমস্যা হল—সনাতনী পদার্থবিদ্যায় সময়ের ধারণা শুধু আমাদের বিশ্ব-ধারণা এবং সেইসঙ্গে দার্শনিক ভাবনা ও সাধারণ্যের দৈনন্দিন চিন্তাকেই প্রভাবিত করে নাই, আমাদের চিন্তা করার ও যুক্তি প্রয়োগের ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে স্থান-কাল, বস্তু, কালিক ব্যবধান, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, কার্যকারণ ইত্যাদি শব্দমালা সনাতনী পদার্থবিদ্যার ধারণা থেকে যেসব অর্থ শোষণ করে নিয়েছে, সেখান থেকে মুক্ত করে এনে নতুন তত্ত্বের প্রয়োজনে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে গেলে উপলব্ধিগত অসুবিধা দেখা দেয়। অথচ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আলোকে নিউটনীয় ধারণায় যে রূপান্তর ঘটেছে তা শুধু গাণিতিক সমীকরণে স্থান পেলেই চলবে না, আমাদের সামগ্রিক কালিক চেতনায় এই রূপান্তর সংঘটিত হতে হবে। গণিতের ভাষা এর ঐতিহ্যমুক্ত প্রতীকী বৈশিষ্ট্যের জন্য নতুন তত্ত্ব ও ধারণার ব্যাখ্যায় অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য হল—সময়ের নানা ধারণাকে এই তত্ত্ব যেভাবে বদলে দিয়েছে তা সাধারণ ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করা।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বে যুগপত্ত

সনাতনী পদার্থবিদ্যায় আমরা দেখেছি, তিনমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল পরস্পরের নিরপেক্ষ। স্থানকে এখানে মনে করা হয় একটি তিনমাত্রিক অসীম, নিষ্ক্রিয়, অনড়, নিরবচ্ছিন্ন, সমসত্ত্ব বিস্তার। স্থানকে এক্ষেত্রে যে-কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। স্থানের মধ্যে সমস্ত বস্তু ধারণ করা যায় এবং নানা ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু কিছুই একে প্রভাবিত করে না এবং কোনোকিছুর উপরেই এর প্রভাব নেই। সময়কেও তেমনি ভাবা হত স্থান, বস্তু ও ঘটনা নিরপেক্ষ এক সমসত্ত্ব, অন্তহীন, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, যাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে, অর্থাৎ যথেচ্ছক্ষুদ্র মুহূর্তে ভাগ করা যায়। সময় ঘটনার পর্যায়ক্রমকে নির্দেশ করলেও কোনো ঘটনাকে প্রভাবিত করে না বলে ধরে নেয়া হয়েছিল।

নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় যুগপত্তের ধারণা ছিল জটিলতাহীন। মহাবিশ্বের যে-কোনো স্থানে যে-কোনো গতিতে যদি একজন পর্যবেক্ষক তার ঘড়িতে সময় গণনা করে, তাহলে সেই সময় বিশ্বের অন্য যে-কোনো স্থানে যে-কোনো গতিতে ছুটে চলা পর্যবেক্ষকের সময়ের সঙ্গে মিলে যাবে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব জুড়ে একটি অভিন্ন সময়ের অস্তিত্ব এখানে স্বীকৃত। কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আমরা দেখেছি পরম

যুগপত্ত বলে কিছু নেই। অর্থাৎ, বিশ্বজুড়ে একটি অভিন্ন মুহূর্ত আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। এর মূল ভিত্তি হল আলোর সসীম গতি। আলোর সসীম গতির কথা অবশ্য সনাতনী পদার্থবিদ্যায়ও জানা ছিল। কিন্তু যুগপত্তের ধারণাটি তবু সেখানে সংরক্ষিত ছিল। কারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আগে বিশ্বাস করা হত যে--স্থানিক ব্যবধানে অবস্থিত দুইজন পর্যবেক্ষক যদি ভিন্নগতিতে ছুটতেও থাকে এবং নিজ নিজ প্রসঙ্গ-কাঠামো থেকে তা পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে হিসাব করে বলতে পারবে ঘটনা দুটো একই সময়ে ঘটছে অথবা বিভিন্ন সময়ে ঘটছে। অর্থাৎ, এরা যুগপৎ অথবা যুগপৎ নয়। দুটো ঘটনাকে যুগপৎ বলা হয়, যদি এই দুই ঘটনা থেকে সমদূরে অবস্থিত দুজন স্থির পর্যবেক্ষক এদেরকে একই সঙ্গে ঘটতে দেখে। পুরো ব্যাপারটাই একটি কাল্পনিক পরীক্ষা এবং সনাতনী পদার্থবিদ্যার হিসাবের ভিত্তিতে এখানে যুগপৎ ঘটনার শর্ত অনুমান করা হচ্ছে। নিউটনের তত্ত্বে সময় সবকিছুর নিরপেক্ষ বলেই এটি সম্ভব। কারণ দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যদি একটি আপেক্ষিক গতি থাকেও, আপেক্ষিক গতি নির্ণয়ের সরল নিয়ম ব্যবহার করে এদের অবস্থান আমরা নির্ধারণ করতে পারি এবং যুগপৎভাবে তা নির্ধারণের কাল্পনিক পরীক্ষাটি প্রয়োগ করে আমরা অনুমান করতে পারি এদের পর্যবেক্ষণলব্ধ ঘটনা দুটি যুগপৎ অথবা যুগপৎ নয়।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই যুগপত্ততার ধারণা কেন নাকচ হয়ে গেল তা বুঝতে হলে, সনাতনী পদার্থবিদ্যায় যুগপত্তের নির্ধারণের পদ্ধতিতে যৌক্তিক অসঙ্গতি কোথায় তা বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা দেখব, সেখানে যুগপত্ততার সংজ্ঞায়নে একটি চক্রাকার যুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংজ্ঞায় পরম যুগপত্ততার ধারণা দুবার আসছে। প্রথমত, আমরা যে ধরে নিচ্ছি পর্যবেক্ষক পরম স্থানের মধ্যে কোথায় অবস্থান করছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব—সেখানে যুগপত্তের ধারণা একবার আসছে। আর একবার আসছে দূরত্বের ধারণায়। আমরা যখনই পরম স্থানকে সনাতনী পদার্থবিদ্যায় কল্পনা করি, তখনই বিশ্বজুড়ে যুগপৎ ঘটনামালার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিই। কারণ সনাতনী পদার্থবিদ্যার ধারণায় স্থান যেহেতু কাল-নিরপেক্ষ, কোনো একটি মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেসব ঘটনা ঘটছে তাই আসলে স্থান। অর্থাৎ তিনমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল পরস্পরের প্রভাবমুক্ত থেকে যে জগৎ সৃষ্টি করেছে, সেখানে জগৎজুড়ে একটি বিশ্বজনীন পরম মুহূর্তকে স্বীকার করে নিলে সেই মুহূর্তে যত ঘটনা ঘটছে, তা সবই হবে সময়-নিরপেক্ষ এবং সেটাই স্থান। অর্থাৎ সময়ের অক্ষের অভিলম্বিক যে প্রস্থচ্ছেদ, ঘটনাজগতের, সেটাই হল সনাতনী পদার্থবিদ্যার স্থান। একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক :

ঘটনাবহুল জগৎকে যদি একটি চলচ্চিত্র কল্পনা করি, তাহলে কোনো মুহূর্তে তোলা একটি স্থিরচিত্র হবে কাল-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ, যখনই ওই ছবির দিকে

তাকাই না কেন, আমরা একই জিনিস দেখতে পাব। সমস্ত চলচ্চিত্র ঘটনার জগৎকে যে ধারণ করে আছে তাকে আমরা তখন বিভিন্ন মুহূর্তে তোলা স্থিরচিত্রসমূহের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস বলতে পারি। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার ধারণায় বিশ্বজগৎকে এভাবেই কল্পনা করা হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরম স্থানের ধারণা আসলে পরম যুগপত্তের ধারণা থেকে অভিন্ন। আমরা যখনই পরম স্থান, অর্থাৎ জগৎ জুড়ে কাল-নিরপেক্ষ স্থানকে কল্পনা করছি, তখনই যুগপত্তকে পরোক্ষভাবে মেনে নিচ্ছি। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সময়ের ধারণাকে প্রভাবিত করেছে, এই তথ্যটি প্রায় সবারই জানা থাকলেও কতটা গভীর এবং সুদূরপ্রসারী এই প্রভাব এবং কী পরিমাণ দার্শনিক বিতর্কের অবতারণা ঘটেছে এই তত্ত্ব নিয়ে, তা অনেকের কাছেই অজানা। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল বিশ্লেষণ এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত যে, শুধু সাধারণ মানুষ নয়, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী মহলেও অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে এ সম্পর্কে। এর মূল কারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের জটিলতা নয়। বস্তুত আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে ব্যবহৃত গণিত তুলনামূলক বিচারে খুবই সহজ। কিন্তু এর নিহিতার্থ উপলব্ধি করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে আমাদের ভাষার জড়তা। অর্থাৎ আমাদের ব্যবহৃত শব্দমালা নিউটনীয় কালিক ধারণা থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে যে অর্থ শোষণ করে নিয়েছে তার নিগড় থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মূল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে যুগপত্তের ধারণা নিয়ে। যুগপত্ত নিয়ে সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিতর্ক এখনো অব্যাহত আছে। এটি অভাবনীয় নয়। কারণ যুগপত্তের ধারণা আমাদের দীর্ঘদিনের স্থান-কালের ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে আমাদের ভাষার জড়তা ও চিন্তার ঐতিহ্য বাধা সৃষ্টি করেছে যুগপত্তের ধারণা উপলব্ধিতে এবং এ সংক্রান্ত নতুন যুক্তি অবধারণে। যে সমস্যার উদ্ভব ঐতিহ্যে, তার সমাধান খুঁজতে হয় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে। কারণ, যখন আমরা আবিষ্কার করি যে—বিশেষ কোনো ধারণা চিরন্তন নয়, তখন তা ঐতিহ্যের জোরে টিকতে পারে না। একমাত্র যুক্তির জোরটাই সেখানে কাজ করে। আমরা তাই আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আগে যুগপত্তের ধারণা কী ছিল, এবং কীভাবে এই ধারণার বিবর্তন ঘটেছে তা কিছুটা এখানে পর্যালোচনা করব।

সম্ভবত যে দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম যুগপত্তের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেন, তিনি হলেন অ্যারিস্টোটল। সময় সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাই পদার্থবিদ্যা বিষয়ক তাঁর গ্রন্থে। যুগপত্তের একটি সংজ্ঞাও তিনি দেন। যেসব ঘটনার মধ্যে কালিক সম্পর্ক নেই, সেগুলো যুগপত্ত ঘটনা—এমন একটি ধারণা তিনি উপস্থিত করেছিলেন। 'এখন' এবং 'যুগপত্ত' সমার্থক নয়, এ-ধারণাও তিনি দেন।

অ্যারিস্টোটলের পরে, প্রায় দুই হাজার বছর ধরে যুগপত্তের ধারণাটি কোনো গুরুত্ব পায়নি এবং এর কোনো সংজ্ঞার্থও সার্বিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। এমনকি নিউটনের যে কালিক ধারণা, যেখানে সময় একটি বিমূর্ত ও পরম অস্তিত্বরূপে গভীর গুরুত্ব লাভ করে, সেখানেও যুগপত্তের ধারণাটি দিয়ে কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করা হয়নি।

নিউটনের প্রদত্ত সময়ের ধারণায় যুগপত্ত ঘটনা বলতে সেইসব ঘটনাকে বুঝানো হয়, যা সময়ের একটানা নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ ও সূচনা প্রবাহ অক্ষের একটি বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সনাতনী পদার্থবিদ্যায় সমগ্র ভৌত জগতের বিকাশ হচ্ছে বস্তুমালার প্রতিমুহূর্তের পর্যায়ক্রমিক অবস্থান। একটি মুহূর্ত হচ্ছে কালিক অক্ষের ওপরে একটি বিন্দু, এবং কোনো একমুহূর্তের বিশ্ব হচ্ছে সেই মুহূর্তে স্থানের মধ্যে সমস্ত বস্তুমালার অবস্থান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায়ও বিশ্বজগৎকে চারমাত্রিক এক স্থান-কালের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হত, যেখানে সময়ের প্রবাহকে তিনমাত্রিক ইউক্লিডীয় স্থানের নিরপেক্ষ মনে করা হত। সময়ের অক্ষ ছিল স্থানের অভিলম্বী। স্থান-কালের ওই জ্যামিতিক ধারণায় একটি মুহূর্তের বিশ্ব বলতে সময়-অক্ষের সঙ্গে খাড়াভাবে নেয়া প্রস্থচ্ছেদকে কল্পনা করা হত।

অবশ্য জ্যামিতিক চিত্রে চার মাত্রাকে দেখানো সম্ভব নয়। এই কারণে তিনমাত্রিক স্থান-কালের মডেল ব্যবহার করে চারমাত্রিক স্থান-কালের ধারণাকে বোঝার চেষ্টা চলেছে। সনাতনী স্থান-কালের এই ধারণায় স্থানকে বুঝানো হয় দুই মাত্রিক ইউক্লিডীয় তল দ্বারা এবং কালকে বুঝানো হয় এই তলের ওপরে অভিলম্বিক একটি অক্ষের দ্বারা। এই মডেলে চার মাত্রিক স্থান-কালের ধারণার মূল বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকে। ফলে নিউটনীয় স্থান কালের ধারণার নিহিতার্থ ব্যাখ্যায় ও এর যৌক্তিক অসঙ্গতি নির্ধারণে এই মডেল ব্যবহৃত হতে পারে। স্থান-কালের এই মডেলে আমরা লক্ষ্য করি যে, কোনো একটি মুহূর্ত হচ্ছে কালিক অক্ষের ওপরে একটি বিন্দু। এই বিন্দুতে সময়ের অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে যে প্রস্থচ্ছেদ, তা হচ্ছে সেই মুহূর্তে সমগ্র স্থান। সুতরাং এই মুহূর্তের বিশ্বপ্রকৃতিকে জানতে হলে আনুষঙ্গিক প্রস্থচ্ছেদ নিতে হবে। নিউটনীয় ধারণার কোনো মুহূর্তের এই প্রস্থচ্ছেদের ওপরে যত বিন্দু আছে সেগুলো সমকালীন। অর্থাৎ, বিশ্বজুড়ে সেই মুহূর্তের যুগপৎ ঘটনামালার প্রতিনিধিত্ব করছে এই প্রস্থচ্ছেদ।

যে সিদ্ধান্তটি এই মডেল থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল যুগপৎ ঘটনামালা একত্রে বিশ্বের স্থানিক বিস্তারকে সংজ্ঞায়িত করে যদি আমরা সমগ্র বিশ্বজুড়ে একটি অভিন্ন কালিক বিন্দু বা মুহূর্তকে পরমভাবে নির্ধারণ করতে পারি, তাহলে সেই মুহূর্তের সমস্ত যুগপৎ ঘটনা পরমভাবে আনুষঙ্গিক স্থানকে সংজ্ঞায়িত করবে।

বিপরীতভাবে তাকালে পরম স্থান অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে একটি প্রস্থচ্ছেদকে যদি আমরা চিহ্নিত করতে পারি, তাহলে সেই প্রস্থচ্ছেদ একটি মুহূর্তকে পরমভাবে সংজ্ঞায়িত করবে। নিউটনীয় বিশ্বচিত্রে পরম স্থানের ধারণা ও যুগপত্তের ধারণা তাই অভিন্ন। কান্ট নিউটনীয় স্থান-কালের ধারণাকে গ্রহণ করে তারই দার্শনিক ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে সনাতনী স্থান কাল-নিরপেক্ষ। বার্গসনও এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, কালিক পর্যায়ক্রম ও স্থানিক সন্নিধি পরস্পরের নিরপেক্ষ।

সনাতনী পদার্থবিদ্যার স্থান হচ্ছে সেই পরম কাঠামো, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরম গতি নির্ধারণ করা সম্ভব। ফলে আমরা যখন পৃথিবীর ওপরে সংঘটিত তাৎক্ষণিক ঘটনামালার কথা বলি তখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে অর্থাৎ দূর নক্ষত্রজগতের ঘটনামালাকেও তাৎক্ষণিক ঘটনারূপে ভাবতে পারি সনাতনী পদার্থবিদ্যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, নিউটন যখন যুগপৎ ঘটনামালার কথা বলেছেন তার পরম স্থান ও পরম কালের ধারণার ভিত্তিতে, সেখানে তিনি বিশ্বজুড়ে একই মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার সংঘটনকে শর্তরূপে গ্রহণ করেননি। অথবা আলো অসীম গতিতে চলে এমন ধারণাকেও সম্পর্কিত করেননি। তিনি একথাও বলেছেন যে হয়তো এমন কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাই পাওয়া যাবে না, যার সুষম গতিকে ব্যবহার করে সময়ের গতি নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু সময়ের সুষম প্রবাহ ও এর পরম গতি এই বাস্তব ঘটনা বা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। ফলে নিউটনের ধারণায় যুগপত্ত হচ্ছে একটি ভাবনাগত বা মানসিক চেতনাগত ব্যাপার, যা বস্তুজগতের ঘটনা বা ভৌত মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত নয়।

লাইবনিজ ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্কের ভিত্তিতে সময়ের যে-ধারণা উপস্থিত করেন, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই ধারণা অনুসারে স্থান হচ্ছে একই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে বস্তুমালার যে অবস্থান বা সন্নিধি সেটাই স্থানের সংজ্ঞা। লাইবনিজ যুগপত্তের ধারণাকে দ্ব্যর্থহীন করেছেন দুইভাবে। প্রথমত স্থানিক সম্পর্ক বা সন্নিধির ভিত্তিতে। দ্বিতীয়ত কালিক সম্পর্কের অনুপস্থিতির ভিত্তিতে। কান্ট তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে যুগপত্তের পৃথক কোনো সংজ্ঞার্থ উপস্থিত না করলেও, এ সম্পর্কে সনাতনী পদার্থবিদ্যার ধারণাকে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট করেছেন। যুগপত্ত এখানে সমগ্র বস্তুজগতের সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থাকে নির্দেশ করে। কিন্তু এই ধারণার মূলে বিশ্বজুড়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিয়াশীল বলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়, যা একই মুহূর্তে সমস্ত দূরত্বে কাজ করতে পারে। কিন্তু এই ধরনের প্রাকৃতিক কোনো বল বা ভৌত প্রভাবের সন্ধান যেহেতু মেলেনি, ফলে কান্টের যুগপত্তের ধারণারও কোনো বস্তুগত ভিত্তি নেই। সুতরাং

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নিউটন ও তার পরবর্তী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ যুগপত্তের কোনো বস্তুনিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা উপস্থিত করতে পারেননি দীর্ঘদিন ধরে। শুধু তাই না, যুগপত্তের সংজ্ঞায়ন যে সময়ের ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য অপরিহরণীয়, এই উপলব্ধিও জাগেনি। কিন্তু অন্যদিকে যুগপত্ত সম্পর্কে একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা পদার্থবিদ্যার নানা তত্ত্ব নির্মাণে ও বিভিন্ন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কাজ করেছে। যেমন, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এটা সহজাত সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হত যে, বহুদূরে সংঘটিত নক্ষত্রজগতের ঘটনাবলিকে গাণিতিক পরম অভিন্ন একটি মুহূর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত করা সম্ভব, নক্ষত্রদের গড় অবস্থানের ভিত্তিতে হিসাব কষে। রোমার যে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহের কক্ষপথে পিছিয়ে পড়া থেকে আলোর গতি পরিমাপ করেছিলেন, তার মূলে এই ধারণা কাজ করেছে যে, এই উপগ্রহদের পূর্বের অবস্থান পৃথিবীর ঘড়ির সময়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা সম্ভব।

সমুদ্রে বিভিন্ন স্থানে জাহাজের অবস্থান নির্ধারণের বেলাতেও এটা স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয়া হত যে, বিভিন্ন দূরত্বে স্থাপিত ঘড়ির সময় থেকে স্থানিক ব্যবধানে সংঘটিত ঘটনাবলির মধ্যে যুগপত্ত স্থাপন করা সম্ভব। বিভিন্ন বাস্তব ঘড়ির ত্রুটি থাকতে পারে—এটা জানা থাকলেও গাণিতিক পরম সময় সর্বত্র অভিন্ন, এমন একটি বিশ্বাস থেকেই মনে করা হত—জাহাজের অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব, ত্রুটিমুক্ত ঘড়ি থাকলে। যুগপত্তের ধারণার কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি সনাতনী পদার্থবিদ্যায় না থাকলেও, স্থানিক ব্যবধানে সংঘটিত দুটো ঘটনা যে যুগপৎ হতে পারে এবং তা সমস্ত প্রসঙ্গ-কাঠামোর জন্যেই সত্য—এমন বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

সময় সম্পর্কে যে দুটো ভিন্ন ধারণার উপস্থিতি আমরা আপেক্ষিকতার তত্ত্বের পূর্ববর্তী সময়ে লক্ষ্য করি তা পর্যায়ক্রমে আধিপত্য লাভ করেছে। এই দুটো ধারণার একটি হল—সময়ের নিজস্ব একটি বাস্তবতা আছে এবং সময় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে একটি মূলসত্তা। সময় সম্পর্কে অন্য ধারণাটি হল সময়-সম্পর্কজাত। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া সময়ের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। দুটো ধারণাই অত্যন্ত প্রাচীন। আদি কণাবাদীরাও সময়কে বাস্তব সত্তারূপে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু নিউটনের আগে সময়ের এই ধারণা স্বীকৃতি পায়নি। নিউটনের *The Mathematical Principle of Natural Philosophy* বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় একটি বাস্তব ও পরম সত্যরূপে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। অন্যদিকে সময় শুধু ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে, এই ধারণা প্লেটোর সময় থেকে চলে আসছে। যদিও এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টোটলই বড় ভূমিকা রাখেন। নিউটনের সময় পর্যন্ত আমরা দেখেছি সময় সম্পর্কে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। ভাববাদী দর্শনে

সময়কে বস্তুজগতের বাইরে গভীরতর কোনো চেতনায় অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করা হত। যেমন প্লেটো মনে করতেন, সময় বিশ্বকর্তার সৃষ্টি। অ্যারিস্টটল সময়কে আত্মার ক্রিয়ারূপে ভাবতেন। অবশ্য তিনি একই সঙ্গে সময়কে বস্তুমালার গতির সঙ্গেও সম্পর্কিত করেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠালাভের পূর্ব পর্যন্ত দুটো ধারণা কাজ করছিল। একটি হল নিউটনের পরম সময়ের ধারণা, যেখানে সময় একটি বাস্তবতা এবং আপন অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। অন্যটি হল সময়ের সম্পর্কজাত ধারণা, যেখানে সময় কখনো মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সম্পর্কের ধারক, আবার কখনো বস্তুমালার পারস্পরিক গতির সম্পর্ক নির্ধারক।

সনাতনী পদার্থবিদ্যার সময়ের ধারণায় চিড়

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উদ্ভাবিত হবার আগেই পদার্থবিদ্যার জগতে কিছু ঘটনা ঘটে, যা সনাতনী পদার্থবিদ্যার সময়ের ধারণায় ফাটল সৃষ্টি করে। এটা শুরু হয় ইউক্লিডের জ্যামিতির চিরন্তনতাকে অতিক্রম করে নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উদ্ভাবনের ভিতর দিয়ে। এখানে অবদান রাখেন লোবাচোভস্কি, বয়েল, রাইম্যান ও গাউস। স্থান যে বাহ্যিক সমস্ত বস্তু ও ঘটনা-নিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধরূপে চিরসত্য, এই বদ্ধমূল ধারণা এই নতুন অঋজু জ্যামিতিক ধারণার দ্বারা খণ্ডিত হল। এই নতুন জ্যামিতিক ধারণায় লোবাচোভস্কি, বয়েল, রাইম্যান প্রমুখ দেখালেন যে, জ্যামিতি এবং সেই অর্থে স্থান, ভৌত মিথস্ক্রিয়া ও বস্তুমালার বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। স্থানের চিরন্তনতা ও নিরপেক্ষতার ধারণা ভেঙে পড়ার ভিতর দিয়ে সময়ের চিরন্তনতা ও নিরপেক্ষতার ধারণায়ও চিড় ধরল।

তাপ বলবিদ্যার অগ্রগতি সময়ের প্রচলিত ধারণার ওপরে আর-একটি আঘাত আনল। বিশ্বের বিশৃঙ্খলা বা এনট্রপি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে—তাপবলবিদ্যার এই দ্বিতীয় সূত্র সময়ের প্রত্যাবর্তিতা ও একমুখো প্রবাহের ধারণাকে ভেঙে দিল। বিশৃঙ্খলার ব্যাপারটি যেহেতু বাহ্যিক বস্তুজগতে সংঘটিত, বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির সঙ্গে সময়ের প্রবাহকে সম্পর্কিত করার ভিতর দিয়ে সময় বস্তুজগতের নিরপেক্ষ থাকল না, বাইরের ঘটনামালার অপেক্ষক হয়ে পড়ল।

এরপর যে ঘটনাটি সময়ের সনাতনী ধারণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তা হল— যৌক্তিক দৃষ্টবাদের দর্শন। এই দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন পদার্থবিজ্ঞানীরা, যারা জ্ঞানের সমস্ত ভিত্তিকে পরীক্ষণসাধ্য ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিনির্ভর অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাইসাধ্য হবার শর্ত আরোপ করতে চান। এঁদের মধ্যে আর্নস্ট ম্যাক ও জে.বি. স্টেলো স্থান ও কালের ধারণাকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। নিউটনের প্রদত্ত স্থান-কালের ধারণায় ভৌত ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও বস্তুজগতের কোনো প্রভাব

নেই—এই অভিযোগ তাঁরা উত্থাপন করলেন। এর ফলে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব ঘটল, যেখানে যৌক্তিক দৃষ্টবাদের সমর্থকগণ স্থান-কালের ব্যাখ্যায় ভৌত অভিজ্ঞতার ভিত্তি খুঁজে না পেয়ে আশাহত হলেন, অন্যদিকে আর-একদল বিজ্ঞানী স্থান-কালের ভিত্তিরূপে নতুন ভৌত ধারণা খুঁজতে থাকলেন, যা নিউটনের স্থান-কালের ধারণার বিকল্পরূপে কাজ করতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিজ্ঞানীরা যুগপত্ত কী ও কীভাবে যুগপত্তকে সংজ্ঞায়িত করা যায় তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন হেনরি পয়েনকার। যুগপত্তের একটি যথার্থ সংজ্ঞার্থ নির্ধারণের জন্য তিনি নানাভাবে চিন্তাভাবনা করেন। প্রথমে তিনি যুগপত্ত সম্পর্কে সাধারণ্যের যে প্রচলিত ধারণা, যার মূলে আসলে নিউটনের প্রদত্ত কালিক উপলব্ধি কাজ করে, তা বিশ্লেষণ করেন। যুগপত্ত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে স্বজ্ঞামূলক ধারণা তা হল—যেসব ঘটনাকে একই সঙ্গে চিন্তায় স্থান দিই বা উপলব্ধি করি, সেগুলো যুগপৎ। দার্শনিক হেনরি বার্গশন এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও উপস্থিত করেন। পয়েনকার তাঁর বিখ্যাত *The Measurement of Time* প্রবন্ধে যুগপত্তের এই কাল্পনিক ধারণার ভিত্তিহীনতা ব্যাখ্যা করেন এবং যুগপত্তের এই মানসিক সংজ্ঞা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা উল্লেখ করলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল— প্রথমবারের মতো তিনি ভৌত পরীক্ষার মাধ্যমে যুগপত্ত সংজ্ঞায়িত করতে সচেষ্ট হলেন, যৌক্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে। তিনি দুটো চলিষ্ণু ঘড়ির দৃষ্টান্ত নিয়ে এবং এদের মধ্যে সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে যুগপত্তকে সংজ্ঞায়নের চেষ্টা করেন। তিনি ধারণা দেন যে দুটো ঘটনা তখনই যুগপৎ বলে বিবেচিত হবে, যখন এদের পর্যায়ক্রমকে ইচ্ছামতো বদলানো যাবে। শেষ বিশ্লেষণে পয়েনকার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে যুগপত্তকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য বহুরকম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রযোজ্য। কোনো একক নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি নেই যুগপত্তকে সংজ্ঞায়িত করার। বিভিন্ন যেসব পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারি যুগপত্তকে সংজ্ঞায়নের জন্য, সেগুলো মূলত আমাদের অবচেতন প্রচলন মাত্র। পয়েনকার সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে যুগপত্ত নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা করেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যুগপত্ত নির্ধারণের কাজটি জটিল পদ্ধতির মাধ্যমেই শুধু হতে পারে এবং তা আমাদের অবচেতন ভাবনার ব্যাপার মাত্র।

আইনস্টাইনের পদ্ধতি

আইনস্টাইন যুগপত্ত নির্ধারণে ও সংজ্ঞায়নে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তা হল সংকেত প্রেরণ দ্বারা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে আইনস্টাইন ও পয়েনকারের পদ্ধতি এক্ষেত্রে অভিন্ন। বস্তুত পয়েনকারের সঙ্গে আইনস্টাইনের যেখানে মিল, তা

হল—উভয়েই সময়ের মূল রহস্যোদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণভাবে যুক্তি ও স্বজ্ঞার ওপরে নির্ভর না করে বাইরের বস্তুজগৎ ও ঘটনামালাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দুই ঘটনার মধ্যে যুগপত্ত নির্ধারণে উভয়েই সংকেত-প্রেরণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পরীক্ষা- নির্ভর হয়েছেন। কিন্তু যেখানে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার তত্ত্বের গূঢ় বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন এবং যেখানে তিনি গভীরভাবে মৌলিক ও অনন্য তা হচ্ছে—স্থান-কালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা। বস্তু ও আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আইনস্টাইন যে গাণিতিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছেন সেটাও লরেঞ্জের পদ্ধতির সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব এসব সত্ত্বেও সময় সম্পর্কে আইনস্টাইনের প্রদত্ত ধারণা কী বিস্ময়করভাবে নতুন ও ভিন্ন, প্রচলিত সময়ের ধারণা ও উপলব্ধি থেকে।

আইনস্টাইনের যুগপত্তের ধারণা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আইনস্টাইন আসলে স্থানিক ব্যবধানে অবস্থিত দুটো ঘড়ির সময় মিলানোর সমস্যা নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন। যে দুই অবস্থানে ঘড়িদুটো রাখা আছে তাদেরকে যদি ক ও খ বলে চিহ্নিত করি, তা হলে সমস্যাটি হল—কী করে এদের সময় মিলানো যাবে? ক-তে অবস্থিত ঘড়ি থেকে কী করে জানা যাবে যে এই ঘড়িতে যে-সময় দিচ্ছে তা খ-তে অবস্থিত ঘড়ির সময়ের সঙ্গে অভিন্ন? আইনস্টাইন বললেন, আলোর সংকেত প্রেরণ করে সেটা করতে হবে। মনে করা যাক ক থেকে একটি আলোক-সংকেত খ-তে যেয়ে প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে এল। আলো যে-মুহূর্তে খ থেকে প্রতিফলিত হল সেই মুহূর্তের সঙ্গে যুগপৎ মুহূর্তটি ক-এর অবস্থানে আমরা নির্ধারণ করতে চাই। ক থেকে আলোর যাত্রা শুরু করা ও খ-তে প্রতিফলিত হয়ে ক-তে আবার ফিরে আসতে সময়ের যে ব্যবধান তা প্রথমে নির্ধারণ করা যায়। এখন এই সময়ের ব্যবধানের মাঝখানে যে মুহূর্ত সেটাই হচ্ছে ক-এর অবস্থানে সেই মুহূর্ত যা খ-অবস্থানে আলোর প্রতিফলিত হবার মুহূর্তের সঙ্গে যুগপৎ। এখানে লক্ষণীয় যে ক-তে রাখা ঘড়িটি ক-অবস্থান থেকে দেখলে এর সময়ের প্রসারণ ঘটবে না, এর কোনো আপেক্ষিক গতি নেই বলে। ফলে হিসাব কষে সময়ের মধ্যবিন্দু নির্ধারণে কোনো সমস্যা নেই। আইনস্টাইন এখানে যে স্বীকার্যটি গ্রহণ করেছেন তা হল—আলোর গতি ক থেকে খ-এর দিকে যা, খ থেকে ক-এর দিকেও তাই।

আইনস্টাইন যুগপত্ত নির্ধারণে এই সংকেত-প্রেরণ পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করার পর তা বিভিন্ন জড়কাঠামোতে প্রয়োগ করলেন। অর্থাৎ যেসব প্রসঙ্গকাঠামো পরস্পরের সঙ্গে অপরিবর্তী গতিতে ছুটছে তাদের প্রেক্ষিতে যুগপত্ত নির্ধারণ করতে গেলেন এবং এখানেই তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি পেয়ে গেলেন। সেই সিদ্ধান্তটি হল—যুগপত্ত সম্পর্কে আমরা অভিন্ন বা পরম কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। যে দুটো ঘটনাকে কোনো একটি প্রসঙ্গকাঠামো থেকে দেখলে যুগপৎ মনে হচ্ছে, তা অন্য এক প্রসঙ্গকাঠামো থেকে দেখলে যুগপৎ মনে হবে না, যদি এই দুই প্রসঙ্গকাঠামোর মধ্যে একটি আপেক্ষিক গতি থাকে। আমার নিজের কাছে

হয়তো কোনো ঘটনা ঘটল—যেমন ফুল ফুটল বা বোমা ফাটল। এই ঘটনাকে যদি একটি মুহূর্ত বলে চিহ্নিত করি, তাহলে বিশ্বজুড়ে সর্বত্র কি এই মুহূর্তটি নির্ধারণ করা সম্ভব? অর্থাৎ আমরা কি বিশ্বজুড়ে যুগপৎ ঘটনা নির্ধারণ করতে পারি? আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বলছে— না, তা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত কোনো স্বতঃসিদ্ধমূলক ধারণা থেকে আসেনি। আইনস্টাইন একটি পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতিতে যুগপত্ত নির্ধারণ করে এই সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। নিউটনের কালিক ধারণা ও যুগপত্তের ধারণা সম্পর্কে যে আপত্তি তুলেছিলেন যৌক্তিক দৃষ্টবাদীগণ, আপেক্ষিকতার তত্ত্বের কালিক ধারণা ও যুগপত্তের সংজ্ঞার বিরুদ্ধে সেই আপত্তি খাটে না।

আমরা আর একবার আইনস্টাইনের যুগপত্ত নির্ধারণের পরীক্ষাটিতে ফিরে যেতে চাই। এখানে আলো ক-এর অবস্থান থেকে খ-তে প্রেরণ ও সেখান থেকে ক-তে ফিরে আসার মধ্যকার সময়ের মধ্যবিন্দুকে খ থেকে আলো প্রতিফলিত হবার মুহূর্তের সঙ্গে যুগপৎ বলেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, যেসব ঘটনা ক থেকে আলো পাঠাবার মুহূর্তের আগে ঘটেছে অথবা আলো ক-তে ফিরে আসার পরে ঘটেছে, সেইসব ঘটনাকে কেন যুগপৎ ঘটনারূপে দেখাতে পারছি না? এর কারণ এসব ঘটনা খ থেকে আলো প্রতিফলিত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ভৌত মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে পারে। এইসব ঘটনার মধ্যেও খ থেকে আলো প্রতিফলিত হবার মধ্যে কালিক সম্পর্ক আছে। যেসব ঘটনা ক থেকে আলো পাঠাবার আগে সেখানে ঘটেছে তা খ থেকে আলো প্রতিফলিত হবার ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার যেসব ঘটনা খ থেকে আলো আসার পরে ক-তে ঘটেছে সেগুলো খ-তে আলো প্রতিফলিত হবার ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আগের ঘটনাগুলোকে আমরা বলব পরম আগের ঘটনা। পরের ঘটনাগুলোকে বলব পরম পরের ঘটনা। সুতরাং কালিক সম্পর্ক শুধু সেইসব ঘটনার মধ্যেই আছে যাদের মধ্যে ভৌত মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে। যেসব ঘটনার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে না, সেইসব ঘটনাকে সমকালীন বলতে পারি। কোন্ কোন্ ঘটনার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে না? যেসব ঘটনার মধ্যে কালিক ব্যবধান স্থানিক ব্যবধানের তুলনায় এত কম যে আলোর সংকেত দ্বারাও এইসব ঘটনার মধ্যে সংযোগ সম্ভব নয়। এইসব ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নেই।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের অনেক ভুল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাই এই কারণে যে, স্থান ও কাল মিলে চারমাত্রিক যে স্থান-কাল সন্ততি সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে স্থান ও কালের মধ্যে যে একটি পার্থক্য আছে তা অনেকেই ভুলে যায়। জ্যামিতিকভাবে স্থান ও কালকে অভিন্ন করে দেখার একটি প্রবণতা থেকেই এটি ঘটে। আইনস্টাইন নিজেও এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, স্থান ও কাল আপেক্ষিকতার তত্ত্বে সমন্বিত হলেও সময়কে স্থানের চতুর্থ মাত্রা বলা যাবে না। স্থানের মধ্যে যেমন আমরা সামনের দিকে অথবা পিছনের দিকে যেতে পারি, সময়ের বেলায় তা ঘটে না। কারণ একটি টেলিগ্রামকে আমরা

অতীতে পাঠিয়ে দিতে পারি না। দুটো ঘটনার মধ্যে যখন কালিক ব্যবধান থাকে অর্থাৎ কালিক পর্যায়ে ঘটনাগুলো ধরা পড়ে কোনো প্রসঙ্গকাঠামো থেকে— এদের মধ্যেকার কালিক ব্যবধান আমাদের কাছে ভিন্ন হতে পারে, যদি অন্য এক প্রসঙ্গকাঠামো থেকে এই ঘটনা দুটো দেখা যায়। কতটা পরিবর্তন ঘটবে এদের সময়ের ব্যবধানে তা নির্ভর করে দুই প্রসঙ্গকাঠামোর মধ্যে আপেক্ষিক গতি কত তার ওপরে। কিন্তু দুটো ঘটনা যদি কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে এদের কালিক পর্যায়কে কোনোভাবেই বদলে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ যে-কোনো প্রসঙ্গকাঠামো থেকেই দেখা হোক না কেন, আগের ঘটনাকে পরের ঘটনা করা যাবে না। যাঁরা বলেন আপেক্ষিকতার তত্ত্বে সবকিছুই আপেক্ষিক, তাঁদের বুঝতে হবে, কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত ঘটনার মধ্যে যে আগে-পরের পর্যায় তা একটি অপরিবর্তী সম্পর্ক। যেসব ঘটনা কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত নয়, শুধু সেখানেই ঘটনার কালিক পর্যায়কে উল্টানো যায়, পর্যবেক্ষকের প্রসঙ্গকাঠামোকে বদলে দিয়ে। যুগপত্ত ও কালিক পর্যায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আপেক্ষিক নয় তা বোঝার জন্য চারটি অবস্থা বা সন্ধিক্ষণকে আমরা পৃথক করে এখানে দেখতে পারি—

১। একই স্থানে সংঘটিত যুগপৎ ও পরপর সংঘটিত ঘটনা,

২। স্থানিক ব্যবধানে সংঘটিত যুগপৎ ঘটনা,

৩। স্থানিক ব্যবধানে পরপর সংঘটিত, কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত ঘটনা,

৪। কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত নয় এমন ঘটনার পরপর ঘটা।

প্রথম ক্ষেত্রে যুগপত্ত ও পর্যায়ক্রম সব প্রসঙ্গকাঠামো থেকে অপরিবর্তী থাকবে। অর্থাৎ একই স্থানে যদি যুগপৎ ঘটনা ঘটে, তাহলে যে-কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে তা যুগপৎ থাকবে এবং কোনো পর্যবেক্ষকের কাছেই এইসব ঘটনার পর্যায়ক্রম উল্টে যাবে না।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে স্থানিক ব্যবধানে অবস্থিত দুটো ঘটনা যদি কেবল পর্যবেক্ষকের কাছে যুগপৎ মনে হয়, তা অন্য পর্যবেক্ষকের কাছে যুগপৎ মনে হবে না, যদি দুই পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকে। তবে তারা যদি কোনো আপেক্ষিক গতিতে না থাকে তাহলে যুগপত্তা বজায় থাকবে।

তৃতীয় ক্ষেত্রে স্থানিক ব্যবধানে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত যেসব ঘটনা তাদের কালিক পর্যায় বদলানো যায় না। যেসব ঘটনা স্থানিক ব্যবধানে সংঘটিত হয় এবং তারা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত নয় শুধু সেইসব ঘটনার কালিক পর্যায়কে উল্টানো যায়, পর্যবেক্ষকের প্রসঙ্গকাঠামোকে বদলে দিয়ে। মনে রাখতে হবে সেইসব দূরের ঘটনা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত নয় যাদের কালিক ব্যবধানকে আলোর গতি দিয়ে গুণ করলেও এদের ব্যবধানের সমান হয় না।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে 'এখন ঐখানে' বলে কিছু নেই। শুধু আছে 'এখন এইখানে'। মহাবিশ্বজুড়ে যদি ঘটনামালাকে আমরা সাজাতে চাই বা বুঝতে চাই স্থান ও কালের ঠিকানায়, তাহলে দুটো মৌলিক সম্পর্ক শুধু আমরা পেতে পারি।

পর্যায়ক্রমিক কার্যকারণ সম্পর্ক অর্থাৎ দূরের বস্তুমালার সঙ্গে সময়ের ব্যবধানে শুধু আমরা কার্যকারণ সম্পর্কে আসতে পারি। অথবা এই মুহূর্তে আমরা কার্যকারণ সম্পর্কহীনভাবে সমগ্রবিশ্বে অবস্থান করতে পারি।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে স্থান-কালের সম্পর্কের স্বরূপ

সনাতনী পদার্থবিদ্যা ও বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে স্থান-কালের ধারণার যে মূল পার্থক্য তা হল— প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাৎক্ষণিক তিনমাত্রিক প্রস্থচ্ছেদ পেতে পারি, সময়ের অক্ষের সঙ্গে যা অভিলম্বিক। এই তিনমাত্রিক প্রস্থচ্ছেদই হচ্ছে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় তাৎক্ষণিক তিনমাত্রিক স্থান। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এর বিস্তার এবং সব প্রসঙ্গকাঠামোর জন্যেই এটা অভিন্ন। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে স্থান-কালের এই সম্পর্কটি কার্যকর নয়। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে স্থান-কালের সম্পর্কের যে স্বরূপ তা চিত্রিত করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে স্থান ও কালের জন্য পরস্পরের নিরপেক্ষ প্রসঙ্গকাঠামো না ধরে, স্থান-কাল সন্ততিকে একত্রে ব্যবহার করা। স্থান ও কাল পৃথকভাবে এখানে বিবেচ্য নয়। বরং এদের সমন্বয়ে সৃষ্ট ঘটনা হচ্ছে মূল অধিগম্য বিষয়।

স্থান ও কালের মধ্যে কাঠামোগত সম্পর্ক কী? তা উদ্‌ঘাটন করতে হলে স্থান-কাল সন্ততিতে ঘটনার বিন্যাসকে বুঝতে হবে। নিউটন ইউক্লিডের যে জ্যামিতি ব্যবহার করেছেন, সেখানে স্থানিক বিন্দুসমূহের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়েছিল স্থান। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ঘটনা স্থানিক বিন্দুকে প্রতিস্থাপিত করছে স্থান-কাল সন্ততিতে। আপেক্ষিকতার এই স্থান-কালে দুটো ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করে, যে আপেক্ষিক কালিক ব্যবধানে ঘটনা দুটো ঘটল সেই সময়ের মধ্যে আলো কি এদের মধ্যেকার স্থানিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে অথবা পারবে না, তার উপরে। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে এর কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ একটি ঘটনার দ্বারা অন্য ঘটনাটি প্রভাবিত হতে পারে। অন্যদিকে এদের মধ্যেকার আপেক্ষিক কালিক ব্যবধান যদি এমন হয় যে, আলোর গতিতে ছুটেও এই সময়ের ব্যবধানে এদের মধ্যেকার স্থানিক ব্যবধান অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে এই দুই ঘটনা কার্যকারণ সম্পর্কহীন। ধরা যাক আমার নিজস্ব প্রসঙ্গকাঠামোতে 'এখন-এইখানে' একটি ঘটনা ঘটল। অন্য একটি প্রসঙ্গকাঠমোতে, যার সঙ্গে আমার প্রসঙ্গকাঠামোর একটি আপেক্ষিক গতি আছে, আর-একটি ঘটনা ঘটল। আমাদের সমস্যা হল, এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক কী, তা নির্ধারণ করা।

নিউটনীয় স্থান-কালে সমস্ত ঘটনাই কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। কারণ যে-ঘটনাটি এখন এইখানে ঘটল, তা ভবিষ্যতে সংঘটিত দূরের যে-কোনো ঘটনাকে প্রভাবিত করবে, এবং অতীতে সংঘটিত দূরের যে-কোনো ঘটনার প্রভাব 'এখন

এইখানে' সংঘটিত ঘটনার ওপর পড়বে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের স্থান-কালে ঘটনাজালকে সাজালে আমরা দেখি, যে-ঘটনাগুলো যুগপৎ ছিল নিউটনীয় স্থান-কালে, তা কার্যকারণ সম্পর্কহীন ঘটনার একটি কৌণিক এলাকার মধ্যে গিয়ে পড়ছে। পরম যুগপত্ত আপেক্ষিকতার তত্ত্বে দূরীভূত হলেও, যেসব ঘটনা স্থানিক ব্যবধানে ঘটছে, তাদের মধ্যে কালিক সম্পর্ক থাকতে পারে। অর্থাৎ কিছু ঘটনা আছে যা অতীতে অন্যস্থানে ঘটেছে যা 'এখন-এখানের' ঘটনাকে প্রভাবিত করছে। আবার দূরে সংঘটিতব্য কিছু ঘটনা আছে যার ওপরে 'এখন-এখানের' ঘটনা প্রভাব রাখতে পারে। প্রথম দলে পড়ে কার্যকারণ সম্পর্কিত অতীতের ঘটনা, এবং পরবর্তী দলে পড়ে কার্যকারণ সম্পর্কিত ভবিষ্যতের ঘটনা। স্থান ও কালের ব্যববধান অবশ্য নির্ভর করছে দুটো প্রসঙ্গকাঠামোর আপেক্ষিক গতির ওপরে। অর্থাৎ 'এখন-এখানে' যে ঘটনাটি যে প্রসঙ্গকাঠামো থেকে দেখলাম, এবং অন্য কখনো অন্য কোথাও সংঘটিত ঘটনাটি যে প্রসঙ্গকাঠামো থেকে দেখা হল—এদের আপেক্ষিক গতি দুটো ঘটনার মধ্যে স্থান-কালের ব্যবধান নির্ধারণ করছে। এসব তথ্য লরেঞ্জের রূপান্তরণ সমীকরণ থেকেই আসে। কিন্তু আমরা এখানে স্থান-কালের সম্পর্ক বিষয়ে নতুন যে উপলব্ধি বা ভৌত ধারণা, তা ব্যাখ্যা করতে চাই।

নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় সমস্ত ঘটনাই যেখানে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত, আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তা নয়। পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক গতি আছে এমন দুই প্রসঙ্গকাঠামো থেকে দুইজন পর্যবেক্ষক যখন দুটো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তখন স্থান-কালের কাঠামোতে দুটো ঘটনার অবস্থান অনুসারে এরা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত হতে পারে অথবা কার্যকারণ সম্পর্কমুক্ত হতে পারে। কার্যকারণ সম্পর্কমুক্ত এলাকায় যেসব ঘটনা অবস্থান করে তাদের মধ্যে কালিক ব্যবধানই শুধু বদলে যায়নি, পর্যবেক্ষকদের আপেক্ষিক গতির কারণে এদের পূর্বাপর সম্পর্কও উল্টে যেতে পারে। অন্যদিকে যেসব ঘটনা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক হল অতীতের ঘটনা যা বর্তমানের ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্য দলে পড়ে শুধু ভবিষ্যতের ঘটনা যার ওপরে বর্তমানের অর্থাৎ 'এখন-এখানের' ঘটনা প্রভাব রাখতে পারে। কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত ঘটনামালার বৈশিষ্ট্য হল, যে প্রসঙ্গকাঠামো থেকেই এদের দেখা যাক না কেন, এদের মধ্যে কারো কালিক ব্যবধান বদলানো গেলেও পূর্বাপর সম্পর্ক কিছুতেই বদলানো যায় না। স্থান-কালের কাঠামোতে ঘটনামালায় এর পারস্পরিক সম্পর্ক, আমরা দেখব, আলোর সসীম ও ধ্রুব গতির জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। আলোর গতি যদি অসীম হত, নিউটনীয় সময় ও আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সময় অভিন্ন হত। স্থান-কালের চিত্রে ঘটনামালার মধ্যেকার সম্পর্ক আমরা এবার দেখতে পারি, এবং সেইসঙ্গে সময়ের ওপরে নিউটনীয় তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতার তত্ত্বের প্রভাবের পার্থক্যও।

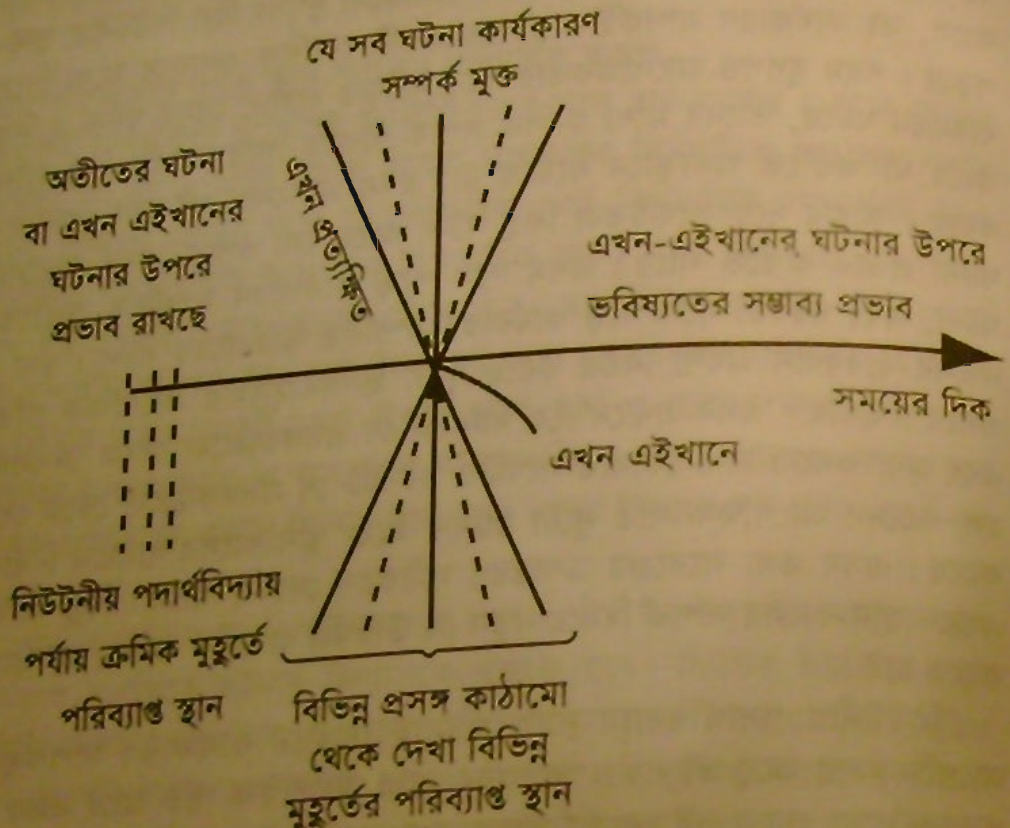

স্থান- কালের চিত্র

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ঘটনামালার কালিক পর্যায়, প্রসঙ্গকাঠামোর আপেক্ষিক গতির ওপরে কেমন করে নির্ভর করে, তা আমরা সহজ একটি হিসাব থেকে দেখতে পারি। ধরা যাক পর্যবেক্ষক ক ও খ একই সঙ্গে একটি ঘটনা ঘ-এর অবস্থানে আছে। সুতরাং এই ঘটনার অবস্থান থেকে দুজন পর্যবেক্ষকের দূরত্বই শূন্য। এরা এদের ঘড়িকেও এই ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে নিল যে এদের ঘড়ি শূন্য সময় গণনা করল। ধরা যাক, পর্যবেক্ষক ক r দূরত্বে ও t সময়ে আরো একটি ঘটনা ঙ দেখল। যদি পর্যবেক্ষক খ, ক এর পরিপেক্ষিতে v আপেক্ষিক গতিতে ছুটতে থাকে, তাহলে লরেঞ্জের সমীকরণ অনুসারে খ,ঙ ঘটনাকে দেখবে t^1 সময়ে, যেখানে

$$t^1 = \frac{t - vr/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

c এখানে আলোর গতি।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে কোনো বস্তুর গতি যেহেতু আলোর গতিকে অতিক্রম করতে পারে না, এখানে v-এর মান c-এর চেয়ে কম হবে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে r যদি ct থেকে ছোট হয় তাহলে t^1 হবে শূন্যের চেয়ে বড়। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক খ-এর কাছে ঘটনাটি খ-এর পরেই ঘটবে। যদি r = ct হয় তাহলেও v-এর যে-কোনো অনুমোদিত মানের জন্য দুটো ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু r যদি ct-এর চেয়ে বড় হয়, আমরা v-এর অনুমোদিত এমন মান পেতে পারি যার জন্য, $t^1 = 0$ অর্থাৎ $v = c^2t/r$ । এখানে $v < c$। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক খ-এর কাছে ঘটনা ঘ ও ঙ যুগপৎ মনে হবে। এমন কী v-এর মান যদি c^2t/r-এর বেশি হয় এবং c-এর চেয়ে কম হয়, t^1-এর মান হবে ঋণাত্মক। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক খ-এর কাছে ঙ ঘটনাটি ঘ-এর আগে ঘটবে। অর্থাৎ ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্ক যাবে বদলে। ছবিতে এই বিষয়টি তুলে ধরতে পারি।

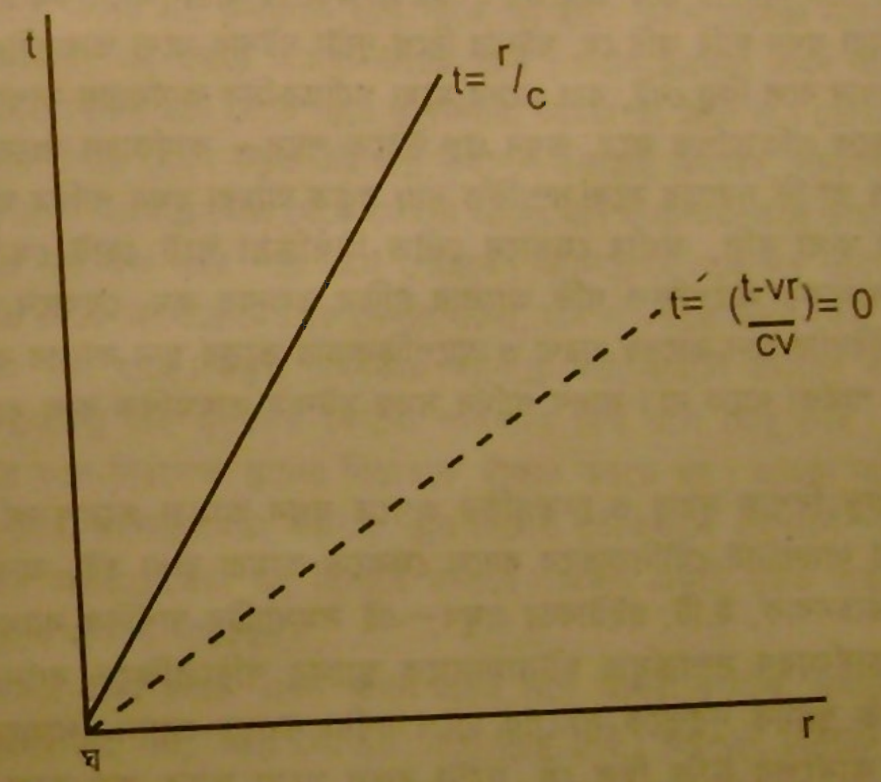

এখানে t ও r দুই অক্ষরূপ দেখানো হয়েছে পর্যবেক্ষক ক-এর পরিপ্রেক্ষিতে। পর্যবেক্ষক খ যেসব ঘটনাকে ঘ ঘটনার সঙ্গে যুগপৎ দেখে, তাদের ক্ষেত্রে $t^1 = 0$ রেখাটি প্রযোজ্য এবং সেসব ঘটনায় ক-এর পরিপ্রেক্ষিতে $t = vr/c^2$ এই রেখাটি সবসময়ই $t = v/c$ রেখার নিচে অবস্থান করবে। কারণ $v < c$। r যদি ct-এর চেয়ে ছোট হয়, তাহলে ঘটনা ঙ, $t = r/c$ রেখার উপরে অবস্থান করবে, যেমন ঙ^1 যা $t^1 = 0$ রেখারও উপরে থাকবে। এর ফলে ঙ ঘটনাটি খ এর কাছে যে সময় t-এ ঘটবে তা t-এর চেয়ে বেশি অর্থাৎ ঘ ঘটনাটি

এর কাছে ক-এর পরে ঘটবে। কিন্তু r যদি ct-এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে ঙ-এর অবস্থান হবে $t = r/c$ রেখার নিচে, যা ঙ² বিন্দুতে। সেক্ষেত্রে আমরা v-এর জন্য এমন একটি অনুমোদন পেতে পারি যার ঙ²-এর অবস্থান হবে রেখার উপরে। এর ফলে পর্যবেক্ষক খ-এর জন্য ঙ² ও খ যুগপৎ মনে হবে। অবশেষে ঙ যদি এই রেখার নিচে অবস্থান করে, যেমন ঙ³ বিন্দুতে, তাহলে $t^1 < 0$ হবে, এবং খ-এর কাছে ঙ ঘটনাটি ঘ ঘটনার আগে সংঘটিত হবে।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে দূরত্ব ও এর দার্শনিক ব্যাখ্যা

স্থানিক ও কালিক ব্যবধান, ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্ক ও কার্যকারণের ভিত্তি আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আমূলভাবে বদলে গেলেও, আমাদের মনে এসব নিয়ে স্বজ্ঞামূলক ধারণা নানাভাবে উঁকি দেয়। সাধারণ অর্থাৎ আমরা দূরত্বের যে-ধারণাকে ব্যবহার করি তার গুরুত্ব কতটা অবশেষ থাকে আপেক্ষিকতার তত্ত্বে? আমরা যখন দাবি করি যে, ঘটনার বিশ্বে দুটো ঘটনার মধ্যে তাৎক্ষণিক স্থানিক ব্যবধান বলে কিছু নেই, বরং এদের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক কার্যকারণ সম্পর্ক স্থানিক দূরত্বকে প্রতিস্থাপিত করে, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে— কার্যকারণ সংযোগের যে ব্যাপ্তি তা কি দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়? বস্তুত আমরা যখন পার্থিব ঘটনামালা নিয়ে কথা বলি, অর্থাৎ যেখানে ভৌত মিথস্ক্রিয়া ঘটে ছোট স্কেলে এবং পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতি আলোর গতির তুলনায় কম, সেখানে সনাতনী পদার্থবিদ্যার স্থান-কালের ধারণা ও আপেক্ষিকতার তত্ত্বের স্থান-কালের কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। কারণ পার্থিব সমস্ত ঘটনাই তাৎক্ষণিক বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু বিশাল দূরত্ব ও দ্রুতগতির জগতে যখন আমরা প্রবেশ করি তখন দূরত্বের ধারণাটাই মৌলিকভাবে বদলে ফেলতে আমরা বাধ্য হই, আর কার্নপ এইচ রিচেনবাক, ই.টি. হুইটাকার প্রমুখ—এই সমস্যাটির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত ঘটনামালাকে স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করার বিপরীতে স্থানিক দূরত্বকে সময়ের মাপে বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কার্নপের উক্তি ছিল যে, দুটো বস্তুর মধ্যে দূরত্ব কম হলে এদের পারস্পরিক ভৌত মিথস্ক্রিয়া অল্প কালিক ব্যবধানে ঘটে—এ কথা না বলে বরং বলা উচিত যে, দুটো বস্তুর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অল্পকালের ব্যবধানে হলে এরা পরস্পরের কাছাকাছি। এই কথাকে ইটি হুইটাকার আরো সুন্দর করে বলেছেন এইভাবে : জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন বলেন অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে তখন সে দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই ঘটনাদুটো হল দুটো বিশ্ব-বিন্দু (Word point), যা স্থান-কাল কাঠামো বা জ্যামিতিতে অবস্থিত। একটি বিন্দু হচ্ছে এই ঘটনা যে আমরা এখন অ্যানড্রোমেডা

থেকে বিকীর্ণ আলো এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছি, আর একটি World point বা ঘটনা হল—অ্যানড্রোমেডা থেকে আমাদের সময়ের হিসাবে দশ লক্ষ বছর আগে আলো বিকীর্ণ হয়েছিল। তাহলে দূর অতীতে অর্থাৎ দশ লক্ষ বছর আগে অ্যানড্রোমেডায় সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে, 'এখন-এখানে' অর্থাৎ পৃথিবীতে এই মুহূর্তে সেই আলো প্রত্যক্ষ করার ঘটনাকে, আমরা কার্যকারণ দ্বারা সম্পর্কিত করছি।

এই কথাটিই আমরা আগে বলেছি যে, আমরা যখন দূরত্বের কথা বলি, তখন 'এখন-এখানে' ও 'এখন অন্য কোথাও'-এর মধ্যে সম্পর্কের কথা বলি না। বরং 'এখন-এখানে' ও 'তখন সেখানে' ওই দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করি। আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই অর্থেই স্থান-কাল একীভূত অর্থাৎ স্থানিক সম্পর্ক কালিক বিস্তারের মধ্যে বিধৃত।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, তা হল : অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা এখন কোথায়? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি : অ্যানড্রোমেডা এখন থাকতে পারে অথবা বিলীন হয়ে যেতে পারে ধূলিকণায়, আমরা তা জানি না। ভৌতভাবে তা জানার উপায় নেই। বস্তুত এই প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই অবাস্তব, পদার্থবিদ্যার ভাষায়। এখন অ্যানড্রোমেডা থেকে কোনো আলো যদি যাত্রা শুরু করে তাহলে তা পৃথিবীতে দশ লক্ষ বছর পরে এসে পৌঁছবে। অ্যানড্রোমেডাকে দূর ভবিষ্যতের পৃথিবীতে থেকে অ্যানড্রোমেডাকে দেখার ঘটনা, যদি পৃথিবীতে তখন কেউ থাকে, সম্পর্কিত করা যাবে। বস্তুত এখনকার অ্যানড্রোমেডা কথাটা উচ্চারণ করাটাই ভুল— যেহেতু এই মুহূর্তের কোনো পরিব্যাপ্ত বিশ্ব বলে কিছু নেই। কারণ সেক্ষেত্রে কাল-নিরপেক্ষ স্থানের বিস্তারকে স্বীকার করতে হয়। আমরা সাধারণত এই মুহূর্তের অ্যানড্রোমেডা কল্পনায় স্থান দিলেও ভৌতভাবে এইখানে পৃথিবীতে অতীতের অ্যানড্রোমেডা শুধু হিসাবে আসবে। অর্থাৎ একটি মুহূর্ত একই সঙ্গে দুটো স্থানে থাকতে পারে না।

আমরা যখন বলছি 'এখন' তখন একই সঙ্গে আমরা বুঝাচ্ছি 'এখানে'। এর অর্থ অবশ্য এই নয়, 'অন্য কোথাও' বলে কিছু নেই। শুধু এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে যে, স্থানিক ব্যবধানে যার অবস্থান তার কালিক ব্যবধানও থাকতে হবে। আমরা গাণিতিকভাবে এই দুই বিশ্ববিন্দু বা World point-এর মধ্যে সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করতে পারি। যেমন আমাদের 'এখন এখানে' ঘটনাটি কার্যকারণ সম্পর্কে প্রভাবিত হতে পারে 'অতীতের অন্য কোথাও' ঘটনার দ্বারা এবং প্রভাব রাখতে পারে 'ভবিষ্যতের অন্য কোথাও' ঘটনার ওপরে। কিন্তু 'অতীতের অন্য কোথাও' এবং ভবিষ্যতের অন্য কোথাও-এর মধ্যে কী আছে? আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব আছে সেইসব ঘটনার, এখন যেগুলো এখানের ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কহীন, ফলে যাদের কোনো প্রভাব 'এখন

এখানের' ঘটনার ওপরে পড়বে না, এবং যাদের ওপরে 'এখন এখানে' কোনো প্রভাব রাখবে না।

একটি সময়ের বিস্তারের মধ্যে অবস্থিত এই সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত ঘটনাকে হোইট হেড বলেছেন, Copresence বা সহ-উপস্থিতি, এবং এডিংটন বলেছেন Else where বা অন্য কোথাও। খেয়াল রাখতে হবে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় যেসব ঘটনা ছিল যুগপৎ, তাই এখন সময়ের একটি বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করছে। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কহীনভাবে। ফলে এরা যুগপৎ না হলেও এদেরকে সমকালীন বলতে পারি। কারণ স্থান-কালের মানচিত্রে এরা একগুচ্ছ ঘটনা যা কার্যকারণ সম্পর্কমুক্ত। পর্যবেক্ষকের প্রসঙ্গকাঠামোর আপেক্ষিক গতির ওপরে নির্ভর করে এইসব ঘটনার একটি অন্য একটির সঙ্গে যুগপৎ হয়ে উঠতে পারে। এমনকি এদের কালিক ব্যবধান ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক হতে পারে। অর্থাৎ এদের পূর্বাপর সম্পর্কও উল্টে যেতে পারে।

তাহলে আমরা দেখতে পারছি আপেক্ষিকতার তত্ত্বে দুটো ভিন্ন ধরনের দলে স্থান-কালের ঘটনাকে আমরা ভাগ করতে পারি। একদল ঘটনা আছে যাদের মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্ক আছে। এদের মধ্যেকার কালিক ব্যবধান আপেক্ষিক গতির পরিবর্তনে অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রসঙ্গকাঠামো পর্যবেক্ষক দ্বারা নির্বাচিত হবার ফলে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্ক কখনো বদলায় না। অর্থাৎ আগের ঘটনা সবসময় আগেই থাকবে এবং পরের ঘটনা পরে—যে-কোনো প্রসঙ্গকাঠামো থেকেই আমরা এদের প্রত্যক্ষ করি না কেন।

অন্য দলের ঘটনাগুলো কার্যকারণ সম্পর্কমুক্ত। এরা যুগপৎ না হলেও এদেরকে আমরা সমকালীন বলতে পারি এই অর্থে যে এদের মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত রেখার উপরে প্রতিটি বিন্দু হচ্ছে এক-একটি ঘটনা।

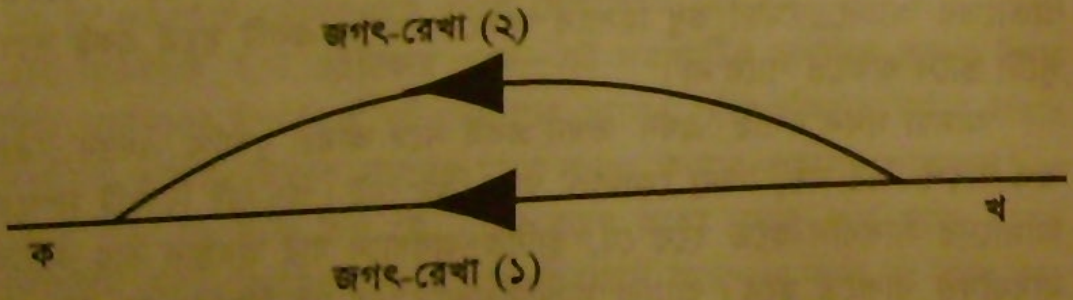

উপরের এমন একটি চিত্রে ক হচ্ছে একটি ঘটনা বিন্দু, যেখান থেকে দুটো জগৎ-রেখা পৃথক হয়ে গেছে। যেমন একটি রকেট যদি নিক্ষিপ্ত হয় তাহলে আপেক্ষিক গতির কারণে যে পূর্বাপর সম্পর্ক তা পরম নয়। পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির ওপরে নির্ভর করে এই পূর্বাপর সম্পর্ক বদলে যেতে পারে। এবং বিশেষ প্রসঙ্গকাঠামোতে দুটি ঘটনার মধ্যে কালিক ব্যবধান থাকলেও তা অন্য কাঠামোতে যুগপৎ হয়ে উঠতে পারে।

জগৎ-রেখা

আমরা দেখেছি, আপেক্ষিকতার তত্ত্বে স্থানকে কালের নিরপেক্ষ করে উপস্থাপনের কোনো অবকাশ নেই। স্থান-কালের এই একীভবনের বিষয়টি বুঝাবার জন্য একধরনের চিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে স্থানকে সংক্ষেপে একমাত্রিক একটি রেখা বরাবর ও সময়কে এর সঙ্গে লম্বভাবে অন্য একটি অক্ষরূপে প্রদর্শিত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু সেইসব বস্তু, যা পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আপেক্ষিক গতি শূন্য অর্থাৎ পর্যবেক্ষকের প্রসঙ্গকাঠামোতে স্থির হয়ে আছে, তাদের অবস্থানকে স্থানের অক্ষ বরাবর সরলরেখার উপরে আমরা দেখতে পাব। এবং সময় সময়ের অক্ষ বরাবর প্রবাহিত হবেই। কিন্তু কোনো বস্তু যদি চলতে থাকে, তাহলে তার স্থানিক ও কালিক অবস্থানে গতিশীলভাবে যেসব বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত হবে সেইসব বিন্দুকে সংযুক্তকারী রেখাকে বলা হয় জগৎ-রেখা (World point)। বিভিন্ন গতির বস্তুর জন্য এই জগৎ-রেখা ভিন্ন ভিন্ন বক্রতা পায়। স্থান-কালের অক্ষাংশ পৃথিবীর একজন পর্যবেক্ষকের তুলনায় একজন রকেট-যাত্রীর ভিন্ন হবে, ফলে এর জগৎ-রেখাও। এই রকেট-যাত্রী যদি আবার ফিরে আসে, তাহলে সেই প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে আমরা খ বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি। জগৎ-রেখা-১ ও জগৎ-রেখা-২ পরিমাণগত (Metrical) ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, এদের পর্যায়ক্রমিকতা অপরিবর্তনীয়।

একটি রকেটের নিক্ষিপ্ত হওয়া ও ফিরে আসার ঘটনাদুটি দুই ভিন্ন জগৎ-রেখার দ্বারা সংযুক্ত হবার অর্থ হল, স্থান-কালের বহুপদিতা লাভ করা। এই বহুপদিতা সময়ের একক পর্যায়ক্রমিকতা থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। স্থান-কালের সমন্বিত বা একীভূত হবার একটি গভীরতর তাৎপর্য আমরা এখানে দেখতে পারি জগৎ-রেখার চিত্র থেকে। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় যাকে স্থানিক দূরত্ব বলা হত, তাকে কার্নপ ও রিচেনবাক কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যবধানরূপে এখন বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ সূর্য যে আমাদের থেকে নেপচুনের তুলনায় নিকটতর দূরত্বে অবস্থান করে তার প্রকাশ ঘটছে এইভাবে : সূর্য আমাদের থেকে যেখানে আট আলোক-মিনিট দূরে, নেপচুন সেখানে চার আলোক-ঘণ্টা দূরে। কিন্তু এভাবে দূরত্বকে সম্পূর্ণ সময়ের ব্যবধানরূপে প্রকাশ করার বিরুদ্ধে এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে : আট মিনিটে ও চার ঘণ্টায় যথাক্রমে সূর্য বা নেপচুন থেকে আলো পাবার ঘটনায় শুধু কি সময় দ্বারা আমরা প্রভাবিত হচ্ছিলাম? স্থানিক দূরত্ব কি আমাদের প্রভাবিত করছিল না একই সঙ্গে? বস্তুত কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত দুটো ঘটনাকে বিশুদ্ধ কালিক ব্যবধানরূপে বর্ণনা করতে গিয়ে, সনাতনী পদার্থবিদ্যার স্থানিক দূরত্বকে সময়ের দূরত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হলেও, স্থান-কালের দূরত্বের সঙ্গে কালিক দূরত্বের একটি পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটি হল দুটো ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ-নিরপেক্ষতার কালিক ব্যবধান। যেমন সূর্যের বেলায় এই ব্যবধানটি হল ষোলো মিনিট, নেপচুনের বেলায় আট ঘণ্টা এবং অ্যানড্রোমেডার জন্য বিশ

লক্ষ বছর। কার্যকারণ নিরপেক্ষতার এই কালিক বিরতি হচ্ছে, কার্যকারণ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে যে সময় লাগে তার দ্বিগুণ। দুটো ঘটনা যদি একই স্থানে ঘটে, সেখানে কার্যকারণ নিরপেক্ষতার কালিক ব্যবধান শূন্য। আমরা যখন 'অন্য কোথাও' বলি তা যে একই সঙ্গে 'অন্য কখনও বটে'—এই কথার অর্থ এখন স্পষ্ট।

প্রান্তিক ক্ষেত্রে দুটো ঘটনার মধ্যে দূরত্ব যখন কম, তখন কার্যকারণ নিরপেক্ষতার কালিক ব্যবধান প্রায় শূন্য হয়ে যায় বলেই, শুধু স্থানিক দূরত্বের সাহায্যে এদের অবস্থান প্রকাশ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এর বাইরে যে-কোনো দুটো ঘটনার সম্পর্ক চারমাত্রিক স্থান-কালের সন্ততিতে প্রকাশিত হতে হবে। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে আমাদের পৃথিবীতে বা গ্রহদের দূরত্বে কাজ করে, তার কারণ এখানে সংঘটিত ঘটনার বেলায় কার্যকারণ নিরপেক্ষতার কালিক ব্যবধান নগণ্য।

আমরা দেখতে পাচ্ছি সময়কে জ্যামিতিক রেখা অর্থাৎ স্থানের মতোন করে চিত্রিত করার মধ্যে দু-ধরনের ভ্রান্তি আছে। প্রথমত, এতে কালিক প্রক্রিয়াটি প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং দ্বিতীয়ত, এর ফলে আমরা একটি ভ্রান্ত ধারণা পাই যে, কালিক প্রক্রিয়া বা ঘটনাপ্রবাহ যেন জ্যামিতিক রেখার মতো প্রশস্তহীন। কিন্তু সময়ের এই চিত্র হচ্ছে অতিমাত্রায় বিমূর্ত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি প্রশস্ততা আছে, একটি অসম্পূর্ণতা আছে। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় সময়কে একমাত্রিক রেখার মতো অবিচ্ছিন্ন এবং সীমাহীন ক্ষুদ্র সময়ের বিন্দুতে বিভাজনযোগ্যরূপে ভাবার মধ্যে আরো একটি ভ্রান্তি আছে। কালিক প্রক্রিয়াকে আমরা বিস্তারহীন জ্যামিতিক কালিক বিন্দুর সমাবেশরূপে যে ভাবতে পারি না তা আমরা আলোচনা করব এরপর।

সময়ের উপরে আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের প্রভাব

আমরা দেখেছি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব সময়ের নিউটনীয় ধারণাকে কীভাবে বদলে দিয়েছে। দুই ভিন্ন স্থানে ও সময়ে সংঘটিত ঘটনার মধ্যে স্থানিক বা কালিক ব্যবধান নিউটনের পদার্থবিদ্যায় যেখানে সব পর্যবেক্ষকের কাছেই অভিন্ন, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে তা পর্যবেক্ষকের গতি-নির্ভর। স্থান ও কাল পরস্পরের নিরপেক্ষতা হারিয়ে এখানে চারমাত্রিক স্থান-কাল সন্ততিরূপে বিস্তৃত। বিশ্বজুড়ে অভিন্ন কালিক মুহূর্তের ধারণা লুপ্ত। যুগপত্তের ধারণা রূপান্তরিত। সময়ের রৈখিক অপরিবর্তী প্রবহমানতার ধারণা বর্জিত, সেইসঙ্গে এর নিরপেক্ষতা ও নিষ্ক্রিয়তার ধারণাও। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে আইনস্টাইনের সবচেয়ে চমৎকার উদ্ভাবন হল সময়ের সম্পর্কজাত ধারণা (Relational Concept of time) সম্পর্কে ব্যাখ্যা।

সময় সম্পর্কে সনাতনী ধারণার সমর্থকদের পক্ষ থেকে যে-প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল তা হল—সময় যদি বিশ্বজগৎ ও পর্যবেক্ষকের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপার হয়, একই ঘটনার জন্য বিভিন্ন সময় যদি নির্দেশিত হয় বিভিন্ন পর্যবেক্ষক দ্বারা, তা হলে কোনো ঘটনার নির্দেশকরূপে সময়ের গুরুত্ব কোথায় গেল? এর জবাবে আইনস্টাইন সমস্ত জড়কাঠামোর জন্য সমতুল্যতার নীতি উপস্থিত করলেন। অর্থাৎ যেসব পর্যবেক্ষক পরস্পরের তুলনায় সুষম গতিতে ছুটছে, অথবা স্থির হয়ে আছে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যযোগ্যতা নেই। এরা কেউই অন্যের তুলনায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নয়। ফলে এদের দেখা বিশ্বজগৎ অভিন্নরূপে প্রতিফলিত হতে হবে পদার্থবিদ্যার নিয়মের মধ্যে।

কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে সুবিধাপ্রাপ্ত বিশেষ কোনো পর্যবেক্ষক স্বীকৃত না হলেও সুবিধাপ্রাপ্ত একটি বিশেষ দল বা শ্রেণী আছে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে। এরা হচ্ছে সেইসব পর্যবেক্ষক, যারা পরস্পরের তুলনায় নির্দিষ্ট গতিতে ছুটছে অথবা থেমে আছে। নিউটনের বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে আমরা জানি, বল প্রযুক্ত না হলে কোনো বস্তু স্থির থাকে অথবা অপরিবর্তী গতিতে চলে। সুতরাং আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে শুধু সেইসব প্রসঙ্গকাঠামো অন্তর্ভুক্ত যাদের ওপরে কোনো বল কাজ করছে না, ফলে যাদের মধ্যে কোনো ত্বরণ নেই। অন্যভাবে বলা যায় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব জড়ব্যবস্থার (inertial sys-

tem) অন্তর্গত ঘটনামালার জন্যেই শুধু প্রযোজ্য। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের এই সীমাবদ্ধতা আইনস্টাইনকে অতৃপ্তি দিচ্ছিল।

আইনস্টাইন এবং মহাকর্ষ

আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সহভেদ (Covariance) -এর নীতি উপস্থিত করলেন। এই সহভেদ নীতির মূল কথা হল—সব ধরনের পর্যবেক্ষকের সবরকম গতির জন্যেই পর্যবেক্ষণলব্ধ জগতের নিয়ম অভিন্ন গাণিতিক সূত্রের কাঠামোতে প্রকাশযোগ্য হবে। অর্থাৎ আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে, শুধু পরস্পরের সঙ্গে সুষম গতিতে চলা পর্যবেক্ষকদের বেলায় যেখানে সমতুল্যতার নীতি প্রযোজ্য ছিল, আইনস্টাইন সেই সুষম গতির শর্ত তুলে দিয়ে সবধরনের গতির জন্যেই সহভেদের নীতি প্রয়োগ করলেন, তাঁর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে। আপেক্ষিকতার এই সার্বিক তত্ত্বে অবশ্য বিশেষ তত্ত্বের তুলনায় অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম গণিত ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব প্রকাশ করার বেশ কয়েক বছর আগে, ১৯০৭ সালে, তিনি সহভেদের সাধারণ নীতি উপস্থাপন করেন। এজন্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে-বিষয়টি তিনি উদ্ভাবন করেন তা হল—কোনো ক্ষুদ্র এলাকায়, যেখানে মহাকর্ষ বল অপরিবর্তী বলে ধরা যেতে পারে; সব বস্তুই সমানভাবে ত্বরান্বিত হবে। ফলে পরস্পরের তুলনায় এদের মধ্যে কোনো ত্বরণ থাকবে না। এটি আসলে গ্যালিলিওর আবিষ্কারের সাধারণীকৃত রূপ। গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রভাবে সবরকম বস্তুই সমান ত্বরণ লাভ করে। অন্যদিকে আইনস্টাইনের সাধারণীকৃত সমতুল্যতার নীতি অনুসারে সুষম মহাকর্ষক্ষেত্রের প্রভাবে বস্তুর যে গতি এবং আনুষঙ্গিক ত্বরণপ্রাপ্ত কোনো প্রসঙ্গকাঠামোতে বস্তুর যে গতি, তা অভিন্ন। এই সমভেদের নীতির গুরুত্ব আমরা দেখব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। শুধু বস্তুর যান্ত্রিক গতির মধ্যে এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকেনি। আলোর গতিও প্রভাবিত হয়েছে এর ফলে। এবং সময়ের ধারণাকে আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের তুলনায়ও, অনেক বেশি গভীরভাবে বদলে দিয়েছে।

আমরা মহাকর্ষবলের প্রভাবে আছি অথবা একটি ত্বরান্বিত গতির মধ্যে, তা নির্ধারণ করা যে সম্ভব নয়, সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য আইনস্টাইন একটি মুক্তভাবে পতনশীল লিফ্‌টের দৃষ্টান্ত নেন। এই লিফ্‌টের মধ্যে থেকে যদি আমরা কোনো পরীক্ষা পরিচালনা করি, তাহলে এর ভিতরের কোনো বস্তুর ওপরে মহাকর্ষবল যে কাজ করছে তা নিরূপণের কোনো উপায় নেই। সবকিছুই এর মধ্যে ওজনহীন মনে হবে। কোনো বস্তুকে নিক্ষেপ করলে তা সরলরেখায় চলবে, অধিবৃত্তাকার পথে না চলে, যেমনটি ঘটে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তুর বেলায়। আসলে এ-

ধরনের পরীক্ষা এখন বাস্তবে করা হয়েছে, মুক্তভাবে পতনশীল লিফটে নয়, মহাশূন্য যানে। আইনস্টাইন এ থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যেখানে সুষম মহাকর্ষবল কাজ করছে সেখানে এমন স্থান-কালের কাঠামোর কথা ভাবতে পারি, যা মহাকর্ষকে প্রতিস্থাপিত করবে এবং মহাকর্ষ বলে কিছু থাকবে না।

বাস্তবক্ষেত্রে মহাকর্ষক্ষেত্র সুষম না হতে পারে। যেমন পৃথিবীর অভিকর্ষ ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে গেলে কমতে থাকে। আইনস্টাইন এজন্য তাঁর সমতাভেদের স্বতঃসিদ্ধকে এইভাবে বদলালেন : স্থান-কালের যে-কোনো বিন্দুতে এমন প্রসঙ্গকাঠামো সবসময়ই নির্বাচন করা যায়, যেখানে মহাকর্ষবলের প্রভাব থাকবে না, যদি আমরা যথেষ্ট ক্ষুদ্র এলাকাকে শুধু বিবেচনায় আনি, যার মধ্যে মহাকর্ষবলের স্থানিক ও কালিক তারতম্য এত সামান্য যে তা উপেক্ষা করা যায়।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের ওপরে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রবন্ধে আইনস্টাইন সমতার নীতি ও সহভেদের সাধারণ নীতি একত্রে প্রয়োগ করেন স্থান-কালের জ্যামিতিতে, যেখানে জার্মান গণিতবেত্তা রাইম্যানের ১৮৫৪ সালে আবিষ্কৃত অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ব্যবহৃত হয়। আইনস্টাইন এখানে দুটো নীতিকে ভিত্তি করে অগ্রসর হন। মহাকর্ষের প্রভাবকে যথাসম্ভব সহজভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেইসঙ্গে সবধরনের পর্যবেক্ষকের সবরকম গতির জন্য একই গাণিতিক রূপ অর্থাৎ সহভেদ থাকতে হবে সমীকরণে।

আপেক্ষিকতার এই সাধারণ তত্ত্বে আর-একটি অতিরিক্ত শর্ত অন্তর্ভুক্ত হয়। তা হল আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের আঞ্চলিক বৈধতা। অর্থাৎ যেখানে মহাকর্ষবল খুব দুর্বল। ফলে প্রান্তিকভাবে উপেক্ষণীয়, সেখানে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে।

আলোর গতি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে অপরিবর্তী হলেও আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে ধ্রুব নয়। কারণ আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব কাজ করে বস্তুহীন শূন্যতার মধ্যে, যেখানে পর্যবেক্ষণ-কাঠামোগুলোর মধ্যে কোনো ত্বরণ নেই। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে বস্তুর প্রভাব স্থান-কালের কাঠামোকে বদলে দেয় বলে আলোর গতি ধ্রুব থাকে না। কিন্তু একটি যোগসূত্র দুই তত্ত্বেই কাজ করে। মিন্‌কোস্কি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে তাঁর গাণিতিক চারমাত্রিক স্থান-কালে উপস্থাপন করতে গিয়ে আলোর গতিপথকে সংক্ষিপ্ততম জগৎ-রেখারূপে দেখিয়েছেন। মিন্‌কোস্কির চারমাত্রিক অধিস্থান (Hyper space)-এ দুটো ঘটনার স্থানিক ব্যবধান ও কালিক ব্যবধানকে যদি বিশেষভাবে একত্রে হিসাব করা যায়, তাহলে লব্ধ স্থান-কালিক ব্যবধান সুষম গতিতে চলা সব পর্যবেক্ষকের জন্যেই অভিন্ন হয়। স্থানকালের এই চারমাত্রিক জগতে ঘটনা হল জগৎ-বিন্দু এবং একজন পর্যবেক্ষকের দেখা সমস্ত ঘটনামালা মিলে সৃষ্টি হয় জগৎ-রেখা।

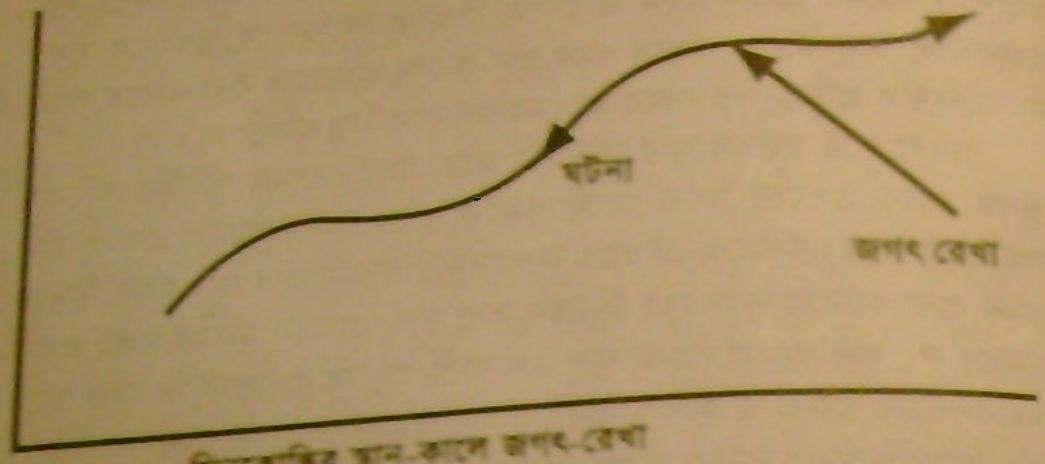

মিনকোস্কির স্থান-কালে জগৎ-রেখা

দুই ঘটনার মধ্যে অর্থাৎ দুই জগৎ-বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব হিসাব করা হয় এমনভাবে যে এই দূরত্বের বর্গ হল স্থানিক ব্যবধানের বর্গের ও কালিক ব্যবধানের বর্গের অন্তর। স্থান ও সময় পরিমাপের একক এখানে এমনভাবে নেয়া হয় যে আলোর গতি দাঁড়ায় এক। মিনকোস্কির স্থান-কালে সুষম গতিতে চলা কোনো পর্যবেক্ষক বা বস্তুকে বুঝানো হয় সরলরেখার দ্বারা। মিনকোস্কির জ্যামিতির একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব হল আলোর পথের বেলায় জগৎ-রেখার দূরত্ব হল শূন্য দৈর্ঘ্যের। সাধারণ জ্যামিতিতে কোনো রেখার দূরত্বই শূন্য হয় না।

আমরা দেখব, মিনকোস্কির প্রদত্ত স্থান-কালের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বুঝতে গভীরভাবে সাহায্য করেছে। অবশ্য মিনকোস্কির যে ছবি, যেমন স্থান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এবং সময় এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নিছক ছায়ায় অবলুপ্ত, সমস্ত অবজেক্টিভ মহাবিশ্বে, এবং স্থান-কালের ধরনের সমন্বিত রূপই একমাত্র বাস্তবতা প্রাপ্ত তা কিছুটা অতি উৎসাহের অভিব্যক্তিরূপে মনে হতে পারে।

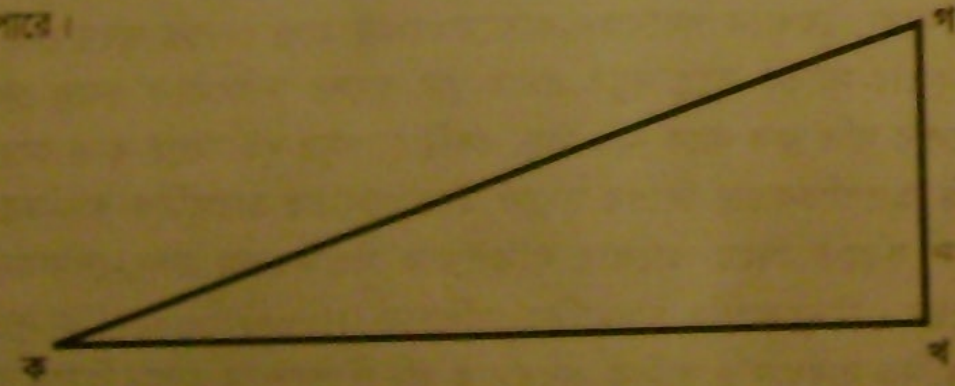

মিনকোস্কির জ্যামিতিতে ক খ হচ্ছে সময়ের ব্যবধান, খ গ হচ্ছে স্থানিক ব্যবধান, দুই ঘটনার মধ্যে। ক গ স্থান-কালের ব্যবধানের বর্গ।

$(কগ)^2 = (কখ)^2 - (খগ)^2$। এখানে আলোর গতি হচ্ছে এক।

কোনো বল প্রযুক্ত না হলে একটি মুক্তবস্তুর চলার পথ মিনকোস্কির স্থান-কালের জ্যামিতিতে যে জগৎ-রেখা সৃষ্টি করে তা সরল। এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে সরলরেখাই হচ্ছে দুই বিন্দুর মধ্যে সংযোগকারী সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে বস্তুর মহাকর্ষজনিত প্রভাবকে স্থান-কালের জ্যামিতির বক্রতা সৃষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাইম্যানের অক্ষজ্যামিতির সাহায্য নিলেন। রাইম্যানের জ্যামিতির স্থান-কালের বক্রতায় মহাকর্ষবলের প্রভাব যেহেতু অন্তর্ভুক্ত, কোনো বস্তুর গতি এখানে অবাধ বা মুক্ত। অর্থাৎ আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে জগৎ-রেখা যেমন সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল, আইনস্টাইনের প্রস্তাবনা হল, রাইম্যানের স্থান-কালে এই বস্তুর গতিপথও তেমনি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু বক্র স্থান-কালের জ্যামিতিতে দুই বিন্দুর মধ্যে সংযোগকারী সংক্ষিপ্ততম পথ সরলরেখা নয়, জিওডেসিক।

ব্যাপারটি বোঝার জন্য দুইমাত্রিক বক্র তল, যেমন একটি গোলকের পৃষ্ঠদেশের কথা ভাবতে পারি। এখানে গোলকপৃষ্ঠের ওপরে অবস্থিত দুটো বিন্দুর মধ্যে সংযোগ-সৃষ্টিকারী সবচেয়ে ক্ষুদ্র রেখা হচ্ছে এই দুই বিন্দুর ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত মহাবৃত্তের চাপ, যা এই দুই বিন্দুকে সংযুক্ত করে। সুতরাং আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে মিনকোস্কির ঋজু স্থান-কালের জ্যামিতি রূপ নিচ্ছে রাইম্যানের বক্র স্থান-কালের জ্যামিতিতে। এবং এই বক্রতা নির্ধারণ করছে বস্তুর উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট মহাকর্ষবল। এই বক্র স্থান-কালের চারমাত্রিক জগতে বস্তুর গতিপথ বলমুক্ত এবং তা সংক্ষিপ্ততম রেখায় চলতে গিয়ে জিওডেসিক সৃষ্টি করছে, যা সাধারণ জ্যামিতির সরলরেখার প্রতিরূপ।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে সমতার নীতি ও সহভেদের নীতি প্রয়োগ করে আইনস্টাইন বস্তুকণিকার গতিপথ শুধু নয়, আলো অর্থাৎ বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গের গতিপথ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেন, মহাকর্ষক্ষেত্রে। এজন্য তিনি ব্যবহার করলেন তাঁর বিখ্যাত ক্ষেত্র-সমীকরণগুলো।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের সম্পর্কটা এইখানে যে, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে যেমন পরস্পরের সাথে সুষম গতিতে চলা পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যেখানে কোনো পার্থক্যযোগ্যতা নেই, আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে সেখানে পরস্পরের সঙ্গে ত্বরণপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকের মধ্যেও তেমনি কোনো পার্থক্যযোগ্যতা নেই। আইনস্টাইনের প্রস্তাবিত এই স্বীকার্য গাণিতিক রূপ নিয়েছে তার ক্ষেত্র-সমীকরণের সহভেদে। মহাকর্ষবলের প্রভাবকে স্থান-কালের জ্যামিতির মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়ে এই কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছেন।

রাইম্যানের চক্র স্থান-কালের জ্যামিতিতে জিওডেসিক যে মিনকোস্কির ঋজু স্থান-কালের জ্যামিতির সরলরেখার প্রতিরূপ, এবং উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তবস্তুর গতিপথ সংক্ষিপ্ততম হতে গিয়েই যে আনুষঙ্গিক জগৎ-রেখা সৃষ্টি করে—এসবই দুই তত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম মিল তুলে ধরে। আইনস্টাইনের গভীর উদ্ভাবনী দৃষ্টি এই

অন্তর্মিল সৃষ্টি করেছে। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে আইনস্টাইনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম উদ্ভাবন হল মহাকর্ষবল ও ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন। এই দুইয়ের মধ্যে একটি আপাত-সম্পর্ক আগেও জানা ছিল। কিন্তু আইনস্টাইনের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ এইখানে যে মহাকর্ষ ও ত্বরণের মধ্যেকার আপাত-সম্পর্ককে তিনি স্বতঃসিদ্ধরূপে উপস্থিত করেছেন। নিউটনের মহাকর্ষতত্ত্ব ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের মধ্যে যে পার্থক্য তা বস্তুর গতিপথ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে থাকলেও ততটা গভীর নয়—যেমনটি আমরা লক্ষ্য করব আলোর গতিপথ ও সময়ের পরিবর্তনে।

সমতার নীতির পরীক্ষা

মহাকর্ষ ও আনুষঙ্গিক ত্বরান্বিত গতির মধ্যে যে পার্থক্যযোগ্যতা নেই তার গভীরতম প্রমাণ মেলে আলোর ওপরে এদের প্রভাব থেকে। ধরা যাক ত্বরণপ্রাপ্ত একটি মহাকাশযানের শীর্ষে একটি উৎস থেকে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে। মহাকাশযানের নিচপ্রান্তে একটি বিশোষক এই আলো শোষণ করে নিচ্ছে। ত্বরণের কারণে উৎস ও বিশোষকের মধ্যে একটি আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি হবে। কারণ উৎস থেকে যে-মুহূর্তে আলো বিকীর্ণ হবে তখন আকাশযানের যে গতি থাকবে, এবং যে মুহূর্তে বিশোষক আলো শোষণ করে নেবে তখন এর যে গতি থাকবে, তা এক নয়। ডপ্‌লার ক্রিয়ার ফলে বিশোষকে পৌছার সময় আলোর কম্পনহার কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। উৎস ও গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকলে বিকীর্ণ তরঙ্গের কম্পনহারের যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাই হল ডপ্‌লার ক্রিয়া। যেমন, কোনো ট্রেন যদি স্টেশনের দিকে আসার সময় হুইসেল বাজাতে থাকে, এই হুইসেলের শব্দ স্টেশনে বসে থাকা যাত্রীর কাছে ট্রেনের যাত্রীর তুলনায় মিহি অর্থাৎ বেশি কম্পনহারের মনে হয়।

মহাকর্ষ ও ত্বরণের মধ্যে সমতুল্যতার নীতি অনুসারে যেখানে মহাকর্ষক্ষেত্র কাজ করছে, সেখানেও আলোর তরঙ্গের কম্পনহার বৃদ্ধি পাবার কথা। ১৯৬০ সালে এ-ধরনের একটি পরীক্ষা আর ভি পাউন্ড ও জি-এ রেবকা পরিচালনা করেছেন। তাঁরা একটি আলোর উৎসকে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬ ফুট উঁচু একটি দালানের শীর্ষে এবং বিকিরণ বিশোষক একটি যন্ত্র অর্থাৎ রিসিভার এর নিচতলায় স্থান করেন। এই দুই অবস্থানের মধ্যে মহাকর্ষবলের সামান্য পার্থক্য এদের স্থান-কালের জ্যামিতিকেও কিছুটা পৃথকরূপ দেবে। মহাকর্ষের প্রভাবকে স্থান-কালের রূপবিকৃতি হিসাবে দেখার ফলে শুধু বস্তুকণিকা নয়, আলোও প্রভাবিত হবে মহাকর্ষের দ্বারা।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের হিসাব অনুসারে আলোর তরঙ্গের কম্পনহারের যে পার্থক্য হবার কথা দালানের শীর্ষে ও নিচতলায়, তা হল ২.৩×১০^{-১৫}

ভগ্নাংশ। অর্থাৎ উপরতালায় স্থাপিত পরমাণুর কম্পনহারের তুলনায় নিচের তলায় স্থাপিত পরমাণুর কম্পন প্রতি একশো কোটিতে ২৩ বার কম হবার কথা। রেবকা এবং পাউন্ড তাঁদের পরীক্ষায় যে পার্থক্য পেলেন তা ছিল ২.৪×১০^{-১৫} ভগ্নাংশ। এই অতিসূক্ষ্ম পরীক্ষাটি তাঁরা করতে সক্ষম হয়েছিলেন মোস্‌বিয়ার ক্রিয়া ব্যবহার করে।

মোস্‌বিয়ার ক্রিয়ায় দেখা যায়, কেলাসের মধ্যে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত গামারশ্মি অনুরূপ বাইরের একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস অনুনাদী প্রক্রিয়ায় বিশোষণ করে নিতে পারে না। এর কারণ, গামারশ্মি বিকীর্ণ হবার সময় এর কিছুটা শক্তিহ্রাস ঘটে, বিকিরণকারী অণুর প্রতিক্ষেপের ভিতর দিয়ে। এই শক্তিহ্রাস এবং আনুষঙ্গিক কম্পনহারের পরিবর্তন অতি সমান্য। বিকিরণকারী পরমাণু যতবড় কেলাসের মধ্যে অবস্থান করে, এর প্রতিক্ষেপ তত কম এবং বিকীর্ণ গামারশ্মির কম্পনহারের পরিবর্তন তত সামান্য।

প্রতিক্ষেপের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মোস্‌বিয়ার ক্রিয়ায়। একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চাই এখানে। ধরা যাক, একটি ছেলে জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফ দিচ্ছে। যে গতিতে ছেলেটি সমুদ্রে গিয়ে পড়বে তা তার ব্যবহৃত পেশীয় শক্তির সবটা নয়। কারণ সে লাফ দিয়ে সামনের দিকে যাবার সময় জাহাজটি সামান্য উল্টোদিকে সরে যাবে। এখানে ভরবেগের নিত্যতার নীতি কাজ করবে। জাহাজটি যদি খুব বড় হয়, তা হলে তা প্রায় নড়বেই না। ফলে ছেলেটির পেশীয় শক্তির সবটাই রূপান্তরিত হবে গতিশক্তিতে। কিন্তু জাহাজের পরিবর্তে যদি হালকা ডিঙি নৌকা থেকে ছেলেটি লাফ দেয়, ডিঙিনৌকাটি বেশকিছুটা ভরবেগ নিয়ে পেছনদিকে সরে যাবে। ছেলেটির ঝাঁপ দেয়ার শক্তি অনেকটা নৌকা নিয়ে নেবে। একেই আমরা বলছি প্রতিক্ষেপের শক্তি।

মোস্‌বিয়ার ক্রিয়ায় অনুনাদী বিশোষণকে সম্ভব করার জন্য বিকিরণকারী পরমাণুকে অর্থাৎ এর কেলাসকে সামান্য গতি দেয়া হয়। যেমন, সেকেন্ডে কয়েক মিলিমিটার। এর ফলে বিকিরণকারী পরমাণু ও বিশোষণকারী পরমাণুর মধ্যে সামান্য আপেক্ষিক গতির সৃষ্টি হয়। এতে বিশোষণকারী পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কাছে বিকীর্ণ গামারশ্মির কম্পনহার ডপ্‌লার ক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধি পায়। অনুনাদী প্রক্রিয়ায় গামারশ্মি তখন বিশোষিত হয়। ডপ্‌লার ক্রিয়া হচ্ছে উৎস ও গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যে আপেক্ষিক গতির ফলে গৃহীত কম্পনহারের পরিবর্তন। যেমন, স্টেশনের দিকে অগ্রসরমান ট্রেনের হুইসেলের শব্দতরঙ্গের কম্পনহার স্টেশনের যাত্রীদের কাছে কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং হুইসেলের শব্দ তীক্ষ্ণতর মনে হয়। এর বিপরীতটি ঘটে যখন ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে চলে যায়।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের হিসাবে বিকিরণের কম্পনহারের অতি সামান্য পরিবর্তন ও মোস্‌বিয়ার ক্রিয়ার সাহায্যে পরিমাপ করা এইভাবে সম্ভব হয়।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করার তিনটি পরীক্ষামূলক ধারণা আইনস্টাইন প্রস্তাব করেন। বস্তুর প্রভাবে স্থান-কালের জ্যামিতির দুমড়ে যাওয়া এবং সময়ের এই পরিবর্তনের ফলে আলোর কম্পনহারের পরিবর্তন ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী।

পরমাণুর কম্পনকে যদি সময়-পরিমাপের সূক্ষ্ম ঘড়ি বলে মনে করি, তাহলে উপরের পরীক্ষামূলক ফল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে মহাকর্ষ-সময়কে সরাসরি প্রভাবিত করে এবং ঘড়িকে মন্থর করে দেয়। কিন্তু মহাকর্ষবলের প্রভাব ও ত্বরণের প্রভাব যে সময়ের ওপরে অভিন্ন সেটা আমরা দেখতে পারি আর-একটি পরীক্ষা থেকে।

মনে করা যাক, একটি চক্রাকার নাগরদোলার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি এবং এর পরিধির প্রান্তে একটি ঘড়ি স্থাপন করা আছে। নাগরদোলাটি ঘুরলে পরিধির ওপরে রাখা ঘড়িটি ত্বরণ লাভ করবে, কেন্দ্রের ঘড়িটি তা করবে না। কিন্তু দুটো ঘড়ির কোনোটিই পরস্পরের তুলনায় কোনো গতি পাচ্ছে না, কারণ এরা দৃঢ় ফ্রেমের উপরে আটকানো। দেখা যাবে ত্বরণের কারণে, পরিধির উপরে রাখা ঘড়িটি কেন্দ্রের ঘড়ির তুলনায় কিছুটা মন্থরগতিতে চলছে। যদি নাগরদোলাটি দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকে, দুটো ঘড়ির মধ্যে সময়ের পার্থক্য বাড়বে। সময়ের ওপরে ত্বরণ ও মহাকর্ষের প্রভাব তাহলে অভিন্ন।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের অন্য দুই পরীক্ষামূলক সমর্থনের মধ্যে রয়েছে বুধগ্রহের কক্ষপথের সামান্য পরিবর্তন এবং সূর্যের কাছ দিয়ে আসার সময় নক্ষত্রে আলোর সামান্য বেঁকে যাওয়া। এই বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ অবশ্য খুব কম, মাত্র ৪.৭×১০^{-৪} ডিগ্রি। ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণের সময় একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই পর্যবেক্ষণটি করা হয়। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের আলো স্তিমিত থাকে বলে এর পাশ দিয়ে আসা নক্ষত্রের আলোর আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হয়। এই নক্ষত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় সূর্যের অবস্থান যখন অন্য জায়গাতে ছিল। নক্ষত্রের অবস্থান হিসাব করে আলোর বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এটাই ছিল আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের পক্ষে প্রথম পরীক্ষামূলক সমর্থন।

নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহদের কক্ষপথ সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা উপস্থিতি করে। কিন্তু এর ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা যায়, সৌরজগতে সবচেয়ে ভিতরের গ্রহ বুধ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চলার সময় এর অনুসূর স্থির নক্ষত্রদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অগ্রসর হয়। এর কারণ, সূর্য ও বুধ গ্রহের মধ্যে পারস্পরিক মহাকর্ষ-ক্রিয়া। স্বভাবতই সূর্যের উপরে বুধগ্রহের মহাকর্ষ-প্রভাব অতি সামান্য, সূর্যের তুলনায় এর ভর কম বলে। প্রতি শতাব্দীতে বুধগ্রহের অনুসূরের অগ্রগতি, নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে হবার কথা আর্কের ৫০০ সেকেন্ড। কিন্তু পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলের সঙ্গে এর ব্যবধান দেখা গেল ৪৩ সেকেন্ড।

এই পার্থক্য সামান্য হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের হিসাব ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে এত নিশ্চিত ছিলেন যে বিচ্যুতিকে তত্ত্বগত ত্রুটি হিসাবে গণ্য করতে বাধ্য হন। আইনস্টাইন তাঁর ১৯১৫ সালে প্রকাশিত আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে যে হিসাব দেখালেন তাতে নিউটনের তত্ত্বের তুলনায় প্রতি শতাব্দীতে ৪৩ সেকেন্ড বেশি অগ্রসর হবার কথা, বুধের অনুসূরের। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আইনস্টাইনের তত্ত্বের হিসাব মিলে গেল।

সময়ের ওপরে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের প্রভাব যে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের তুলনায়ও অনেক বেশি গভীর ও সুদূরপ্রসারী তা আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই নানা ঘটনার ব্যাখ্যায়, এবং আপেক্ষিকতার দুই তত্ত্বে কাল-প্রসারণের তাৎপর্য বিশ্লেষণে।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব ও কাল-প্রসারণ

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে কাল-প্রসারণ বলতে যা বুঝায় তা আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে ব্যাখ্যাত কাল-প্রসারণ থেকে ভিন্ন এবং গভীরতররূপে তাৎপর্যপূর্ণ। এই পার্থক্য যথার্থভাবে অবধারণ করতে না পারলে নানা বিভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, যেমনটি ঘটেছে কিছু বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিকের বেলাতেও।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে কাল-প্রসারণ নিয়ে উদ্ভূত বিভ্রান্তির একটি ভালো দৃষ্টান্ত হল : দুই যমজ ভাইয়ের বয়স বিভ্রাট। সমস্যাটি নিম্নরূপ :

ধরা যাক রঞ্জু ও মঞ্জু দুই যমজ ভাই। এদের বয়স যখন বিশ বছর তখন রঞ্জু রকেটে করে মহাকাশে যাত্রা করল অন্য এক নক্ষত্রের গ্রহে। মঞ্জু তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় জানাল। মনে করা যাক, গ্রহটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে ২৫ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ সেখানে আলো পৌঁছতে সময় লাগে ২৫ বছর। ধরা যাক, রঞ্জুর রকেটের গতি আলোর গতির কাছাকাছি = ০.৯৯৯৮ C। অর্থাৎ আলোর গতির ৯৯.৯৮ শতাংশ। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে মঞ্জুর কাছে মনে হবে রঞ্জুর ঘড়ি ধীরগতিতে চলছে। মঞ্জুর নিজের ঘড়িতে যখন ২৫ বছর অতিবাহিত হবে, মঞ্জুর হিসাবে মনে হবে রঞ্জুর সময় কেটেছে

$$২৫ \times \sqrt{(১ - ০.৯৯৯৮)^2} = ২৫ \times ০.০২ = ০.৫ \text{ বছর}।$$

ফেরার সময় রঞ্জুর রকেট যদি একই গতিতে চলে, তাহলে পৃথিবীতে আসতে তার সময় যাবে আরো ০.৫ বছর। অর্থাৎ মঞ্জুর হিসাবে রঞ্জুর বয়স বাড়বে ১ বছর। কিন্তু তার নিজের বয়স বাড়বে (২৫ + ২৫) = ৫০ বছর। মঞ্জুর হিসাব অনুসারে রঞ্জুর যখন দেখা হবে মহাকাশ-অভিযানের পর, তখন রঞ্জুর বয়স হবে (২০ + ১) = ২১ বছর, এবং মঞ্জুর বয়স হবে ২০ + ৫০ = ৭০ বছর। কিন্তু রঞ্জু যদি মনে করে সে স্থির আছে এবং মঞ্জু তার সঙ্গে আপেক্ষিক গতিতে ছুটছে, তাহলে সম্পূর্ণ

হিসাবটা উল্টে যাবে। রঞ্জুর এরকম ভাবার কারণ, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে পরম গতি বলে কিছু নেই। ফলে মঞ্জুর পরিপ্রেক্ষিতে রঞ্জুর গতিলাভ যেমন সত্য, রঞ্জুর পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্জুর গতিও কি একই কথা নয়? তাই যদি হয়, রঞ্জুর কাছে মনে হবে মঞ্জু যেন তার কাছ থেকে আলোর ৯৯.৯৮ শতাংশ গতিতে ছুটে ২৫ আলোকবর্ষ দূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। সুতরাং মঞ্জুর বয়স হবার কথা ২১ বছর এবং রঞ্জুর বয়স ৭০ বছর। তাহলে কি করা হিসাব ভুল? আসলে এ-ধরনের সমস্যা ও স্ববিরোধিতা সৃষ্টির মূলে রয়েছে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের ভুল প্রয়োগ এবং সাধারণভাবে এটা মনে করা যে সব গতিই আপেক্ষিক। বস্তুত আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব শুধু সেইসব প্রসঙ্গকাঠামোর বেলায় প্রযোজ্য যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে অপরিবর্তী গতিতে ছুটছে।

রঞ্জুর প্রায় আলোর গতিতে ২৫ আলোকবর্ষ দূরের গ্রহে যাওয়া এবং ফিরে আসার কাল্পনিক ঘটনায় অপরিবর্তী গতির শর্ত পালিত নয়। কারণ, রঞ্জুর রকেটকে ৯৯.৯৮ শতাংশ আলোর গতি পেতে একবার ত্বরান্বিত হতে হবে, এবং

গতি পরিবর্তন করে ফিরে আসতে আর-একবার বিপরীত ত্বরণ লাভ করতে হবে। আমরা জানি আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব অনুসারে ত্বরণ ও মহাকর্ষের মধ্যে সমতার নীতি কাজ করে। রঞ্জু তার অভিযানে দুইবার ত্বরণ লাভ করার সময় মহাকর্ষবল অনুভব করবে। এর ফলে তার ঘড়ি সত্যিকার অর্থেই মন্থরিত হবে। পৃথিবীতে অবস্থানকারী মঞ্জুর প্রসঙ্গকাঠামো এবং রকেটযাত্রী রঞ্জুর প্রসঙ্গকাঠামোকে জড়ব্যবস্থার মধ্যে ফেলা যায় না।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে আমরা দেখেছি, জড়ব্যবস্থার অন্তর্গত অর্থাৎ যেসব প্রসঙ্গকাঠামো পরস্পরের তুলনায় অপরিবর্তী গতিতে ছোট, তাদের মধ্যে কোনোটিই অন্যটির তুলনায় সুবিধাপ্রাপ্ত নয়। কোনো পরীক্ষা চালিয়েই একটি প্রসঙ্গকাঠামোকে অন্যটির তুলনায় ভিন্ন বলে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু এখানে উল্লিখিত রঞ্জুর প্রসঙ্গকাঠামো ও মঞ্জুর প্রসঙ্গকাঠামো পরস্পর বিনিময়ে নয়, অর্থাৎ ব্যতিহার্য নয়। রঞ্জু তার রকেটের ভেতরে বসে অবশ্যই পরীক্ষা করে জানতে পারবে, সে কখন ত্বরান্বিত হচ্ছে। যেমন; টেবিল থেকে তার জিনিসপত্র পড়ে যেতে পারে, তার ঘড়ির দোলক উপরের দিকে উড়ে গিয়ে আর নামতে চাইবে না, সে নিজে ধাক্কা অনুভব করবে তার হৃদস্পন্দন, রক্ত চলাচল সব মন্থরিত হবে, ইত্যাদি। এ সবকিছু সে প্রত্যক্ষ করবে তার রকেটের মধ্যে বসেই। কিন্তু মঞ্জুর বেলায় এমন ঘটবে না।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে যে কাল-প্রসারণ সেটা আপন প্রসঙ্গকাঠামোর মধ্যে থেকে কেউ অনুভব করে না। বরং অন্য একজন পর্যবেক্ষক, যে বাইরে থেকে এর গতি প্রত্যক্ষ করে, তার কাছেই শুধু হিসাবে ধরা পড়ে যে তার সঙ্গে আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন অন্য প্রসঙ্গকাঠামোতে কাল-প্রসারণ ঘটছে। এদিক থেকে বিচার করলে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব যে-অর্থে সময়ের প্রসারণকে আপেক্ষিক বলা যায়, আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে কাল-প্রসারণ সে-অর্থে আপেক্ষিক নয়। কাল-প্রসারণ এখানে অনপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ। বস্তুত আপেক্ষিকতা শব্দটি সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নয়। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে এবং অনেক বিভ্রান্তির উৎস এই শব্দার্থের ভুল ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে। কাল-প্রসারণকারী দ্রুত ভ্রমণের সমস্যা বা Paradox প্রথম উত্থাপন করেন পল ল্যাঞ্জেভিন ১৯১১ সালে। যমজ ভাইয়ের একজনকে মহাশূন্যে ভ্রমণে পাঠানোর কাল্পনিক পরীক্ষা ছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম নাটকীয় আর-একটি কাল্পনিক পরীক্ষার কথাও তিনি বলেন। এক্ষেত্রে মানুষের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় বস্তুর একখণ্ড মহাশূন্যে আলোর তুল্য গতিতে প্রেরণ ও ফিরিয়ে আনা এবং অনুরূপ অন্য তেজস্ক্রিয় বস্তুর খণ্ডকে পৃথিবীতে রাখা হয়। এদের তেজস্ক্রিয় ভাঙনের হারের পার্থক্য থেকেও কাল-প্রসারণের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাবার কথা।

বার্গসন ও লভেদয় ল্যাঞ্জেভিনের কাল্পনিক পরীক্ষার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন। ১৯২৩ সালে বার্গসন তাঁর সমালোচনায় বললেন : যমজ

ভাইয়ের যে পৃথিবীতে থেকে গেল তার পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত যদি ভ্রমণকারী ভাইয়ের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক হয়, তাহলে আপেক্ষিকতার মূল স্বীকার্য লঙ্ঘিত হল। কোনো প্রসঙ্গকাঠামোই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হতে পারে না, এই যুক্তিতে তিনি বললেন : ল্যাঞ্জেভিনের সিদ্ধান্তশেষে আমাদেরকে লরেঞ্জের যান্ত্রিক সিদ্ধান্তের অনুরূপ ব্যাখ্যায় আমাদের নিয়ে যাবে, যেখানে গতির জন্য বস্তুর সত্যিকার কাল-প্রসারণ ও দৈর্ঘ্যহ্রাস ঘটে। তার চাইতেও মারাত্মক হল, পৃথিবীতে অবস্থানকারী যমজ ভাইকে ভ্রমণকারীদের থেকে পৃথক করতে পারার অর্থ হল, সনাতনী আরিস্টোটল ও টলেমির যুগে প্রত্যাবর্তন।

বার্গসন্ ও লভেদয়ের সমালোচনা ছিল আসলে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের পটভূমিতে। তাঁরা এটা খেয়াল করেননি যে, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের প্রয়োগযোগ্যতা শুধু সেইসব প্রসঙ্গকাঠামোতে সীমাবদ্ধ, যেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সুষম গতিতে ছুটে। রঞ্জুর রকেট সুষম গতিতে ছুটলে তা কখনই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না। শুধু আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের আওতায় মহাকালে ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তনের ফলাফল ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আইনস্টাইন ১৯২৮ সালেই এই সমস্যাটি উপলব্ধি করেন এবং বিকুইরেল ও হোইটহেড ব্যাপারটি উপলব্ধি করেন কয়েক বছর পর। মহাকাশে ভ্রমণকারী ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী দুই ভাইয়ের প্রসঙ্গকাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়তা বা ব্যতিহার যে সম্ভব নয় যেমনটি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্বীকার্য— বিষয়টি অনুধাবন করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় অনেক পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের।

আমাদের এখানে লক্ষ্য করতে হবে, যে দুই যমজ ভাইয়ের দৃষ্টান্তে শুধু ভ্রমণকারী ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী প্রসঙ্গকাঠামো এখানে সম্পর্কিত নয়। সমগ্র ব্যাপারটি অনেক বেশি জটিল এই কারণে যে, ভ্রমণকারী ভাই যেখানে একটি ব্যবস্থা, সেখানে অন্য ব্যবস্থাটিতে রয়েছে পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে মহাবিশ্ব। শুধু যদি ভ্রমণকারী ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী—এই ব্যবস্থা থাকত মহাশূন্যের মধ্যে, এবং অন্যকোনো বস্তুর প্রভাব যদি না থাকত তাহলে এই দুই কাঠামোকে পরস্পর বিনিময় বলে গণ্য করা যেত। শুধু মহাশূন্যের মধ্যে এই যাত্রা সংঘটিত হলেই চলবে না, আর-একটি অতিরিক্ত শর্ত এখানে কাজ করতে হবে যে— রকেটের যে ভর ও পৃথিবীর যে ভর, তা সমান হতে হবে। তা না হলে, রকেট যখন গতি পরিবর্তন করবে তখন মহাকর্ষবলের প্রভাব দুই প্রসঙ্গকাঠামোর ওপরে পড়বে ভিন্নভাবে, এদের ভরের পার্থক্যের জন্য। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের যে প্রভাব সময়ের ওপরে তা আরো নাটকীয় ও গভীরভাবে আমরা লক্ষ্য করব, কৃষ্ণবিবর ও সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায়।

কৃষ্ণবিবর ও সময়

সময়ের প্রচলিত ধারণাকে সবচেয়ে নাটকীয় ও বিস্ময়কররূপে বদলে দিয়েছে কৃষ্ণবিবরের বৈশিষ্ট্য, যা আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের ফসল। সময়ের ধারণাকে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব কীভাবে বদলে দিয়েছে তা আগেও আলোচিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই সময়ের ধারণায় কৃষ্ণবিবরের চরম প্রভাব আমরা বিশ্লেষণ করব। এজন্য আপেক্ষিকতার দুই তত্ত্বে স্থান ও কাল কীভাবে সমন্বিত হয়েছে? ফলে সময়ের নিউটনীয় বৈশিষ্ট্য যথা নিষ্ক্রিয়তা, অবিচলতা, নিরবচ্ছিন্নতা ও অসীমতা হারিয়েছে, তা পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে।

আমরা দেখেছি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্থান ও কাল একীভূত হয়ে এক চারমাত্রিক স্থান-কাল সন্ততিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। নিউটনীয় স্থান ও কালের ধারণায় বস্তু, ঘটনা, পর্যবেক্ষকের গতি—কোনোকিছুই স্থান বা কালের ওপরে প্রভাব রাখে না। স্থান ও কাল এখানে পরস্পরের নিরপেক্ষ, এবং উভয়েই ঘটনা ও পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ। সমস্ত ঘটনা অবিচল, অনড় ও অসীম স্থানের ব্যাপ্তির মধ্যে ঘটে। কালের প্রবাহও তেমনি নিরবচ্ছিন্ন, নিরপেক্ষ ও প্রান্তহীন। সমগ্র বিশ্বজুড়ে অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন এক কালের প্রবাহ চলছে। ফলে কোনো কালিক মুহূর্ত বা কালিক ব্যবধান প্রতিটি স্থানিক বিন্দু এবং পর্যবেক্ষকের জন্য অভিন্ন। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্থান ও কাল সমন্বিত হয়ে যে চারমাত্রিক জগৎ সৃষ্টি করে, সেখানে পর্যবেক্ষকের গতি-নিরপেক্ষভাবে যা পরম বা অপরিবর্তী, তা হল ঘটনা। তিনমাত্রিক ইউক্লিডীয় জ্যামিতি এবং সেই অর্থে নিউটনের অবিচল স্থানে প্রতিটি স্থানিক বিন্দু যা, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের চারমাত্রিক জগতে প্রতিটি ঘটনা তাই। ফলে ইউক্লিডের তিনমাত্রিক অবক্র স্থানের সঙ্গে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের চারমাত্রিক স্থান-কালের, অর্থাৎ ঘটনা জগতের মিলটি এখানে লক্ষণীয়।

ইউক্লিডের সমতল অর্থাৎ অবক্র তিনমাত্রিক স্থানের মধ্যে অবস্থিত কোনো বিন্দু বা দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব নির্ধারণ করতে ভিন্ন-ভিন্ন প্রসঙ্গকাঠামো ব্যবহৃত হতে পারে। সেইসঙ্গে স্থানাঙ্কগুলোর মানও। কিন্তু কোনো বিন্দুর অবস্থান বা দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব নির্বাচিত প্রসঙ্গকাঠামো নিরপেক্ষ থেকে যায়। যেমন কোনো বিন্দু P_1-এর অবস্থান যদি X, Y, Z প্রসঙ্গ কাঠামোতে x'_1, y'_1, z'_1 হয়, সেই

একই বিন্দু অন্য একটি প্রসঙ্গ কাঠামো $X'Y'Z'$-এর পরিপ্রেক্ষিতে হবে x'_1, y'_1, z'_1 একইভাবে অন্য একটি বিন্দু P_2 -এর স্থানাঙ্ক এই দুই প্রসঙ্গকাঠামোতে হবে যথাক্রমে x_2, y_2, z_2 এবং x'_2, y'_2, z'_2। কিন্তু P_1 ও P_2 বিন্দুর অবস্থান এবং এদের মধ্যে দূরত্ব এই প্রসঙ্গ কাঠামো পরিবর্তনের কারণে বদলে যাবে না। শুধু XYZ ও $Y'X'Z'$ এই তিনটি প্রসঙ্গ অক্ষ থেকে মাপা P_1 ও P_2 বিন্দুর দূরত্ব যথা অবস্থান বদলে যেতে পারে।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্থানিক বিন্দুর পরিবর্তে ঘটনাকে পরম বিন্দু বলে বিবেচনা করা হয়। এখানে একটি ঘটনাকে নির্দেশ করার জন্যে যে তিনটি স্থানিক অবস্থানাঙ্ক ও একটি কালিক অবস্থানাঙ্ক অর্থাৎ চারটি অবস্থানাঙ্ক ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়, তারা একত্রে চারমাত্রিক জগৎকে নির্ধারণ করে। পর্যবেক্ষকের গতির ওপরে নির্ভর করে কোনো ঘটনার স্থানাঙ্ক ও কালাঙ্ক বদলে যেতে পারে—যেমনটি তিনমাত্রিক ইউক্লিডের জগতে প্রসঙ্গকাঠামো ঘুরাবার ফলে তিনটি স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে ঘটে। কিন্তু স্থানাঙ্ক ও কালাঙ্ক বিভিন্ন গতির পর্যবেক্ষকের জন্য ভিন্ন হলেও যে-ঘটনাকে এরা নির্দেশ করে তা অপরিবর্তিত থাকবে চারমাত্রিক স্থান-কালের সন্ততিতে। অর্থাৎ পর্যবেক্ষকের চারমাত্রিক প্রসঙ্গকাঠামোর গতির ওপরে নির্ভর করবে। এর ফলে স্থানিক দৈর্ঘ্যের সংকোচন ও কালিক ব্যবধানের প্রসারণ ঘটবে। কিন্তু কোনো ঘটনাকে এই চারমাত্রিক জগতে অবস্থানাঙ্কের দ্বারা চিহ্নিত করলে যেসব বিন্দু পাওয়া যাবে তা ইউক্লিডের জ্যামিতিক বিন্দুর মতোই অপরিবর্তনীয় বা নিত্য।

ঘটনার বিন্দুসমূহকে সাজিয়ে আমরা যে-জগৎ পাই, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে তা অবক্র বা সমতল। লক্ষণীয়, দুইমাত্রিক জগতে একটি টেবিলের উপরিতল যে-অর্থে সমতল কিন্তু ফুটবলের পৃষ্ঠদেশ সমতল নয়, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্থান-কালের চারমাত্রিক জগৎ সেই অর্থে সমতল বা অবক্র। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের স্থান-কালের চারমাত্রিক জগৎ কী-অর্থে ভিন্ন তা অনুধাবনের জন্যেই ইউক্লিডের জ্যামিতি ও আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের চারমাত্রিক জগতের সাদৃশ্যটি উপরে তুলে ধরা হয়েছে।

লক্ষ্য করার যে-আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে পর্যবেক্ষকের প্রসঙ্গকাঠামোর গতি থাকলেও সেই গতি সুষম। এখানে কোনো ত্বরণ অর্থাৎ গতির পরিবর্তন নেই। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব এই অর্থেই বিশেষ যে, এখানে আমরা শুধু জড়কাঠামো অর্থাৎ সেইসব কাঠামো নিয়েই আলোচনা করতে পারি, যাদের মধ্যে কোনো ত্বরণ নেই। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে ত্বরণযুক্ত প্রসঙ্গকাঠামোগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। এখানে যে মূলনীতিটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা হল : নিউটনের বলবিদ্যায় বস্তুর যে জড়তা এবং মহাকর্ষজনিত বল সৃষ্টিতে বস্তুর যে ভর, তা শুধু সম্পর্কযুক্ত নয়, অভিন্ন। আইনস্টাইনের এই সমতার নীতি (Principle of equivalence)

আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সরল ও সাধারণ মনে হয়। কিন্তু বিশ্বজগতের বর্ণনায় এর প্রভাব, আমরা লক্ষ্য করব, অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

গ্যালিলিও ভারী ও হালকা বস্তুর পতনের নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, সব বস্তুই বায়ুশূন্য স্থানে পৃথিবীর টানে একইভাবে ত্বরান্বিত হয়। কেন এমন হয়? এ প্রশ্নের জবাব তিনি দেননি। বস্তুর পতনের এই নিয়ম আবিষ্কার খুব সহজ ছিল না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরিকল্পনা, গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং পরোক্ষ সিদ্ধান্ত টানার অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন গ্যালিলিও তাঁর এই সূত্র আবিষ্কারে। সেইসঙ্গে অভূতপূর্ব এক সংযম তিনি দেখিয়েছিলেন, কোনো ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের লোভ থেকে বিরত থেকে। তিনি বলেছিলেন : কোনোদিন কেউ হয়তো সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করবেন, আমার কাজ সঠিক প্রাকৃতিক নিয়মটি পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে নির্ভুলভাবে উপস্থিত করা।

কেন ভারী ও হালকা বস্তু এদের আকার ও আয়তন, এদের ঘনত্ব ও গঠনকারী উপাদান নির্বিশেষে অভিন্নগতিতে পতিত হয় তার ব্যাখ্যা আমরা পেলাম নিউটনের আবিষ্কার থেকে। কিন্তু নিউটনের দুটো সম্পূর্ণ পৃথক আবিষ্কার এখানে প্রয়োজন ছিল। একটি হল নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র, অন্যটি মহাকর্ষ বলের তত্ত্ব। নিউটনের বলবিদ্যার সূত্র বলছে, কোনো বস্তুর ওপরে যদি বল কাজ করে তাহলে এর ত্বরণ ঘটবে অর্থাৎ এর গতির পরিবর্তনের হার বদলে যাবে আনুপাতিকভাবে। অর্থাৎ প্রযুক্ত বল যদি F হয় এবং আনুষঙ্গিক ত্বরণ যদি f হয়, তাহলে F/f = ধ্রুব। এই ধ্রুব রাশিটি হল বস্তুর বৈশিষ্ট্য— যাকে আমরা জড়তার ভর বলতে পারি। এর নাম দেয়া যাক m_I অর্থাৎ $F/f = m_I$।

নিউটনের মহাকর্ষজনিত আবিষ্কারটি হল প্রত্যেক বস্তুই অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ-বল অংশগ্রহণকারী দুই বস্তুরই ভরের আনুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের সঙ্গে প্রত্যানুপাতিক। এখান থেকে তিনি পেলেন m ভরবিশিষ্ট কোনো বস্তু যখন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে অবস্থান করে আকৃষ্ট হয়, তখন সেই টান হবে $F = G\frac{Mm}{r^2}$, এখানে G হচ্ছে অনুপাতের ধ্রুবক ও M হচ্ছে পৃথিবীর ভর। এই সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি $F = gm$ যেখানে $\frac{GM}{r^2} = g$ ও এটি একটি ধ্রুবক। কারণ G, M ও r কে অপরিবর্তী ধরা যেতে পারে। আমরা যে মহাকর্ষ বলের উৎসরূপে পৃথিবী ও পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট বস্তুর ভরের কথা বলছি তা আসলে সেই গুরুত্ব বহন করছে যা বৈদ্যুতিক চার্জ বহন করে দুটো চার্জের মধ্যে কুলামের বল সৃষ্টিতে। অর্থাৎ মহাকর্ষবলের ক্ষেত্রে বস্তুর ভরকে বলতে পারি মহাকর্ষ চার্জ (Gravitational charge)। এই ভরকে যদি মহাকর্ষ ভর অর্থাৎ m_2 বলি, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মে এর অন্তর্ভুক্তি এসেছে সম্পূর্ণ পৃথক একটি তত্ত্বের ভেতর দিয়ে। জড়তার ভর ও মহাকর্ষ ভরের মান নিউটনের বলবিদ্যার সূত্রে ও মহাকর্ষ বলের সূত্রে সমান মান লাভ করেছে। কিন্তু কেন? এই অভিন্ন মান লাভ করা কি একান্তই কাকতলীয় ঘটনা? নিউটনের তত্ত্বে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এখানে লক্ষ্য করার যে, নিউটনের দুই তত্ত্বে বস্তুর বৈশিষ্ট্য ধারণকারীরূপে ভরের অন্তর্ভুক্তি শুধুই অনুপাতের ধ্রুবরূপে গণ্য হবার নয়। সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন প্রতিভাসের কার্যকারণ ব্যাখ্যায় ভরের ধারণা নিউটন সৃষ্টি করেছিলেন—যেখানে জড়তার ভর গতির পরিবর্তনকে বাধা দিচ্ছে এবং মহাকর্ষ ভর মহাকর্ষ বল সৃষ্টি করছে।

আইনস্টাইন এই দুই ভর, যথা জড়তার ভর ও মহাকর্ষ ভরকে শুধু মানের দিক থেকে অভিন্ন ধরে নিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, কাকতলীয় ঘটনা বলেও গ্রহণ করলেন না; এদের অভিন্নভাবে, স্বীকার্যরূপে গ্রহণ করলেন। আমরা বিষয়টিকে এভাবেও দেখতে পারি : জড়তার ভর m_1 ও মহাকর্ষ ভর m_2 কেন অভিন্ন, এর কোনো তত্ত্ব নেই। অর্থাৎ নিউটন এদেরকে অভিন্নরূপে ব্যবহার করলেও একটি তাত্ত্বিক অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য এখানে থেকে যায় নিউটনের সৃষ্ট বিশ্বধারণায়। আইনস্টাইন এই দুই ভরের সমতাকে স্বীকার্যরূপে গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে বিশ্বজগতের ধারণাকে নতুন করে সাজালেন।

আইনস্টাইনের এই তাত্ত্বিক পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন—যা একইসঙ্গে বিস্ময়কররূপে সরল (ধারণার দিকে থেকে, গাণিতিক বিশ্লেষণের দিক থেকে নয়), সফল এবং চমকপ্রদ। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে আমরা দেখেছি আইনস্টাইন আলোর গতির অপরিবর্তী মানকে স্বীকার্যরূপে গ্রহণ করে এবং সব জড়কাঠামোর জন্য পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর অভিন্ন হবার শর্ত প্রয়োগ করে, স্থান ও কালকে একীভূত করেছেন। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে জড়তার ভর ও মহাকর্ষ ভরকে তিনি সমধৃত করে স্থান, কাল ও বস্তুকে সমন্বিত করলেন। বস্তুত নিউটনের তত্ত্বে মহাকর্ষ বলকে আমরা পরিমাপ করি ত্বরণ দিয়ে। কিন্তু মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কোনো বস্তু যখন ত্বরান্বিত হতে যায় তাতে বাধা সৃষ্টি করে জড়তার ভর। এবং আমরা দেখব এই দুই ভর অভিন্ন হবার ফলে মহাকর্ষবলের উপস্থিতি ও একটি ত্বরান্বিত প্রসঙ্গকাঠামোর মধ্যে কোনো পার্থক্যযোগ্যতা থাকে না। আইনস্টাইন এই অপার্থক্যযোগ্যতা চমৎকার করে বোধগম্য করলেন তাঁর প্রস্তাবিত একটি কাল্পনিক পরীক্ষার দ্বারা।

ধরা যাক, একটি লিফ্‌টের কেবল ছিঁড়ে গেল। লিফ্‌ট এখন পৃথিবীর মহাকর্ষবলের টানে স্বাভাবিক পতন লাভ করবে। এই লিফ্‌টের মধ্যে অবস্থানকারী তার হাত থেকে কোনো বস্তু যদি ছেড়ে দেয়, তা তাঁর সামনে স্থির হয়েই থাকবে। কারণ লিফ্‌ট, লিফ্‌টের মানুষটি এবং আলতোভাবে ছেড়ে দেয়া বস্তু—সবই একই ত্বরণ নিয়ে নিচে নামছে। অন্যদিকে মহাশূন্যে কোনো রকেট যদি এর ইঞ্জিনের দ্বারা ত্বরণ লাভ করে কোনো বিশেষ দিকে, এর মধ্যে আবদ্ধ আরোহীরা অনুভব করবে, যেন একটি মহাকর্ষ বল তাদেরকে উল্টোদিকে টানছে।

আইনস্টাইনের এই সমতার নীতি কী গভীর প্রভাব রাখতে পারে প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায়! এর চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত হল, মহাকর্ষবলের প্রভাবে আলোর বেঁকে যাওয়া। আলোকে আমরা জানি তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গরূপে অথবা আলোর কণিকা বা ফোটনরূপে। মহাকর্ষ বল কি এর ওপরে প্রভাব রাখতে পারে? আলোর যেহেতু কোনো জড়তার ভর নেই, মহাকর্ষ বল কীভাবে এর ওপরে কাজ করবে? স্বভাবতই সনাতনী পদার্থবিদ্যার নিয়মে এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

মহাকর্ষবলের প্রভাবে আলোর চলার পথ বেঁকে যাবে কি না, তা সাধারণ বিচারে ধরা না পড়লেও, সমতার নীতির ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা যদি ফিরে যাই কেবল ছিড়ে যাওয়া পতনশীল লিফ্‌ট-এর মধ্যে, নিচের পরীক্ষাটি করতে পারি।

ধরা যাক লিফ্‌ট-এর মধ্যে সমান-সমান দূরত্বে কয়েকটি ঈষদচ্ছ কাচের প্লেট সমান্তরালভাবে স্থাপন করা আছে। পতনশীল লিফ্‌ট-এর একপাশ থেকে ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে আলো প্রবেশ করে ধাপে-ধাপে ঈষদচ্ছ কাচের প্লেটগুলোর ভিতর দিয়ে পার হয়ে লিফ্‌ট-এর অন্যপাশে একটি ছিদ্রপথে বেরিয়ে যাচ্ছে। পতনশীল লিফ্‌ট-এর মধ্যে অবস্থানকারী যাত্রীর কাছে আলোর চলার পথ সরল মনে হবে। কারণ সে কোনো ত্বরণ দেখবে না। কিন্তু বাইরে থেকে যে লিফ্‌ট-এর মধ্যে আলোর পথটি দেখবে তার কাছে তা বাঁকা মনে হবে। কারণ লিফ্‌ট-এর গতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রথম কাচ পর্যন্ত আনুভূমিক পথ অতিক্রম করার সময়ে লিফ্‌টটি যতটুকু নিচে নামবে, প্রথম কাচ থেকে দ্বিতীয় কাচ পর্যন্ত পৌছার সময়ে লিফ্‌টটি তার চেয়ে বেশি দূরত্ব নিচের দিকে অতিক্রম করবে। একই প্রক্রিয়া চলবে পরবর্তী কাচগুলোর বেলায়। বাইরে থেকে কোনো দর্শক যখন আলোর পথটি হিসেব করবে তার কাছে মনে হবে আলোর পথ উপরের দিকে বেঁকে গেছে। কিন্তু লিফ্‌ট-এর ভিতরে যে দাঁড়িয়ে আছে তার দৃষ্টিতে আলো সরলরেখায় যাবে। কারণ সে কোনো ত্বরণ অনুভব করবে না এবং তার কাছে লিফ্‌টটি একটি জড়কাঠামো।

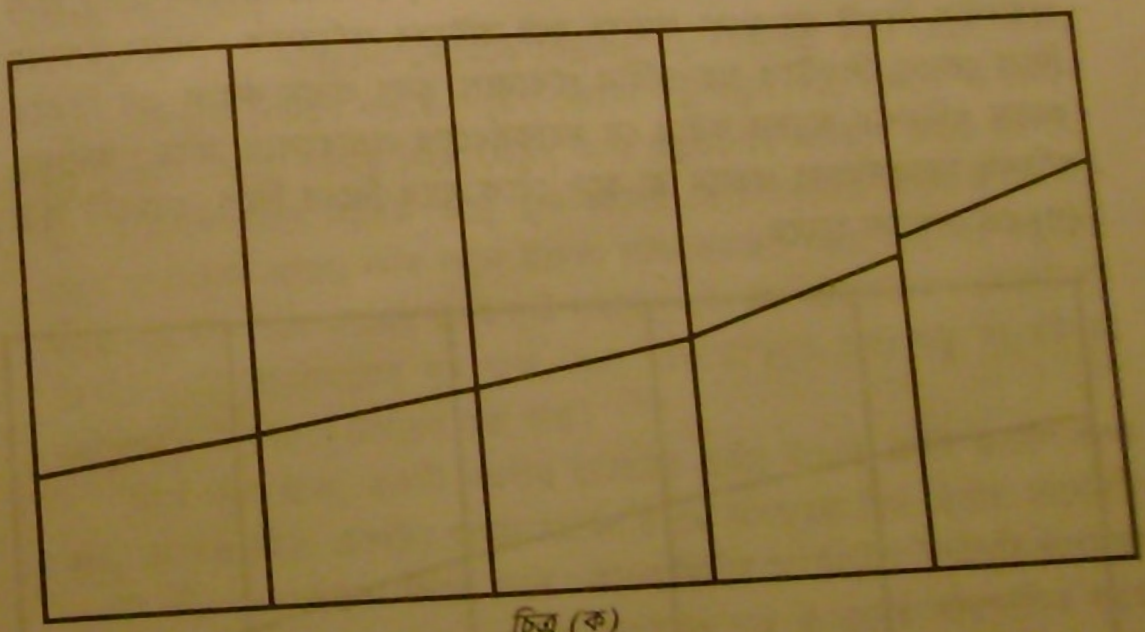

চিত্র (ক)

এখন আমরা ভাবতে পারি লিফ্‌ট-এর ভিতরের পর্যবেক্ষককে বাইরের পর্যবেক্ষকের পর্যায়ে আনার জন্য একটি বল উপরের দিকে প্রয়োগ করা হল। অর্থাৎ লিফ্‌টটি থামিয়ে দেয়া হল। লিফ্‌ট-এর ভিতরের পর্যবেক্ষক এখন

মহাকর্ষবল অনুভব করবে— যেমনটি আমরা সাধারণ অবস্থায় থেমে থাকা লিফ্‌টে অনুভব করি। উপরের দিকের বল যদি এককভাবে লিফ্‌ট-এর উপরে কাজ করত মহাকর্ষহীন পরিবেশে, তা হলে আলোর গতিপথ লিফ্‌ট-এর ভিতরের

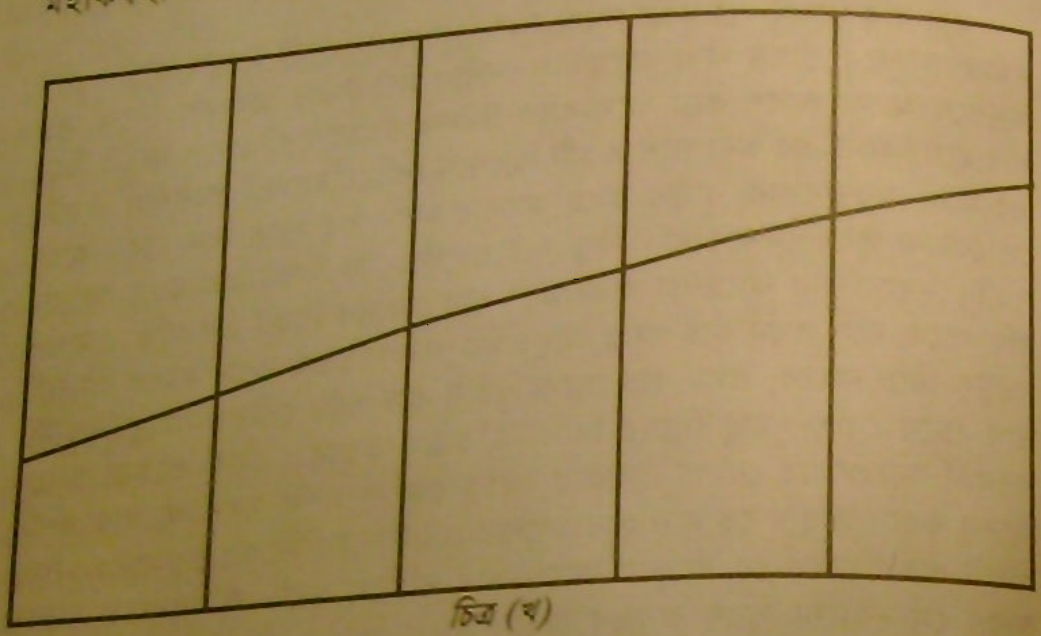

চিত্র (খ)

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে নিচের দিকে বেঁকে যেত, যেমনটি মহাকর্ষবলের জন্য পতনশীল লিফ্‌ট-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে বাইরের পর্যবেক্ষক। অর্থাৎ উপরের দিকে কোনো লিফ্‌টকে মহাকর্ষহীন পরিবেশে ত্বরণ প্রদান করলে এর ভিতরে আবদ্ধ পরিদর্শক অনুভব করবে সে মহাকর্ষবলের প্রভাববলয়ে আছে। আলোর গতিপথ মহাকর্ষবলের প্রভাবে তা হলে বেঁকে যাবে নিচের দিকে, যেমনটি চিত্র (গ)-তে দেখানো হয়েছে।

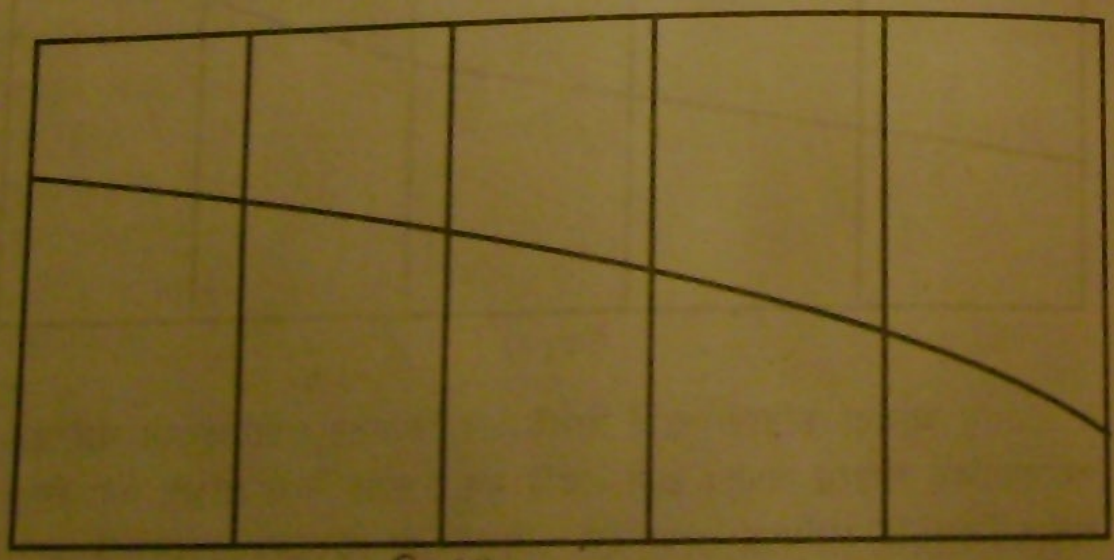

চিত্র (গ)

মহাকর্ষবলের প্রভাব ও আনুষঙ্গিক ত্বরণের প্রভাব আলোর গতিপথের ওপরে অভিন্ন— এই বিশেষ উক্তি না করে আমরা একটি সাধারণীকৃত নীতিতে যেতে পারি যে, বস্তুর উপস্থিতি স্থান-কালকেই বক্রতা প্রদান করে। শূন্যের মধ্যে স্থান-কালের চারমাত্রিক যে সমতল জগৎ তার বস্তুর উপস্থিতিতে বক্রতা লাভ করে, এমন একটি চিত্র গ্রহণ করলে, মহাকর্ষবলের ধারণা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। বস্তু এখন স্থান-কালের জগৎকে দুমড়ে-মুচড়ে বদলে দিতে পারে।

উপরের আলোচনায় মহাকর্ষের প্রভাবে আলোর বেঁকে যাওয়াকে আমরা এখন বক্র স্থান-কালের মধ্যে আলোর সংক্ষিপ্ততম পথে চলা বলতে পারি। দুইমাত্রিক সমতল ভূমি যদি ভূমিকম্পের কারণে উঁচুনিচু হয়ে যায়, এর ওপর দিয়ে চলার সংক্ষিপ্ততম পথ তখন সরলরেখারই প্রতিবিম্ব। গণিতের ভাষায় একে বলা হয় জিওডেসিক। একটি গোলকের পৃষ্ঠদেশ যে দুইমাত্রিক জগৎ সৃষ্টি করে সেখানের জিওডেসিক হল দুইটি বিন্দুকে যুক্তকারী একটি মহাবৃত্তের চাপ।

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে ত্বরণযুক্ত প্রসঙ্গকাঠামোগুলোও এখন অন্তর্ভুক্ত, যা করা সম্ভব হল একটি জ্যামিতিক চিত্রের মধ্যে। নিউটনীয় মহাকর্ষ তত্ত্বে বস্তুর উপস্থিতি মহাকর্ষবল সৃষ্টি করে ও তা ত্বরণ ঘটায় অবিচল অপরিবর্তী স্থান ও নিরপেক্ষ কালের মধ্যে। প্রত্যেকটি বস্তু ও ঘটনাকে আমরা পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি সেখানে, একই অনড় স্থান ও অভিন্নকালের প্রসঙ্গকাঠামোতে।

একটি সুদৃঢ় দালানের মেঝেতে ভিন্নভিন্ন বস্তু ভিন্নভিন্ন স্থানে রেখে আমরা এদের অবস্থান নির্ধারণ করতে পারি। কোনো বস্তু নতুন করে রাখলে বা কোনো বস্তু সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে, অন্য বস্তুগুলোর অবস্থান তাতে বদলাবে না। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে স্থান-কালের যে চারমাত্রিক জগৎ তা প্রতিটি বস্তুর প্রভাবকে আত্মস্থ করে নতুন বক্রতা লাভ করছে। সমগ্র বিশ্ব এর বস্তুমালা নিয়ে এই বক্র স্থান-কালের জগৎ সৃষ্টি করছে। এই মহাবিশ্বে কোথাও কোনো দৃঢ় দেয়াল নেই বা সময়ের দৃঢ় অক্ষ, যার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য বস্তু বা ঘটনায় অবস্থানকে স্থিরভাবে নির্ধারণ করা যায়।

মনে করা যাক, একটি নমনীয় রাবারের পর্দার উপরে একটি মার্বেল রাখা হল, এরপর আর একটি। প্রথম মার্বেলটি যে অবস্থানে ছিল দ্বিতীয় মার্বেলটি রাখার পর সে অবস্থান বদলে যাবে। কারণ দ্বিতীয় মার্বেলটির উপস্থিতি রাবারের পর্দার বক্রতা বদলে দেবে। মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু ও এদের পারস্পরিক দূরত্ব স্থান-কালের জগৎকে যে বক্রতা দিচ্ছে, সেই বক্র স্থান-কালের জগতে আমরা স্থান ও কালের পরবর্তী অক্ষ নির্বাচন করছি প্রতিটি ঘটনার জন্য। আমরা যাকে বস্তুর অবস্থান বা ঘটনার সময় বলছি, তা হল এই নির্বাচিত অক্ষের উপরে ঘটনার অভিক্ষেপ।

বস্তুর উপস্থিতি স্থান-কালের জগৎকে যেভাবে বক্রতা দেয় তার উপরে নির্ভর করেই স্থানিক ও কালিক অবস্থান আমরা নির্ধারণ করতে পারি। এই অবস্থানাঙ্ক স্থান ও কালের জন্য পৃথকভাবে পরম নয়, তা নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের অবস্থানের ওপরে। আমরা দেখব বস্তুর উপস্থিতি সময়কে কীভাবে প্রভাবিত করে কৃষ্ণবিবরের আশেপাশে ও এর অভ্যন্তরে।

বক্র স্থান, যা বস্তুর উপস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

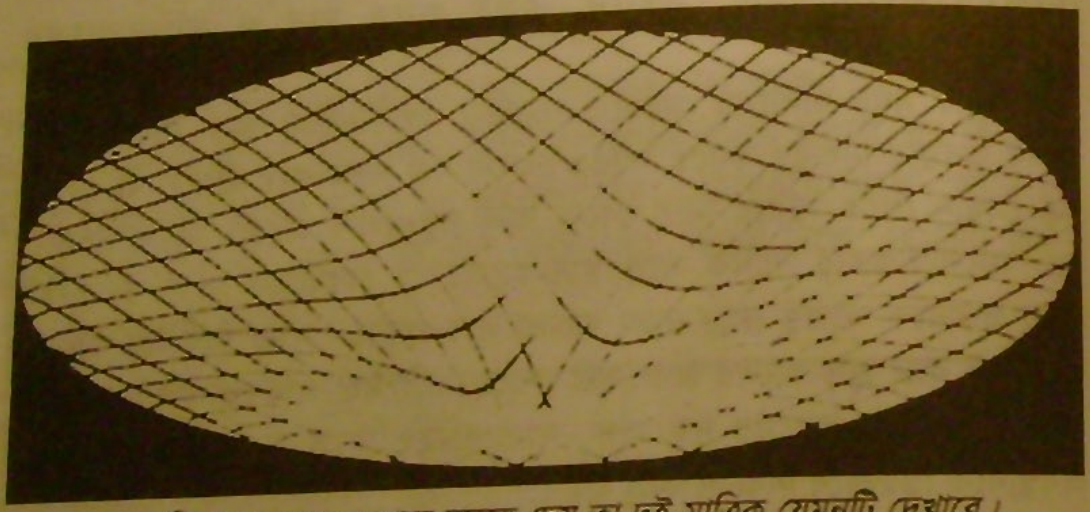

কৃষ্ণ বিবর স্থানকে যে ভাবে দুমড়ে দেয় তা দুই মাত্রিক যেমনটি দেখাবে।

কৃষ্ণবিবর হচ্ছে মহাকাশের সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু। সূর্যের চেয়ে আড়াইগুণের বেশি ভরবিশিষ্ট কোনো নক্ষত্র যখন এর সমস্ত পারমাণবিক ইন্ধন নিঃশেষ করে শীতল হয়ে পড়ে তখন এর প্রচণ্ড অন্তর্মুখী মহাকর্ষবলকে ঠেকাবার মতন কোনো বহির্মুখী বল অবশেষ থাকে না। ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র , যেমন আমাদের সূর্য, যখন এর পারমাণবিক ইন্ধন হাইড্রোজেন নিঃশেষ করে শীতল হয়ে পড়বে, তার পরিণতি হবে শ্বেতবামনে। কারণ কোয়ান্টাম-তত্ত্বের বর্জনের নিয়ম অনুসারে ইলেকট্রনের সঙ্গে ইলেকট্রনের একটি নতুন বিকর্ষণ কাজ করবে। অর্থাৎ দুটো

ইলেকট্রন যেহেতু এদের সব কোয়ান্টাম নাম্বার অভিন্ন নিয়ে একইসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না, খুব কাছাকাছি এলে উচ্চতর কোয়ান্টাম স্তরে পরের ইলেকট্রনকে চলে যেতে হয়। একে ইলেকট্রনের ডিজেনারেসি বা সমপর্যাবৃত্তি শর্ত বলে। ইলেকট্রনের এই ডিজেনারেসি চাপ বৃদ্ধি পেয়ে যদি এমন স্তরে পৌঁছে যে ইলেকট্রনগুলোর ঘূর্ণনগতি বা স্পিন আলোর গতির সীমানায় যায়, তখন তা অন্তর্মুখী মহাকর্ষ চাপকে আর ধরে রাখতে পারে না। মৃত নক্ষত্র যদি সূর্যের তুলনায় ১.৪ থেকে দুইগুণ ভরবিশিষ্ট হয়, তাহলে তা পরিণত হয় নিউট্রন নক্ষত্রে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন ডিজেনারেসি চাপের পরিবর্তে নিউট্রন ডিজেনারেসি চাপ নক্ষত্রকে ধরে রাখে, মহাকর্ষের বিপুল অন্তর্মুখী চাপের বিরুদ্ধে।

যেখানে শ্বেতবামনের আয়তন হয় আমাদের পৃথিবীর মতো এবং ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে কয়েক টন, নিউট্রন নক্ষত্রের সেখানে ব্যাস মাত্র কয়েক কিলোমিটার এবং ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে প্রায় দশ লক্ষ টন। মৃত নক্ষত্রে ভর যখন সূর্যের ভরের আড়াই গুণ বা তারও বেশি হয় তখন কোনো বলই এর সংকোচনকে ঠেকাতে পারে না মহাকর্ষ বলের অন্তর্মুখী বলের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে সময় কেমনভাবে দুমড়ে যায় সেই বিশ্লেষণ সবচেয়ে নাটকীয়।

এর আগে আমরা দেখেছি, একটি মৃত নক্ষত্রের পরিণতি কি হবে তা নির্ভর করে এর আদি ভরের ওপরে। যেসব নক্ষত্র আমাদের সূর্যের মতো ভরের, সেগুলোর শেষ পরিণতি হয় শ্বেতবামনে। এক্ষেত্রে তাপজনিত বহির্মুখী চাপ না-থাকলেও পাউলিও বর্জন নীতির কারণে প্রতিটি ইলেকট্রনকে ভিন্নভিন্ন কোয়ান্টাম স্তরে থাকতে হয় এবং এর ফলে সৃষ্ট ইলেকট্রন ডিজেনারেসি চাপ শ্বেতবামনের অধিকতর সংকোচনকে বাধা দেয়।

মৃত নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভরের দেড়গুণের বেশি হয় তখন মহাকর্ষবলের চাপ এত প্রচণ্ড হয় যে, ইলেকট্রন ডিজেনারেসি চাপও এর সংকোচনকে ঠেকাতে পারে না। এ ধরনের নক্ষত্রের পরিণতি কী হয়? এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে নক্ষত্রের ভর কত বেশি তার ওপরে। শেষবারের মতো সংকুচিত হবার আগে এই মৃত নক্ষত্র একবার ফুলে ওঠে এবং লোহিত দৈত্য বা রেড জায়ান্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। একটি রাবারের বলকে হঠাৎ চাপ দিলে যেমন তা পরের মুহূর্তে বাইরের দিকে প্রসারিত হয় প্রতিক্রিয়ায় অনেকটা তেমন ব্যাপার ঘটে এক্ষেত্রে। এটা ঘটে অবশ্য বাইরের আবরণের ক্ষেত্রে, এবং ভেতরের মর্মস্থল সংকুচিত ও ঘনীভূত হতে থাকে। ছোট নক্ষত্রের বেলায় শেষপর্যন্ত সমস্ত বস্তুই এর শ্বেতবামনের অংশ হয়ে পড়ে। কিন্তু নক্ষত্রটির ভর যদি বিপুল হয়, এর ভিতরের সংকোচনশীল মর্মস্থল চন্দ্রশেখরের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে। ইলেকট্রন ডিজেনারেসি চাপ এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে না বলে আকস্মিক এক সংকোচন ঘটে ও ঘনত্ব প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়।

এই প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, যার অনেকাংশই নিউট্রিনোরূপে বেরিয়ে আসে ও বাইরের আবরণে শোষিত হয়। নক্ষত্রের বাইরের আবরণ এর ফলে প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সুপারনোভারূপে বিস্ফোরিত হয়। এই সুপারনোভার উজ্জ্বলতা সমগ্র গ্যালাক্সির উজ্জ্বলতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, ফলে দিনের আলোতেও দৃশ্যমান হতে পারে। অনেক সুপারনোভাই আকাশে দেখা গেছে। শেষ সুপারনোভাটি আমাদের গ্যালাক্সিতে দেখা গেছে ১৬০৪ সালে, যার বর্ণনা দিয়েছেন জোহান কেপলার। সুপারনোভারূপে বিস্ফোরণে ভারী নক্ষত্রের একটা বড় অংশ, প্রায় শতকরা ৯০ ভাগও নিক্ষিপ্ত হতে পারে বাইরে। কিন্তু আমাদের আলোচনায় যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, পতনশীল নক্ষত্রের ভিতরের মর্মস্থল, যা ক্রমাগত সংকুচিত ও ঘনীভূত হতে থাকে। এই সংকোচন এত বেশি ঘটে যে, শ্বেতবামনরূপে তা স্থিতিশীল হতে পারে না। শুধু নিউট্রন নক্ষত্র হচ্ছে পরবর্তী সম্ভাব্য পরিণতি মৃত নক্ষত্রের মর্মবস্তুর, যা বিপুলতর মহাকর্ষবলের অন্তর্মুখী চাপের মোকাবিলা করতে পারে নিউক্লীয় বলের দ্বারা।

নিউট্রন নক্ষত্রের ব্যাসের সংকোচন ঘটে শ্বেতবামনের তুলনায় প্রায় শতগুণ, এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় দশ কোটি গুণ। নিউট্রন নক্ষত্রকে একটি বড় নিউক্লিয়াসরূপেও আমরা ভাবতে পারি, যেখানে পরমাণুগুলো এদের অস্তিত্ব হারিয়ে নিউট্রনে পরিণত হয়। ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের জায়গায় গাদাগাদি হয়ে এদেরকে নিউট্রনে রূপান্তরিত করে। পাউলির বর্জনের নীতি এক্ষেত্রে কাজ করে নিউট্রনগুলোর উপরে, এবং বহির্মুখী নিউট্রন ডিজেনারেসি চাপ একে রক্ষা করে।

নিউট্রন নক্ষত্রের তত্ত্ব প্রথম উপস্থাপন করেন লিভ ল্যান্ডো ১৯৩২ সালে এবং পরবর্তীতে রবার্ট ওপেনহাইমার, জর্জ ভলকভ প্রমুখ এই তত্ত্বের প্রসারণ ঘটান। নিউট্রন নক্ষত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণলব্ধ সমর্থন আসে ১৯৬৭ সালের পর, যখন সুপারনোভার অবশেষরূপে পালসার ধরা পড়ে রেডিও-টেলিস্কোপে। অ্যানটেনি হিউসের ছাত্রী জোসেলিন বেল লক্ষ্য করেন যে, দূর মহাকাশের এক উৎস থেকে নিয়মিতভাবে রেডিও-তরঙ্গ ভেসে আসছে। প্রথমে তাঁরা মনে করেছিলেন, মহাবিশ্বের দূর কোনো নক্ষত্রের গ্রহে গড়ে-ওঠা সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর সংযোগ স্থাপিত হয়েছে সেখান থেকে প্রেরিত রেডিও-সংকেতের মাধ্যমে। তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন LGM, অর্থাৎ লিট্‌ল গ্রিন ম্যানরূপে। পরবর্তীতে অবশ্য বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ঘূর্ণনশীল নিউট্রন নক্ষত্রের চৌম্বকক্ষেত্র ও এর পারিপার্শ্বিক বস্তুমালার মধ্যে জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফলেই এই স্পন্দনশীল রেডিও-তরঙ্গ উৎপন্ন হচ্ছে।

কিন্তু নিউট্রন নক্ষত্রের স্থিতিশীল ভরেরও একটি উচ্চসীমা আছে। ওপেনহাইমারের হিসাবকে একটু সংশোধিত করে সাম্প্রতিক যে চরম মান নির্ধারণ করা হয়েছে নিউট্রন নক্ষত্রের, তা সূর্যের ভরের তিনগুণ। এর চেয়ে বেশি ভরবিশিষ্ট কোনো নিউট্রন নক্ষত্র মহাকর্ষ চাপের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল হতে পারে না এর নিউট্রন ডিজেনারেসি ভরের বহির্মুখী চাপের দ্বারা। এর এ-ধরনের মৃত

নক্ষত্রের অন্তর্বস্তু ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকবে অপরাহ্নের মহাকর্ষবলের প্রভাবে।

আসলে মহাকাশে অনেক নক্ষত্র আছে যাদের ভর সূর্যের তুলনায় পঞ্চাশ গুণ বা তারও বেশি। ফলে এদের অনেকেই সুপারনোভারূপে বহিরাবরণের অনেক বস্তু নিক্ষেপ করার পরও যথেষ্ট পরিমাণ ভর এদের অন্তর্বস্তুরূপে সংরক্ষণ করতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, আমরা অনেক অনেক অন্তর্বস্তু পাব মৃত নক্ষত্রের, যাদের ভর সূর্যের ভরের তিনগুণেরও বেশি। প্রচণ্ড ঘনীভূত এই নিউট্রন পিণ্ডকে বলা হয় কৃষ্ণবিবর। কৃষ্ণবিবর বা 'ব্ল্যাকহোল' নামকরণটি করেছিলেন আমেরিকার পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার ১৯৬৯ সালে। অবশ্য এরও অনেক আগে ১৭৮৩ সালে কেমব্রিজের ডন জন মাইকেল তাঁর এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এই ধারণা উপস্থাপন করেন যে, কোনো-কোনো নক্ষত্র এত ভারী ও ঘনীভূত হতে পারে যেখান থেকে আলোর কণিকা মুক্ত হতে পারে না মহাকর্ষবলকে অতিক্রম করে। ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যাপলেসও তাঁর 'সিস্টেম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে অনুরূপ ধারণা উপস্থাপন করেন। কিন্তু নিউটনের করপাসকুলার তত্ত্বের পরিবর্তে আলোর তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, আলো যে মহাকর্ষ বল দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এই ধারণা গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

আসলে নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বের ভিত্তিতে আলোর ওপরে ভারী ও ঘনীভূত বস্তুপিণ্ডের প্রভাব ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। কারণ আলোর কণিকার ভরের ওপরে মহাকর্ষবল যদি কাজ করে তাহলে আলোর গতি মন্থর হবার কথা। কিন্তু আমরা এখন জানি, আলোর গতি অপরিবর্তী গতিতে চলে। সুতরাং কৃষ্ণবিবরের ধারণা সম্পূর্ণভাবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের আলোকেই মাত্র আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

আমরা আগেই জেনেছি, বস্তুর উপস্থিতি স্থান-কাল সন্ততিকে বক্রতা প্রদান করে। ওপেনহাইমার যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন এর ভিত্তিতে তা হল : কোনো নক্ষত্রের অনুপস্থিতিতে স্থান-কালে আলোর যে-পথ, নক্ষত্রের উপস্থিতিতে তা বদলে যায়। একটি শঙ্কুর শীর্ষ থেকে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে এমন একটি ছবি যদি আমরা কল্পনা করি, তা হলে আমরা দেখব আলোর শঙ্কুগুলো, যা আলোর যাত্রাপথ নির্দেশ করে, নক্ষত্রের পৃষ্ঠের কাছে ভিতরের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। সূর্যগ্রহণের বেলায় এটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এখন কল্পনা করা যাক যে, নক্ষত্রটি সংকুচিত হচ্ছে মহাকর্ষবলের প্রচণ্ড প্রভাবে, এর পৃষ্ঠদেশে এই মহাকর্ষবল প্রবলতর হবে বলে সেখানে আলোর শঙ্কুগুলো বেশি বেঁকে যাবে ভিতরের দিকে। এর ফলে নক্ষত্র থেকে আলোর নির্গমন ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠবে, কারণ মহাকর্ষক্ষেত্রের বিরুদ্ধে কাজ করতে আলোর কণিকা ফোটনের শক্তি খরচ হবে। যে আলো আমরা এখন পাব তা মৃদুতর ও লালতর হতে থাকবে। শেষপর্যন্ত নক্ষত্রটি যখন একটি ক্রান্তিক মান লাভ করবে এর ব্যাসার্ধের, এর পৃষ্ঠদেশের মহাকর্ষক্ষেত্র এত প্রবল হবে যে আলো আর সেখান থেকে মুক্তি পাবে না।

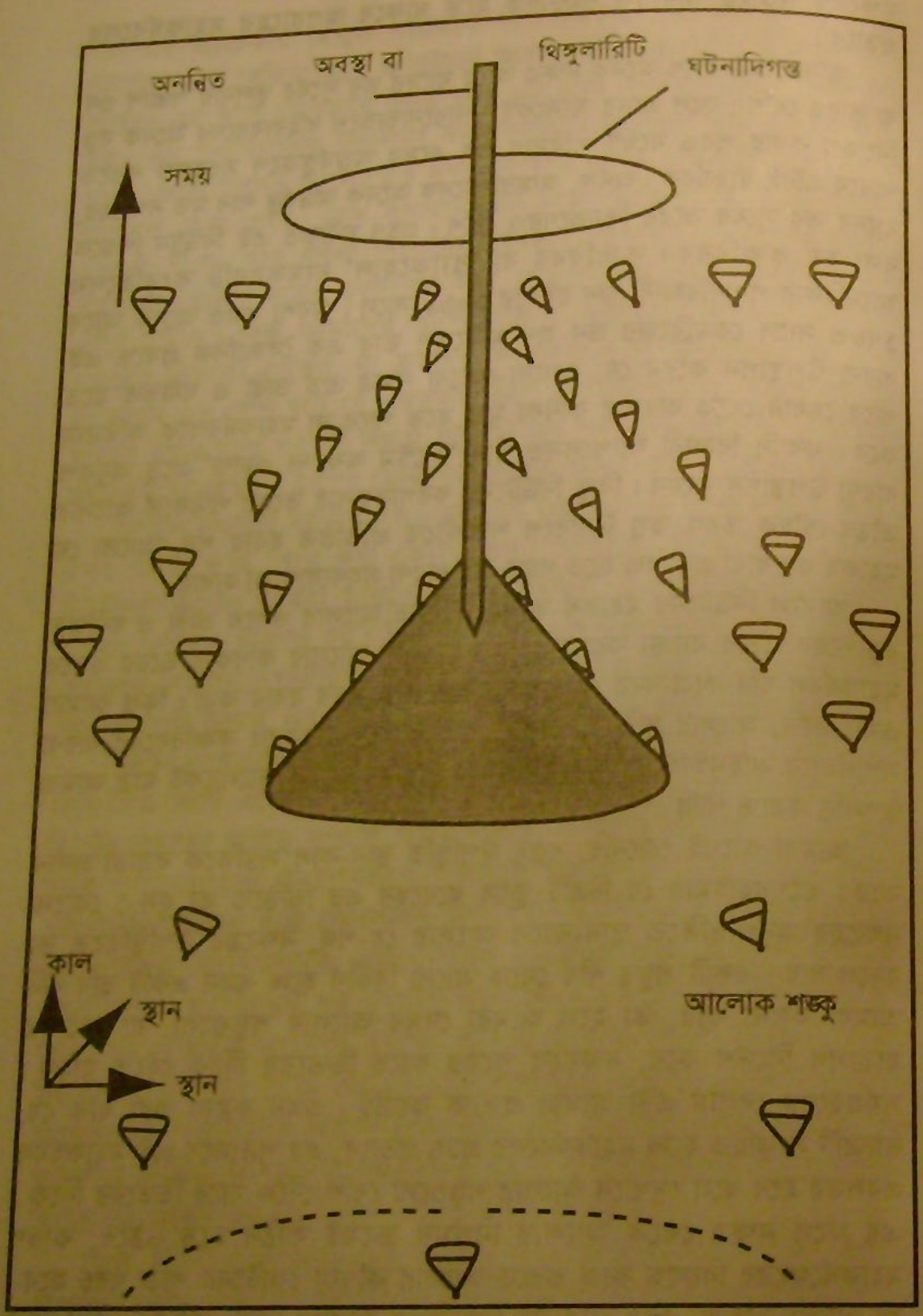

একটি পতনশীল নক্ষত্র যা কৃষ্ণ বিবরে রূপান্তরিত হচ্ছে।
আলোর শঙ্কু ক্রমাগত নক্ষত্রের মর্মবস্তুর দিকে বেঁকে যাচ্ছে।

কিন্তু আমরা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে জানি, কোনোকিছুই আলোর চেয়ে বেশি গতিতে চলতে পারে না। ফলে আলো এখানে নির্গত হতে পারবে না এই মহাকর্ষবলের প্রভাবমুক্ত হয়ে। এই ক্রান্তিক এলাকায় আমরা তাহলে এমন ঘটনামালা পাব যা বাইরের কোনো দর্শকের কাছে পৌঁছবে না। পতনশীল ঘনীভূত নক্ষত্রের এই যে এলাকা স্থান-কালের, যেখান থেকে কোনো তথ্যই বাইরে আসতে পারছে না, তাকে আমরা বলেছি কৃষ্ণবিবর। এই কৃষ্ণবিবরকে ঘিরে যে ক্রান্তিক সীমানা, যা বাইরের জগৎ ও কৃষ্ণবিবরকে পৃথক করে রাখে, তাকে বলা হয় ঘটনা-দিগন্ত। এই ঘটনা-দিগন্ত হচ্ছে আলোকরশ্মির পথ যা কৃষ্ণবিবর থেকে মুক্তি পেতে পেতে পেল না।

বিষয়টি উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে সময় পরম নয়। প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের নিজস্ব যে-সময় তা-ই শুধু সে পরিমাপ করতে পারে। নক্ষত্রের উপরে অবস্থান করছে এমন কাউকে যদি কল্পনা করি, তাহলে তার নিজস্ব সময় ও নক্ষত্র থেকে দূরে যে অবস্থান করছে তার সময় তা অভিন্ন নয়। কারণ নক্ষত্রের মহাকর্ষক্ষেত্র এখানে সময়কে প্রভাবিত করছে। ধরা যাক, কৃষ্ণবিবরে রূপান্তরিত হবার পথে একটি নক্ষত্র সংকুচিত হচ্ছে এবং এর পৃষ্ঠে একজন মহাকাশচারী বসে আছে। (অবশ্যই খুব অবাস্তব কল্পনা। কেন? তা আমরা পরে দেখব)। নক্ষত্রের সঙ্গে এই মহাকাশচারী যখন পতনশীল তখন তার ঘড়ি অনুসারে সে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে সংকেত পাঠাচ্ছে। যখন নক্ষত্রটি ঠিক ঘটনা-দিগন্তে পৌঁছবে, সেই মুহূর্তে প্রেরিত যে-সংকেত তা আর বাইরে যেতে পারবে না। বাইরে থেকে কোনো সঙ্গী মহাকাশচারী যদি এই সংকেত গ্রহণ করতে থাকে, তার কাছে প্রথমদিকে মনে হবে সংকেতগুলো একটু দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে আসছে। এটা ঘটবে নক্ষত্রের উপরে অবস্থানকারী যতক্ষণ ঘটনা-দিগন্তের মধ্যে প্রবেশ করেনি। অর্থাৎ নক্ষত্রটি কৃষ্ণবিবরের ক্রান্তিক ব্যাসার্ধ লাভ করেনি।

আসলে কৃষ্ণবিবরের ব্যাসার্ধ কথাটা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে স্থানিক জ্যামিতির ধারণা এখানে প্রযোজ্য নয়। তবে তুলনামূলক একটি চিত্র লাভের জন্য আমরা ব্যাসার্ধ কথাটি ব্যবহার করছি। ঘটনা-দিগন্তে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে নক্ষত্র থেকে প্রেরিত সংকেতের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকবে, ধীরে ধীরে এবং সেখান থেকে পাওয়া আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বাড়তে থাকবে। শেষপর্যন্ত আপন মহাকর্ষক্ষেত্রের প্রভাবে ভিতরের দিকে পতনশীল নক্ষত্র যখন ঘটনা-দিগন্ত অতিক্রম করবে, কোনো সংকেত বা আলোই সেখান থেকে বাইরে আসতে পারবে না। এই সংকুচিত নক্ষত্রকে ঘিরে এমন একটি এলাকা সৃষ্টি হবে যা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। নক্ষত্রের মধ্যে সংকোচন প্রক্রিয়া অবশ্য চলতেই থাকবে, কিন্তু সে-তথ্য

বাইরে আসার কোনো অবকাশ নেই। আমরা শুধু ঘটনা-দিগন্তের সীমানা নির্দেশ করতে পারব, বাইরে থেকে এর ভেতরের পরিবর্তন সম্পূর্ণ অগোচরে থাকবে বাইরের জগতের কাছে। এই অর্থে আমরা বলতে পারি ঘটনা-দিগন্ত দিয়ে মোড়া এলাকা স্থান-কালের মধ্যে যেন একটি গর্ত। দুইমাত্রিক কোনো চাদরে যদি ছিদ্র থাকে, সেই এলাকায় চাদরের বৈশিষ্ট্য যেমন হঠাৎ শেষ হয়ে যায়, একটি পিঁপড়া হাঁটতে হাঁটতে সেখানে পৌঁছলে যেমন হারিয়ে যায়, অনেকটা তেমন। মনে রাখতে হবে আমরা এখানে চারমাত্রিক স্থান-কালের সন্ততিতে গর্ত দেখছি। ফলে সমস্ত ঘটনাই এখানে এসে হারিয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণবিবরের মধ্যে কী ঘটছে তা আমরা জানতে না পারলেও একটি বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে অনুধাবন করতে পারি। সম্পূর্ণ চুপসে যাওয়া অর্থাৎ পতিত নক্ষত্রের অভ্যন্তরে স্থান ও কাল যেন এদের অবস্থানের বিনিময় ঘটায়। সাধারণভাবে আমরা জানি কোনো অবিচল বস্তু যেমন, পাহাড়ের আকার অর্থাৎ স্থানিক বিস্তার বদলায় না কিন্তু এর বয়স বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৃষ্ণবিবরের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য মহাকর্ষবলের টানে অন্তহীনভাবে নক্ষত্রের অন্তর্বস্তু সংকুচিত হতে থাকে অর্থাৎ এর স্থানিক বিস্তার কমতে থাকে, কিন্তু সময় এখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে সময়ের সম্পর্ক আলোক-সংকেতের প্রবাহের সঙ্গে। কৃষ্ণবিবরের বাইরে থেকে যে একে প্রত্যক্ষ করবে তার কাছে ধরা পড়বে যে কৃষ্ণবিবর এর চারপাশের বস্তু, এমনকি আলো শোষণ করে নিচ্ছে, যেমন করে স্নানাগারের ছিদ্রপথে পানি নিচে পড়ে যায়। কোনো দর্শক যখন কৃষ্ণবিবরের ঘটনা-দিগন্ত দেখবে, তখন তার মনে হবে নক্ষত্রটি এইমাত্র পতিত হল কৃষ্ণবিবরে, যদিও এ-ঘটনা ঘটে থাকতে পারে লক্ষ-কোটি বছর আগে। কারণ যে-মুহূর্তে নক্ষত্রটি কৃষ্ণবিবর হবার প্রক্রিয়ায় ঘটনা-দিগন্তের মধ্যে প্রবেশ করল—বাইরের পর্যবেক্ষকের প্রসঙ্গকাঠামোতে তা কালের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।

রজার পেনরোজ ও স্টিফেন হকিং দেখিয়েছেন যে, আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে কৃষ্ণবিবরের মধ্যে স্থান-কালের বক্রতা অসীমতা লাভ করার ফলে একটি অনন্বিত অবস্থা, অর্থাৎ Singularity সৃষ্টি হবে। ব্যাপারটি অনেকটা মহাবিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তের মতো। আমরা জেনেছি Big bang বা মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তের আগে কী ঘটেছে, স্থান-কাল ও বস্তুর কী অবস্থা তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে আমাদের জানা সম্ভব নয়। কারণ সমস্ত নিয়ম ও ভৌত রাশির নিরবচ্ছিন্নতা এখানে শেষ হয়ে যায়। মহাবিস্ফোরণ সেদিক থেকে সময়ের সূচনা। পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে এর আগে কোনো কাল নেই। কৃষ্ণবিবর সেদিক থেকে সময়ের অবসান এর ঘটনা-দিগন্ত দিয়ে আবৃত এলাকার জন্য, এর বাইরে অবস্থানকারী কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও সংখ্যায়নিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করলে সব বস্তুই কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত মনে হবে। আমরা যদি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে কম্পিউটারের নির্দেশমালা বা প্রগ্রাম রূপে বিবেচনা করি, তা হলে একটি পরমাণু একখণ্ড প্রস্তর, একটি পরমাণু-বোমা বা একটি গ্যালাক্সি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে কম্পিউটারের মতন তথ্য গ্রহণ, ধারণ, প্রক্রিয়াজাত করণ ও তথ্য প্রদান করে বলে প্রতীয়মান হবে। একটি বস্তু কতটা তথ্য ধারণ করে আছে তা আমরা পরিমাপ করতে পারি তাপবলবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে। কারণ, তথ্যের সম্পর্ক শৃঙ্খলার সঙ্গে। তথ্য হারালে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং সুশৃঙ্খল যে কোনো ভৌত ব্যবস্থা বা সিস্টেম তথ্য ধারণ করে এর গঠনকারী মৌলিক কণিকার বিন্যাসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইলেকট্রন বা প্রোটনের অবস্থান বা ঘূর্ণনদশা অর্থাৎ স্পিন থেকে আমরা তথ্য পেতে পারি। ফোটন বা আলোক কণিকার স্পিনও তেমনি তথ্য ধারণ করে। সময়ের মধ্যে বস্তুর যে বিবর্তন ঘটে, সেখানে তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বা প্রসেসিং চলে।

ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণবিবর সাধারণ বস্তু থেকে ভিন্ন বলে আমরা জানি। আমরা দেখেছি, যে বস্তু থেকেই কৃষ্ণবিবর উৎপন্ন হোক, প্রচণ্ড মহাকর্ষ বলের প্রভাবে তা উৎস বস্তুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অভিন্ন রূপ লাভ করে, সর্বগ্রাসী এক গহ্বর রূপে। স্টিফেন হকিং যখন ১৯৭০ সালে কৃষ্ণবিবর থেকে বিকিরণ নির্গমনের তত্ত্ব প্রদান করেন, সেখানে তিনি ধারণা দেন যে, এই বিকিরণ এত এলোমেলো ভাবে নির্গত হয় যে, সেখানে কোনো তথ্য থাকে না। ফলে ব্ল্যাকহোল থেকে বিকিরণ পাওয়া গেলেও এর অভ্যন্তরে সব তথ্য হারিয়ে যায়। কৃষ্ণবিবরের এই চিত্র থেকে যে ধারণা সৃষ্টি হয় সেখানে কৃষ্ণবিবরের মধ্যে তথ্য প্রবেশে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তথ্য বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। এটি একটি ধাঁধার সৃষ্টি করে। এই ধাঁধার একটি সমাধান এসেছে সম্প্রতি। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়োনার্ড সাসকিন্ড, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউটের জন প্রেসকিল ও অন্যান্য বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণবিবরের বিকিরণ আসলে এলোমেলো নয়। অর্থাৎ এখানে তথ্য থেকে যাচ্ছে। স্টিফেন হকিংও এদের যুক্তি মেনে নিয়েছেন সম্প্রতি। বিজ্ঞানীদের বর্তমান অভিমত হল, সব বস্তুই আসলে কম্পিউটারের মতন আচরণ করে– এমনকি কৃষ্ণবিবরও। কৃষ্ণবিবরের স্মৃতিধরের যে আয়তন, তা কৃষ্ণবিবরের হিসাব করার যে হার তার বর্গের আনুপাতিক।

তথ্যের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম প্রযোজ্য বলেই কৃষ্ণবিবরে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করণ সম্ভব হচ্ছে। কোয়ান্টাম ক্রিয়া না থাকলে কৃষ্ণবিবরের মধ্য সব তথ্য ধ্বংস হয়ে যেত। পদার্থবিজ্ঞানের যে নিয়মগুলো কম্পিউটারের দক্ষতা

নিয়ন্ত্রণ করে সেই নিয়মগুলোই নির্ধারণ করে কতটা সূক্ষ্মভাবে স্থান ও কালের "অণু" আমরা পরিমাপ বা সংজ্ঞায়িত করতে পারি। তথ্যের একক যে "বিট" তাকে আমরা "কিউবিট" বলবো এখন, যা দিয়ে মহাবিশ্বকে নির্মাণ করা যেতে পারে। এই কোয়ান্টাম বিটের বৈশিষ্ট্য প্রচলিত বিটের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই তথ্য কোয়ান্টামের ধারণা থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করেছেন মৌলিক কণিকা, কৃষ্ণবিবর ও কসমিক ডার্ক ম্যাটারের ব্যাখ্যায় এবং স্থান-কালের সূক্ষ্ম গঠন নির্ধারণে।

মহাবিশ্বকে আমরা এখন ভাবতে পারি একটি কোয়ান্টাম কম্পিউটার রূপে। ভৌত ব্যবস্থার প্রতিটি কণিকা কম্পিউটারের এক একটি লজিক গেট রূপে কাজ করে। এর স্পিন অক্ষ সম্ভাব্য দুইটি দশায় থাকতে পারে। একটি স্পিন যখন একবার ওলট খায় তখন একটি কম্পিউটেশনের অপারেশন সংঘটিত হয়। একটি স্পিন উল্টাতে যে সময় লাগে তা সময়ের ক্ষুদ্রতম একক দেয় কম্পিউটার অপারেশনের। হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি এখানে কার্যকর। ফলে, একই সময়ে সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে অবস্থান ও ভরবেগ বা শক্তি ও সময় অথবা যে কোনো দুই সম্বন্ধযুক্ত যুগ্ম রাশি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কত দ্রুত একটি স্পিন উল্টানো যাবে অর্থাৎ একটি কোয়ান্টাম অপারেশন সম্পন্ন করা যাবে তা নির্ভর করে প্রযুক্ত শক্তির তীব্রতার উপরে। যত বেশি শক্তি প্রয়োগ করা হবে তত দ্রুত স্পিন উল্টানো সম্ভব হবে।

আমরা নতুন এক কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কথা ভাবতে পারি, যেখানে বিট রূপে তথ্য ধারণ করে প্রোটন, এর স্পিন সত্ত্বা নিয়ে। চৌম্বক বল প্রয়োগ করে এই স্পিনের কোয়ান্টাম দশা বদলানো যায়। ম্যাসাচুচেটস ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির নরম্যান মার গোলাস এবং বোস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভ লেভিটিন যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার বিধির আলোকে, সেখানে একটি কোয়ান্টাম অপারেশনে ন্যূনতম সময় কতটা ব্যায় হয় তা হিসাব করা যায়। এই তত্ত্ব অনেকগুলো সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, যেখানে স্থান কালের জ্যামিতি থেকে সার্বিক হিসাব কষার ক্ষমতা সমগ্র মহাবিশ্বের কতটা তা জানা সম্ভব।

উদাহরণ হিসাবে এক কিলোগ্রাম সাধারণ বস্তুকে একটি ল্যাপটপ রূপে বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাই এর অধিকৃত স্থান হল এক লিটার। এর ব্যাটারী হল এর বস্তু নিজেই, যার শক্তি আসে আইনস্টাইনের বস্তু থেকে শক্তি রূপান্তরের সমীকরণ $E = mc^2$ থেকে। এই শক্তি যখন ব্যবহৃত হয় স্পিন ওলট করার কাজে, তখন এই ল্যাপটপটি সেকেন্ডে $১০^{৫১}$ অপারেশন সম্পন্ন করতে পারে। এই হিসাব কষার দ্রুততা কমতে থাকে শক্তির অবনয়নের সঙ্গে। এই হিসাব কষার মেশিনের ক্ষমতা কতটা তা নির্ধারণ করা যেতে পারে

তাপবলবিদ্যার সাহায্যে। এক কিলোগ্রাম বস্তু যখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এক লিটার আয়তনের মধ্যে, উৎপন্ন তাপ দাঁড়ায় এক বিলিয়ন কেলভিন। এখান থেকে যদি এনট্রপি হিসাব করা যায় উৎপন্ন তাপকে তাপমাত্রা দিয়ে ভাগ করে, তা হলে আণুষঙ্গিক তথ্যের পরিমাপ দাঁড়ায় $১০^{৩১}$ বিট। সার্বিক হিসাবে এই ল্যাপটপ-কম্পিউটার বস্তুটির মধ্যে তথ্য ধারণ করে মৌলিক কণিকাগুলোর অবস্থান ও গতির মাধ্যমে, যা তাপবলবিদ্যা ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়মে অনুমোদিত।

যখনই কণিকাগুলো পরস্পরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটায় তখন স্পিন ওলট বা ফ্লিপ ঘটে। এখানে কণিকাগুলো হচ্ছে চলৎ রাশি এবং এদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে কম্পিউটেশন অপারেশন, যেমন যোগ করা। প্রতিটি বিট সেকেন্ডে $১০^{২০}$ বার ফ্লিপ করতে পারে। ঘড়ির গতির সঙ্গে তুলনা করলে এটি দাঁড়ায় একশ গিগা গিগা হার্টস। গিগা হচ্ছে $১০^{৯}$। হিসাব করার এই গতি এত প্রচণ্ড যে কোনো কেন্দ্রীয় ঘড়ি দিয়ে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। একটি বিট ফ্লিপ করতে যে সময় নেয় তা হচ্ছে মোটামুটি একটি বিট থেকে পার্শবর্তী বিটে একটি সংকেত পৌছার সময়ের সমান। একটি সার্বিক ল্যাপটপ আসলে অনেকগুলো সারিবদ্ধ সমান্তরাল প্রসেসরের মতন। এই প্রসেসরগুলো পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করে স্বাধীন ভাবে এবং পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে তুলনামূলক ধীর গতিতে। আমরা যদি সাধারণ কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করি তা হলে দেখব সাধারণ প্রসেসর $১০^{৯}$ বার ফ্লিপ করে সেকেন্ডে এবং তথ্য ধারণ করে $১০^{১২}$ বিট। প্রচলিত কম্পিউটারে একটি মাত্র প্রসেসর থাকে।

একটি নিউক্লিয়ার বোমা এই অর্থে একটি কম্পিউটার যা বিপুল পরিমাণ হিসাব সম্পন্ন করে বিস্ফোরণ প্রক্রিয়ায়। এর ইনপুট বা অন্তর্গামী উপাত্ত হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় মৌলিক কণিকাগুলোর অবস্থান এবং আউটপুট, বা উৎপাদ হচ্ছে বিস্ফোরণ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বিকিরণ।

এক কিলোগ্রাম বস্তু যখন সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন তা বিশ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমার তূল্য। প্রশ্ন উঠবে এধরনের কম্পিউটার আমরা কতদিনে পেতে সক্ষম হব? স্বভাবতই এটা অনুমানের একটি বিষয়। তবে বিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন আরো দুই শতাব্দী পরে এ ধরনের কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ সাধ্য হয়ে উঠবে, যেখানে সূর্যের চেয়েও উত্তপ্ত প্লাজমা দশায় বস্তু হবে কম্পিউটারের ভিত্তি এবং মৌলিক কণিকা ও আয়তনগুলো মিথস্ক্রিয়া ঘটাবে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে। এ ধরনের ভবিষ্যৎ কম্পিউটারকে কার্যকর করতে অবশ্যই ব্যাপক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রয়োজন হবে, বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও বিচ্যুতি সংশোধনে।

এক খণ্ড বস্তুকে যদি আমরা কম্পিউটার ভাবতে পারি, তা হলে কৃষ্ণবিবর সবচেয়ে সঙ্কুচিত দশার এক কম্পিউটার ভিন্ন কিছু নয়। বস্তুভিত্তিক এমন কম্পিউটার যখন সঙ্কোচিত হতে থাকে, এর গঠনকারী কণিকাগুলোর মধ্যে মহাকর্ষ বল বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি অবস্থায় মহাকর্ষজনিত টান এত বৃদ্ধিপায় যে, সেখান থেকে কোনো বস্তু বাইরে আসতে পারে না। এই দশায় কৃষ্ণবিবরের আকার হয় সুয়ারচাইল্ড ব্যাসার্ধ, যা কৃষ্ণবিবরের মধ্যে আবদ্ধ মোট ভরের সঙ্গে আনুপাতিক।

এক কিলোগ্রাম কৃষ্ণবিবরের ব্যাসার্ধ হচ্ছে প্রায় $১০^{-২৭}$ মিটার। তুলনা করে আমরা দেখতে পারি যে একটি প্রোটনের ব্যাসার্ধ $১০^{-১৫}$ মিটার। সাধারণ এক কিলোগ্রাম বস্তু যখন তথ্য ধারণ করে এবং মহাকর্ষ বল দুর্বল ভাবে প্রভাব রাখে তখন মোট তথ্য ধারণ ক্ষমতা এতে ধারণকৃত কণিকার সঙ্গে আনুপাতিক। কিন্তু প্রচণ্ড ঘনিভূত দশা যখন সৃষ্টি হয়, যেমনটি ঘটে কৃষ্ণবিবরে, মহাকর্ষ বল অত্যধিক হয়ে উঠে। বস্তু কণিকাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই বিজড়িত অবস্থায় কৃষ্ণবিবরে তথ্য ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।

একটি কৃষ্ণ বিবরে মোট তথ্য ধারণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এর পৃষ্ঠ দেশে। ফলে, কৃষ্ণবিবরের তথ্য ধারণ ক্ষমতা এর আয়তনের আনুপাতিক না হয়ে এর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফলের আনুপাতিক। হকিং ও বেকেনস্টাইন হিসাব করে দেখিয়েছেন যে এককিলোগ্রাম একটি কৃষ্ণবিবরে ধারণকৃত তথ্যের পরিমাণ $১০^{১৬}$ যা অনেক কম, একই বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণবিবরে রূপান্তরিত হবার আগে মোট ধারণযোগ্য তথ্যের তুলনায়।

কিন্তু এর বিপরীতে একটি কৃষ্ণবিবর অনেক বেশি দ্রুত গতিতে তথ্য প্রসেস করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বিটকে ফ্লিপ করাতে সময় লাগে $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড। এই সময়টা হচ্ছে এই ব্লাকহোল কম্পিউটারের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলো পৌঁছবার সময়। ব্লাকহোল কম্পিউটার বিচ্ছিন্ন একক সত্ত্বা রূপে কাজ করে। সার্বিক ল্যাপটপে যেখানে সমান্তরাল প্রসেসিং চলে, ব্লাকহোল কম্পিউটারে সেখানে অনুক্রম বা সিরিজ প্রক্রিয়ায় প্রসেসিং চলে তথ্যের।

ব্লাকহোল কম্পিউটার কেমন করে কাজ করে?

ব্লাকহোল কম্পিউটারে তথ্যের ইনপুট বা অন্তর্গামী সংকেত নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। শুধু অন্তর্গামী বস্তু বা শক্তিকে সংকেত রূপে তথ্যে রূপান্তরিত করে ব্লাকহোলে পাঠিয়ে দিতে হবে। কৃষ্ণবিবর একে প্রসেস করবে এর প্রোগ্রাম অনুসারে। বস্তু যখন ঘটনাদিগন্ত অতিক্রম করে কৃষ্ণবিবরে প্রবেশ করবে তা অবশ্য অপ্রত্যাবর্তী রূপে হারিয়ে যাবে। কিন্তু দ্রুত কৃষ্ণবিবরে হারিয়ে যাবার পথে কণিকাগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করবে।

কৃষ্ণবিবরের কেন্দ্রে হারিয়ে যাবার আগে কোয়ান্টাম গ্রাভিটির নিয়মে অন্তর্গত বস্তুর ধারণকৃত তথ্য কীভাবে প্রসেস করা হবে তা এখনো অনুমোদিত। কারণ, কোয়ান্টাম গ্রাভিটির নিয়ম আমরা এখনো জানি না। ব্ল্যাকহোল কম্পিউটারের বহির্গামী তথ্য বা আউটপুট হকিং বিকিরণ রূপে আমরা পেতে পারি। একটি কৃষ্ণবিবর থেকে কী হারে হকিং বিকিরণ নির্গত হবে তা কৃষ্ণবিবরের তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক। এক কিলোগ্রাম বস্তুর কৃষ্ণবিবর এর সমস্ত বস্তু হারাবে, হকিং এর হিসাব অনুসারে, $১০^{-২১}$ সেকেন্ডে।

বড় কৃষ্ণবিবর যথা মৃত নক্ষত্র থেকে সৃষ্ট বা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত কৃষ্ণবিবর খুব ধীর গতিতে এর ভর হারায়। হকিং এর এই তাত্ত্বিক ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিবর ভবিষ্যতে সৃষ্টি করা যাবে হয়ত, কণিকা ত্বরক যন্ত্রে, যা সৃষ্ট হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উবে যাবে হকিং বিকিরণ নির্গত করে। এ ধরনের ব্লাকহোলকে কোন স্থির বস্তু না ভেবে ক্ষণস্থায়ী সমাবেশ বলা যেতে পারে বস্তুর, যা দ্রুততম গতিতে কম্পিউটেশন সম্পন্ন করবে।

একটি বড় প্রশ্ন

ব্লাকহোল কম্পিউটার নিয়ে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্ন তা হল হকিং বিকিরণ কি কম্পিউটেশন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দেবে? অথবা এটি একটি বিজ্ঞানের কল্পগল্প। স্বভাবতই এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব এখনি দেয়া যাবে না। কিন্তু হকিং সহ অনেক বিজ্ঞানী মনে করন যে বিকিরণ একটি অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাতকৃত রূপ তথ্যের, যা কৃষ্ণবিবরে মধ্যে প্রবেশ করে কৃষ্ণবিবর সৃষ্ট হবার পূর্বে। কৃষ্ণবিবর থেকে বস্তু যদিও বের হয়ে আসতে পারে না, এতে ধারণকৃত তথ্য বের হয়ে আসতে পারে। কীভাবে এটি ঘটে তা উদ্ঘাটন করা পদার্থবিজ্ঞানের গভীরতম চ্যালেঞ্জ এখন। ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যারি হরউইজ, প্রিন্সটনের ইনষ্টিটিউট ফর এ্যাডভান্সড্ স্টাডির জুয়ান ম্যালডাসেনা এবং আরো অনেকে একটি প্রক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন হকিং বিকিরণ থেকে তথ্য উদ্ধারের।

তথ্য উদ্ধারের কৌশলটি হল একটি পারস্পরিকতা, দুই বা ততধিক ব্যবস্থার মধ্যে। এটি একটি কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া, যেখানে স্থান ও কালের ব্যবধান নিয়েও দুই বা ততধিক ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখে।

টেলিপোর্টেশনের যে নীতি, সেখানে শর্ত হল দুটি কণিকা বিজরিত হতে হবে। একই প্রক্রিয়া কার্যকর হতে পারে কৃষ্ণবিবরের বেলায়। ঘটনাবিশেষে হাইসেনবার্গের বিধি অনুসরণ করে বিজরিত দুটি ফোটনের উদ্ভব হতে পারে শূন্য থেকে, অল্পক্ষণের জন্য। একটি ফোটন বাইরে চলে যায় এবং প্রতিকণিকা রূপে অন্য ফোটনটি শোষিত হয় কৃষ্ণবিবরে এবং হারিয়ে যায় কৃষ্ণবিবর সৃষ্টি কারী সিঙ্গুলার দশায় থাকা বস্তুর সঙ্গে। ধ্বংস প্রাপ্ত ফোটনটি পরিমাপের কাজ করে।

এই পরিমাপ প্রক্রিয়া এর আদি তথ্যকে মুছে দেয়। কিন্তু দুটি ফোটন যেহেতু পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত, এই হারিয়ে যাওয়া তথ্য স্থানান্তরিত হয় বহির্গামী ফোটনে। এইভাবে কৃষ্ণবিবর সৃষ্টিকারী বস্তুর মধ্যে ধারণকৃত তথ্য হকিং এর বিকিরণে সঞ্চারিত হয়।

ল্যাবরেটরীতে সংঘটিত টেলিপোর্টের প্রক্রিয়ার সঙ্গে কৃষ্ণবিবরে টেলিপোর্টের একটি পার্থক্য হল, এক্ষেত্রে পরিমাপ দ্বারা স্থানান্তরিত সংকেত থেকে পাঠোদ্ধার করার প্রয়োজন নেই। কারণ, কৃষ্ণবিবরে তথ্য ঝরে পাবার ফলে বিভিন্ন রূপ লাভ না করে একটি মাত্র রূপ লাভ করে। ফলে একজন পর্যবেক্ষক এই অনন্য ফল, পদার্থবিজ্ঞানের মূল সূত্র ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে পারে। অন্য একদল বিজ্ঞানী ধারণা দিয়েছে যে কৃষ্ণবিবর বহুমাত্রিক গঠনের নানা সামগ্রী দিয়ে তৈরি, যাকে বলা হয়, ব্রেনস। এই ধারণা এসেছে স্ট্রিং তত্ত্ব থেকে। কৃষ্ণবিবরে যে তথ্য পতিত হয় তা তরঙ্গ রূপে জমা হয় ব্রেনস এ এবং শেষ পর্যন্ত তা উদ্ধারযোগ্য। আর একটি ধারণা হল কৃষ্ণবিবর হচ্ছে স্ট্রিং এর বিশাল এক জাল। যে সব বস্তু এর মধ্যে পতিত হয় তা এখানে জমা থাকে কাপসা গোলক রূপে। কৃষ্ণবিবর থেকে যে হকিং বিকিরণ নির্গত হয় তা এই তথ্য বহন করে আনে। স্বভাবতই এ সবই নানা স্বজ্ঞামূলক ধারণা এবং এখনো অপ্রমাণিত। কিন্তু এই মুহূর্তে এটি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন যে, ব্লাকহোল থেকে তথ্য কেমন করে বেরিয়ে আসে।

সাইবার স্থান-কাল

কৃষ্ণবিবরে বৈশিষ্ট্যগুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে স্থান-কালের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। কৃষ্ণবিবরকে যদি আমরা কম্পিউটার রূপে ভাবতে পারি, স্থান-কালও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো লাভ করবে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা শর্ত দিচ্ছে যে, স্থানিক দূরত্ব ও কালিক ব্যবধান একই সঙ্গে সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অতিক্ষুদ্র কেলে স্থান-কাল নিরবচ্ছিন্নতা হারিয়ে বুদ্বুদ বা সূক্ষ্ম ফোম রূপে প্রতীয়মান হয়। কোনো স্থানিক বিস্তারে কী পরিমাণ তথ্য ধারণ করা যাবে তা নির্ভর করে কী আকারের বুদ্বুদ দিয়ে এই স্থান গঠিত।

পদার্থ বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ভেবেছেন এই ক্ষুদ্রতম ফোমের বিস্তার হচ্ছে প্লাঙ্কের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ $১০^{-৩৫}$ মিটার। এই দূরত্বে কোয়ান্টাম বিচলন এবং মহাকর্ষ ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। স্থানিক দূরত্ব ও কালিক বিরতি পরিমাপ করা এক ধরনের কম্পিউটেশন। ফলে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাধ্যবাধকতাগুলো আছে তা এখানেও কার্যকর। দেখা যাচ্ছে যে পদার্থবিজ্ঞানীদের আগের অনেক ধারণার তুলনায় পরিমাপ প্রক্রিয়া যে অনেক বেশি সমস্যা সঙ্কুল তা এখন স্পষ্ট হয়েছে।

স্থান-কালের মানচিত্র যদি আমরা পেতে চাই মহাবিশ্বের, তা হলে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সমাবেশ প্রয়োজন। এই জি.পি.এস. সিস্টেম দ্বারা সংকেত প্রেরণ করা হয় এবং সেই সংকেত পৌঁছার সময় মাপা হয়। দূরত্ব যত সূক্ষ্মভাবে আমরা পরিমাপ করতে চাইব তত বেশি সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ আমাদের বসাতে হবে। যত বেশি ঘনঘন সংকেত পাঠাতে চাইব তত বেশি পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হবে সংকেত পাঠাতে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধির ফলে সমগ্র ব্যবস্থাটি এক সময় কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। স্থান-কালকে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে ভাগ করা হয় স্থান-কালের মানচিত্র তৈরি করতে, তা হলে দেখা যায় বড় স্থানিক ব্যাপ্তির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কোষের আকার বড় আয়তনের জন্য বড় হতে হয়। এটা আমাদের গতানুগতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। কারণ, আমরা সাধারণভাবে বড় বস্তু বা ক্ষুদ্র বস্তু মাপতে একই স্কেল ব্যবহার করি।

সবচেয়ে অভিনব যে ধারণা আমাদের প্রয়োজন পড়ে মহাবিশ্বের স্থান-কালের মানচিত্র নির্মাণে, তা হল হলোগ্রাফির নীতির প্রয়োগ। এখানে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের তিন-মাত্রিক মহাবিশ্ব আসলে রহস্যজনকভাবে দুই-মাত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখায়। এর উৎস কোয়ান্টাম গ্রাভিটি, যার মূল সমাধান এখনও পাওয়া যায় নি। কিন্তু এটা বোধগম্য যে সূক্ষ্ম পরিমাপের যে কোয়ান্টাম সীমা তা অনুসরণ করতে গেলে এই হলোগ্রাফিক চিত্র এসে যায়।

আমাদের এই মহাবিশ্ব স্থানিক বিস্তারে অসীম হতে পারে। কিন্তু কালিক বিস্তারে তা সীমিত, যা পনেরো বিলিয়ন বছর বলে আমরা এখন জানি। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে এই মহাবিশ্ব সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অপারেশন সম্পন্ন করেছে এর জন্মলগ্ন থেকে, এবং এই সংখ্যাটি হল $১০^{১২৩}$। মহাবিশ্বে যে পরিমাণ শক্তি আছে তার পরিমাণ হল $১০^{৭২}$ জুল। কসমিক শক্তির ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে $১০^{-৯}$ জুল। মহাবিশ্বের জীবনকালে $১০^{১২৩}$ অপারেশন সম্পন্ন করতে সেকেন্ডে $১০^{১০৩}$ অপারেশন সংঘটিত করতে হয়েছে।

মহাবিশ্ব একটি কম্পিউটার রূপে কাজ করে, যার দুই ধরণের উপাংশ রয়েছে। একটি হল গতিশীল বস্তু, যা দ্রুত কম্পিউটেশনে অংশ নেয় সমান্তরাল প্রসেসিং-এ। অন্যটি হল ডার্কম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি যা ধীর গতিতে অনুক্রম প্রসেসিং এর মাধ্যমে কাজ করে।

সময় কি পেছনদিকে যেতে পারে?

সময়কে বর্ণনা করতে নানা উপমা ও উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যিক, দার্শনিক, এমনকি বিজ্ঞানীরাও। একটি অত্যন্ত প্রচলিত উপমা হল—সময় এক বহতা নদী। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস নদীর পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, এক নদীতে একবারের বেশি কেউ নামতে পারে না। কারণ, দ্বিতীয়বার নামার আগেই নদী বদলে যায়।

হেরাক্লিটাসের শিষ্য ক্রেটিলাস আরো একধাপ এগিয়ে বলেছেন : কোনো নদীতে একবারও কেউ নামতে পারে না। কারণ, নদীতে নামতে নামতে, নদী এবং যে সেখানে নামছে উভয়েই এত দ্রুত বদলে যাবে যে, নদীতে নামা মানেই ভিন্ন এক নদীতে ভিন্ন এক ব্যক্তির অবগাহন।

কিন্তু প্রবাহিত নদীর সঙ্গে সময়ের তুলনাই কি যথার্থ? সময় যদি প্রবাহ হয়, সেটা কিসের প্রবাহ? নদীর প্রবাহের বেলায় আমরা বলি—এতটা পানি প্রবাহিত হচ্ছে প্রতি একক সময়ে। সময়ের প্রবাহের বেলায় আমাদের তাহলে বলতে হবে, কত সেকেন্ড প্রবাহিত হচ্ছে প্রতি কিছুতে। কিন্তু সেই কিছুটা কী? আমরা জানি না। এছাড়া নদীতে মাছ স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে পারে। আমরা কি সময়ের প্রবাহের বিরুদ্ধে যেতে পারি?

সময় সম্পর্কে এ-ধরনের কূটতর্ক ও দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। কিন্তু স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য জবাব মেলেনি। বরং সময়ের প্রবাহ সম্পর্কে একটি প্রহেলিকা সৃষ্টি হয়ে আছে এখনো এবং তা সাধারণ্যে শুধু নয়, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। সময়-সম্পর্কে সবচেয়ে পরিমাপযোগ্য ও যোগাযোগসাধ্য ধারণা আমরা পাই পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। কিন্তু এখানেও দীর্ঘ সময় ধরে নানা রূপান্তর ও অগ্রগতিকে আত্মস্থ করে ধাপে ধাপে একটি সংজ্ঞার্থ সৃষ্টি হয়েছে সময়ের। আমরা এখানে একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চাইব সময় সম্পর্কে এবং তা হল : সময়ের তীর কি শুধু সম্মুখগামী অথবা সময় উল্টোদিকেও প্রবাহিত হতে পারে?

এই প্রশ্নের পটভূমি এবং এই প্রশ্নের জবাব সৃষ্টিতে কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, বোল্ডৎসম্যান, এডিংটন, আইনস্টাইন, হুইলার, ফাইনম্যান, হকিংস্ এবং আরো অনেকে অবদান রেখেছেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও

সময় সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উপলব্ধিও যে কুয়াশামুক্ত নয় তার একটি কারণ, পদার্থবিদ্যায় নানা সমীকরণে সময় যেভাবে ব্যবহৃত তার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক সময়ের একটি গরমিল পরিলক্ষিত এবং সেটি সময়ের গতি সম্পর্কে। পদার্থবিদ্যায় যেসব কার্যকারণের নিয়ম, সমরসীমা ও সূত্র রয়েছে তার সবগুলোতেই সময়ের বিপরীতমুখিতা গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ সময় যেমন সামনের দিকে যেতে পারে তেমনি পশ্চাৎগামী হতে পারে। প্রাকৃতিক ঘটনামালার বর্ণনায় যেসব সমীকরণে সময় ধনাত্মক রাশিরূপে উপস্থিত সেখানে যদি ঋণাত্মক রাশিরূপে সময়কে প্রতিস্থাপিত করা হয়, অর্থাৎ "t"-এর পরিবর্তে "−t" বসানো যায় তাহলে প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় সেই সমীকরণ সমভাবে প্রযোজ্য। সময়ের প্রবাহের এই উভয়মুখিতা যেমন গৃহীত নিউটনের সনাতনী গতিবিদ্যার সূত্রে, তেমনি গৃহীত আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এবং শ্রোডিংগার বা ডিরাকের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমীকরণে।

ধরা যাক কয়েকটি ঘটনার চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হল। যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে কোনো গ্রহের পর্যায়ক্রমিক গতি। পরস্পর থেকে দ্রুত অপসৃয়মাণ আয়নার মধ্যে আলোর প্রতিফলন। একটি নিউট্রন থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রিনোর সৃষ্টি। এই চলচ্চিত্রগুলোকে যদি উল্টোদিকে চালানো যায় তাহলে যেসব ঘটনার দৃশ্য আমরা দেখব তা আসলে ঘটনাগুলোর বিপরীত প্রবাহ। অর্থাৎ সময়কে উল্টোদিকে চলতে দিলে যা ঘটত তাই। এই উল্টো ঘটনাগুলো পদার্থবিদ্যার নিয়মে অনুমোদিত এবং এই অর্থে আমরা বলছি যে, সময়ের বিপরীত গতি পদার্থবিদ্যার নিয়মে গ্রহণীয়।

কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আছে, যা পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব অনুসারে অনুমোদিত হলেও বাস্তবে কখনও ঘটে না। যেমন টেবিলের ওপর থেকে পানিভর্তি একটি গ্লাস যদি পড়ে চুরমার হয়ে যায় এবং পানিগুলো ছড়িয়ে পড়ে মেঝেতে, এই ঘটনার বিপরীত গতি কি সম্ভব? আমরা কি ভাবতে পারি এমন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনার কথা যেখানে ভাঙা কাচের খণ্ডগুলো একত্র হয়ে টেবিলের ওপরে এসে আস্ত গ্লাসটি তৈরি করল? পানির ফোঁটাগুলো মেঝে থেকে উঠে এসে গ্লাসটি পূর্ণ করে দিল? এমনকি কাচ ভাঙার জন্য যে শব্দ ও তাপ সৃষ্টি হয়েছিল সেই শক্তি পুনরায় রূপান্তরিত হল টেবিলের উপর রাখা গ্লাসের স্থিতিশক্তিতে?

সূর্য থেকে আলো আর তাপ যে বিকীর্ণ হচ্ছে বাইরের দিকে—এর বিপরীত ঘটনাও আমরা দেখি না, অর্থাৎ তাপ আর আলোর তরঙ্গ চারদিক থেকে এসে কোনো নক্ষত্রে জমা হবে এবং ফিউশন বিক্রিয়া উল্টোদিকে ঘটবে এমনটি প্রত্যাশিত নয়।

বিটা-ভাঙন (beta decay)-এর বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ ইলেকট্রন, প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রিনো দূরপ্রান্ত থেকে অসম্ভব নির্ভুলতায় একটি নিউক্লিয়াসের দিকে

অভিসারী হয়ে নিউট্রনে রূপান্তরিত হবে এমন ঘটনাও আমরা প্রত্যক্ষ করি না। মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো যে ক্রমাগতভাবে ছুটে যাচ্ছে বাইরের দিকে এবং আমরা যে লোহিত অপসারণ (Red shift) দেখতে পাচ্ছি, তার বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ গ্যালাক্সিসমূহের ভেতরের দিকে ছুটে আসা এবং লোহিত অপসারণের পরিবর্তে নীল অপসারণ ঘটার এমন দৃষ্টান্ত আমরা এখনো জানি না।

ভাঙা গ্লাসের টুকরো থেকে আস্ত গ্লাস সৃষ্টি, নিউক্লিয়ার বিটাক্ষয়ের বিপরীত ঘটনা ঘটা, বিকিরণের অভিসারী হয়ে এর উৎসের মধ্যে শোষিত হয়ে যাওয়া অথবা মহাবিশ্বের সংকোচন—এসবই অঘটিত ও অঘটিতব্য বলে বিবেচিত হওয়ার অর্থ : সময়ের তীর শুধু সম্মুখদিকে যেতে পারে। এইসব পরিসংখ্যানমূলক ঘটনা যা অসংখ্য ছোট ছোট মৌলিক ঘটনার সমন্বয়ে একটি সম্ভাবনার নিয়মে ঘটে, সেখানে বিজ্ঞানীরা সময়ের সম্মুখ দিককে এর পশ্চাৎদিক থেকে পৃথক করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু একটি বৈপরীত্য বা বিভ্রাট এখানে আমরা লক্ষ্য করি সময়ের প্রকৃতি নিয়ে। পদার্থবিদ্যায় নীতিগতভাবে সময় যেখানে উভয়মুখিনতা প্রাপ্ত, পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'সময়ের নিত্যতা', বড় ব্যবস্থাগুলোতে আমরা সময়ের শুধু সম্মুখগতি প্রত্যক্ষ করছি।

অনেক দার্শনিক, এমনকি অনেক বিজ্ঞানীও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মানুষের মনে সময়ের একমুখিনতা সম্পর্কে একটি চেতনা কাজ করে বলেই আমরা শুধু সময়ের তীরকে সম্মুখদিকে যেতে দেখি। অর্থাৎ সময়ের শুধু সম্মুখমুখিনতা একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ পৃথিবী বা এই মহাবিশ্বের এমন অনেক ঘটনামালার ব্যাখ্যায় সময়ের সম্মুখপ্রবাহকে গ্রহণ করতে হয়েছে যেসব ঘটনার সময় মানুষের অস্তিত্ব ছিল না।

নিউটনের গতি-বলবিদ্যার সূত্রে সময়ের একমুখিনতার কোনো নির্দেশনা না থাকলেও সময়কে তিনি বর্ণনা করেছিলেন নিরবচ্ছিন্ন, নিরপেক্ষ, সমসত্ত্ব, অন্তহীন একমুখো একপ্রবাহরূপে। সনাতনী পদার্থবিদ্যার সীমানার মধ্যথেকে সময়ের একমুখিনতা সম্পর্কে সবচাইতে গভীর ও নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব আমরা পাই তাপ-গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে। অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী লুডভিগ বোল্ডৎসম্যান উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর সংখ্যায়নিক তাপ-গতিবিদ্যার ভিত্তিতে দেখাতে সক্ষম হন যে, বিশ্বের বিশৃঙ্খলা যেদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সময়ও সেইদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশ্বের বিশৃঙ্খলা যেহেতু সবসময় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সময়ও সবসময় সম্মুখদিকে যাচ্ছে। বোল্ডৎসম্যান অবশ্য এক বিপুল মহাবিশ্বের কথা ভেবেছিলেন যার কোনো কোনো এলাকায় বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেয়ে হয়তো সর্বোচ্চমান লাভ করেছে; এর ফলে বিশ্বের বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও বিশৃঙ্খলা কমতে শুরু করতে পারে। বোল্ডৎস্ম্যান প্রশ্ন রেখেছেন যে, সেইসব বিশেষ এলাকায় সময় কি পেছন দিকে যেতে পারে? অবশ্য বোল্ডৎস্ম্যান যাকে এক-একটি এলাকা

বলেছেন তা হয়তো আসলে কয়েকটি গ্যালাক্সি জুড়ে বিস্তৃত। কিন্তু সময়কে কি আমরা স্থানীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি? সময়ের দিক কি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন হতে পারে অথবা মহাবিশ্ব জুড়ে সর্বত্র অভিন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন একটিমাত্র প্রবাহ আছে সময়ের?

বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা অবশ্য দেখেছি যে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে সময় পরম এবং স্থান-নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু সময়ের দিক-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয়নি।

আমরা লক্ষ্য করব সময় শুধু সম্মুখদিকে ধাবিত হয়, পেছনদিকে যায় না—এই ধারণা তিনভাবে এসেছে। একটি হল আমাদের মনস্তাত্ত্বিক ধারণা সময়ের। যেহেতু আমরা শুধু অতীতকেই মনে রাখতে পারি, ভবিষ্যৎকে জানতে পারি না, সুতরাং জৈবিকভাবে সময়ের একটি সম্মুখগতির উপলব্ধি আমাদের মজ্জাগত।

সময়ের সম্মুখগতির অন্য ভিত্তি হল তাপ-গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র, যেখানে আমরা দেখেছি যে, তাপ উষ্ণ থেকে নিম্ন তাপমাত্রায় সহজাতভাবে প্রবাহিত হয়, সেইসঙ্গে বিশ্বের বিশৃঙ্খলা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির দিক হল সময়ের সম্মুখযাত্রার দিক।

সময়ের তীর যে শুধু সম্মুখদিকে যায় তার তৃতীয় উৎস কস্‌মোলজিকাল। আমরা এটি দেখেছি মহাবিশ্বের প্রসারমানতায়। মহাবিশ্ব যেহেতু অপ্রতিসম এর বিস্ফোরমানতার একমুখিনতায়, সময়ও একমুখী বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই এসে যায়। সময়ের সম্মুখগতির বা একমুখিনতার যে তিনটি ভিন্ন ভিত্তি, তা কি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? অর্থাৎ সময়ের এই তিনটি তীর কি সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন শর্ত থেকে নির্ধারিত? আসলে থার্মোডাইনামিক্স বা তাপ-গতিবিদ্যা সময়ের যে তীর নির্দেশ করছে তা থেকে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সময়ের দিক বিপরীত হতে পারে না। কারণ, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাবার চাই এবং খাবার খাওয়া মানেই শৃঙ্খলিত পরমাণুর বিন্যাস গ্রহণ করা এবং তা অবিন্যস্ত করে দেয়া। সুতরাং জীবন সেখানে সম্ভব নয় যেখানে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি না পেয়ে কমে যাচ্ছে।

মহাবিশ্বের প্রসারমান দশা সময়ের যে তীর নির্দেশ করছে তার সঙ্গে সময়ের থার্মোডাইনামিক্স তীর কেন অভিন্ন তারও একটি ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। যদি আমরা ধরে নিই যে, মহাবিশ্ব প্রসারিত হবার একপর্যায়ে আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে তখন কী অবস্থা হবে সময়ের তীরের? অবশ্য মহাবিশ্ব আবার সংকুচিত হতে শুরু করবে কি না তা নির্ভর করে মহাবিশ্বের মোট বস্তু বা ভরের ওপরে। অদৃশ্য কৃষ্ণবিবরগুলোতে কতটা বস্তু আছে তা আমরা এখনো জানি না। যদি মহাবিশ্ব সংকুচিত হবার মতোন ভর অদৃশ্যভাবে থেকেও থাকে এবং সেই ভরের

পারস্পরিক মহাকর্ষে গ্যালাক্সিগুলো ভেতর দিকে আসতে শুরু করে তখন সময় কি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে?

মহাবিশ্ব সংকুচিত হবার আগে স্বভাবতই এর প্রসারমানতা থামবে এবং অত্যন্ত ধীরগতিতে সংকোচন শুরু হবার আগে এত সময় পার হয়ে যাবে যে, সমস্ত নক্ষত্র নিভে যাবে, প্রোটন ও নিউট্রনগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিকিরণে রূপান্তরিত হবে। মহাবিশ্বের বিশৃঙ্খলা চরমে পৌছবে। সেই চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মহাবিশ্ব শৃঙ্খলার দিকে যেতে পারে অথবা স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে বিশৃঙ্খলার পরিবর্তন না ঘটিয়ে। প্রথম ক্ষেত্রে থার্মোডাইনামিক্স সময়ের তীর বিপরীত দিকে ধাবিত হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সময় স্তব্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু এসব কথা বলার সময় আমাদের একটু সাবধান হতে হবে। আমরা কি মহাবিশ্বের ঘটনামালার বাইরে সময়ের কোনো পরম প্রসঙ্গ-কাঠামোর কথা ভাবতে পারি যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে যাবার কথা বলছি? এটা কি মনস্তাত্ত্বিক সময়? আসলে ঘটনামালার বাইরে সময়ের কোনো অস্তিত্ব নেই—অন্তত পদার্থবিদ্যার জগতে। অন্যদিকে একটি সংকোচনশীল বিশ্বে কোনো জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কারণ, আমরা বলেছি বিশৃঙ্খলা বা 'এন্ট্রপি' বৃদ্ধি জীবনের জন্য অপরিহার্য। মনস্তাত্ত্বিক সময় অবশ্যই থার্মোডাইনামিক্স সময়ের সঙ্গে একই দিকে প্রবাহিত হতে হবে এবং আমরা যে থার্মোডাইনামিক্স সময়ের তীরকে বিশ্বের প্রসারমানতার সঙ্গে একই দিকে দেখতে পাই, তারও কারণ একমাত্র প্রসারমান বিশ্বেই মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

আমরা এখানে একটি যৌক্তিক বিভ্রাট দেখতে পাচ্ছি। মহাবিশ্বের সংকোচন যদি শুরু হয় বর্তমানের প্রসারমানতা থেমে যাবার পর, কে তা প্রত্যক্ষ করবে মহাবিশ্বের বাইরে থেকে? মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ 'এখন'থামল, 'এরপর' সংকোচন শুরু হল—এমন উক্তি যদি আমরা করি, প্রশ্ন উঠবে 'এখন', 'এরপর' এসব শব্দের অর্থ কী?

এই সমস্যার একটি যৌক্তিক সমাধান মেলে যদি আমরা বিশ্বকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেখি—যেমন দুটো গ্যালাক্সি, যার একটিতে সময় সম্মুখদিকে যাচ্ছে এবং অন্যটিতে পেছন দিকে। প্রতি গ্যালাক্সির অধিবাসীই তার নিজের সময়কে মনে করবে যে, তা সম্মুখদিকে যাচ্ছে; কিন্তু অন্য গ্যালাক্সির সময়কে দেখবে যে তা পেছনদিকে যাচ্ছে। এই গ্যালাক্সি দুটো হবে পরস্পরের প্রতিবিম্বসরূপ। প্রত্যেকের কাছেই মনে হবে অন্য গ্যালাক্সি তার পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সময় কোনো পরম রাশি নয়, ব্যতিষঙ্গ ব্যাপার। যেমন ওপর ও নিচ, ডান ও বাম, বা ছোট ও বড়। যদি আমরা সমগ্র মহাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের বিপরীত গতির কথা বলি তা যেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে, তেমনি অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি বলি মহাবিশ্বের উল্টো প্রতিবিম্বের কথা। অর্থহীন বলছি, কারণ

মহাবিশ্ব বলতে যে সামগ্রিকতাকে বোঝায় তার বাইরে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে মহাবিশ্বের উল্টো প্রতিবিম্বকে যাচাই করা যাবে নিরপেক্ষভাবে। বিশ্বের কোনো অংশ যদি সংকুচিত হয় এবং বিশৃঙ্খলা কমতে থাকে তাহলেও এর কোনো অধিবাসীর নিজের অভিজ্ঞতার সময় বিপরীত দিকে যাবে না; কারণ তার আপেক্ষিক উপলব্ধিতে সবকিছু উল্টো করে দেখার কারণে উল্টো ব্যাপারগুলো সোজা মনে হবে এবং তার কাছে সময় সামনের দিকেই প্রবাহিত হবে। সবাই যদিও এই ধরনের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হবে না, কিন্তু দার্শনিক রিচেনবাকের ধারণা সময়ের পশ্চাৎগামিতা শুধু তখনই অর্থ বহন করে যখন বিশ্বের যে-অংশের সময় অন্য অংশের তুলনায় উল্টোমুখী।

একটি সমস্যা অবশ্য এখানেও থেকে যায়। আয়নাতে কোনো কায়ার উল্টো ছবি দেখা সহজ, কিন্তু একটি গ্যালাক্সিতে যদি সময় উল্টে যায় তাহলে অন্য গ্যালাক্সি থেকে কীভাবে সেই গ্যালাক্সির ঘটনাপ্রবাহ দৃশ্যমান হবে? এই উল্টো সময়ের গ্যালাক্সিতে আলো সামনের দিকে বিকীর্ণ না হয়ে পেছনদিকে চলতে থাকবে এবং উৎসতে শোষিত হয়ে যাবে। ফলে এই বিপরীত সময়ের দুই গ্যালাক্সি পরস্পরের কাছে অদৃশ্য পড়বে। যদি ধরেও নিই কোনোভাবে এক গ্যালাক্সির অধিবাসী তার বিপরীতমুখী সময়ের গ্যালাক্সির অধিবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, সেই ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে তা ভুলে যাবে। কারণ, ঘটনাটি তার কাছে অতীতে না হয়ে ভবিষ্যতের হয়ে পড়বে। নরবার্ট উইনারের (Norbert Wienner) মতে, বিপরীতমুখী সময়ের দুই এলাকায় অবস্থিত বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ সম্ভব নয়। কারো কারো মতে, সময়ের তীর যাদের মধ্যে পরস্পরের বিপরীত তাদের কোনো মিথস্ক্রিয়াই ঘটতে পারে না।

এই চিত্র অনুসারে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারমান ও সংকোচনশীল একক মহাবিশ্বের পরিবর্তে আমরা বিচ্ছিন্ন বিশ্বের কথা ভাবতে পারি, যার প্রতিটিতে সময়ের মোড়ানো কার্পেট পাক খুলছে একই সঙ্গে। কিন্তু একটির পাক খুলছে সামনের দিকে এবং অন্যটির পেছনের দিকে। কিন্তু 'একই সঙ্গে' কথাটা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে জানি। আমরা বিজ্ঞানের অনেক কল্পগল্পে ব্যক্তিমানুষের কাহিনী বর্ণিত হতে দেখি। কিন্তু কোনো গল্পই শেষপর্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দেহ ও মন যদি তার বাইরের জগতের সময়ের তীরের বিপরীতগামী হয়, জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই সে ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ সে যদি তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে যায় তবে সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। শব্দ বা আলোর তরঙ্গগুলো উৎসের দিকে যাচ্ছে বলে বাইরের জগতের কিছুই তার কাছে পৌঁছবে না।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, থার্মোডাইনামিকভাবে বা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির হিসাব থেকে সময়ের তীর নির্ধারণের যে ভিত্তি অথবা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণতার ওপরে নির্ভর করে সময়ের যে দিক-নির্ধারণ—তাকে বিপরীতমুখী করার নানা সমস্যা আছে, যৌক্তিক ও বাস্তবিক। বস্তুত বাপকভিত্তিক বা ম্যাক্রোস্কোপিক ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে সময়ের পশ্চাতমুখিনতার ধারণা যেসব সমস্যার সৃষ্টি করে তা মনস্তাত্ত্বিকভাবে সমাধান করা বা ঐকমত্য সৃষ্টি করা বেশ দুঃসাধ্য। কিন্তু সম্ভবত বস্তুকণিকার জগতে অর্থাৎ মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু এলাকায় সময়ের বিপরীত গতির কথা ভাবা যেতে পারে পদার্থবিদ্যার ভাষায়।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড পি. ফাইনম্যান, ১৯৪৮ সালে একটি গাণিতিক চিত্র তুলে ধরেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যায়, যেখানে তিনি প্রতি-কণিকাকে দেখিয়েছেন প্রাসঙ্গিক কণিকার সময়ের পেছনদিকে চলা রূপে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক কণিকারই প্রতি-কণিকা আছে এবং প্রতি-কণিকা নিয়ে যদি কোনো বস্তু তৈরি হয় তাহলে কণিকা দিয়ে তৈরি বস্তুর মতোই এর চেহারা ও বৈশিষ্ট্য হবে। আমরা প্রতি-কণিকা দিয়ে তৈরি প্রতি-অণু ও প্রতি-পরমাণু শুধু নয়, প্রতি-অণুর সমন্বয়ে প্রতি-মানুষের কথাও ভাবতে পারি, যা কোনো প্রতি-গ্যালাক্সির কোনো প্রতি-গ্রহে বাস করবে। কিন্তু কোনো মানুষ যদি প্রতি-মানুষের সংস্পর্শে আসে, তাহলে উভয়েই ধ্বংস হয়ে রূপান্তরিত হবে শক্তিতে।

যা হোক, প্রতি-গ্যালাক্সি বা প্রতি-মানুষের গল্প বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী মনে হলেও, ইলেকট্রনের প্রতি-কণিকা পজিট্রনের অস্তিত্বের তত্ত্ব প্রমাণ করে ১৯৩২ সালে এবং তিরাক ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যখন কোনো কণিকা ও এর প্রতি-কণিকা যুগলরূপে সৃষ্টি হয়, যেমন ইলেকট্রন ও পজিট্রন, তখন পজিট্রনটি অন্য কোনো ইলেকট্রনের সংস্পর্শে এসে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড টিকে থাকতে পারে। কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গামা-রশ্মিতে রূপান্তরিত হবার আগে, পজিট্রন কিছুটা পথ অতিক্রম করে। আমরা এ ঘটনায় তিনটি কণিকা দেখতে পাই—দুটো ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন। কিন্তু আমরা যাকে পজিট্রনরূপে দেখি তা আসলে ইলেকট্রনের সময়ের বিপরীতদিকে গতি, ফাইনম্যানের চিত্র অনুসারে।

পর্যবেক্ষকরূপে আমাদের সময় সম্মুখগামী বলে আমরা উল্টোদিকে চলমান ইলেকট্রনকে পজিট্রনরূপে দেখি। আমরা মনে করি যে, পজিট্রন যখন একটি ইলেকট্রনকে আঘাত করে তখন তা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এটি আসলে সেই অদি ইলেকট্রন, যা এর যাত্রাকে পুনরায় সময়ের সম্মুখদিকে চালিত করছে। আসলে সম্পূর্ণ ঘটনাটাই হচ্ছে একটি ইলেকট্রনের ওঠানামার যাত্রা যা কখনো সময়ের সম্মুখদিকে, কখনো সময়ের পেছ দিকে চলছে। স্থানকালের মধ্যে ইলেকট্রনের এই আঁকাবাঁকা পথকে আমরা পজিট্রনের সম্মুখযাত্রারূপে দেখছি আমাদের সময়ের কাঠামোতে।

ফাইনম্যান তাঁর নোবেল-বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন হুইলারের কাছ থেকে। হুইলার একদিন টেলিফোনে করে ফাইনম্যানকে বলেছিলেন—তিনি জানেন, কেন সব ইলেকট্রনের একই ভর ও একই চার্জ। ফাইনম্যান জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন? হুইলার বললেন—কারণ ওগুলো সবই একই ইলেকট্রন বলে। ফাইনম্যান এই উক্তির গভীর তাৎপর্য উদ্ধার করেন ৮ বছর ধরে গবেষণা করে।

পজিট্রনকে ইলেকট্রনের সময়ের পেছনদিকে চলা বলে যে-ব্যাখ্যা ফাইনম্যান দিয়েছিলেন তা অনেকেই নিছক হিসাবের একটি কৌশল বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন কিছু বিস্ময়কর আবিষ্কার ফাইনম্যানের ব্যাখ্যাকে বাস্তবসম্মত বলে গ্রহণ করতে সমর্থন জানিয়েছেন। এই সমর্থনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি হল—চার্জ, প্যারিটি ও সময়ের সমন্বিত প্রতিসাম্যের তত্ত্ব। সংক্ষেপে আমরা একে CPT উপপাদ্য বলতে পারি। C এখানে বৈদ্যুতিক চার্জ বোঝায়—ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক। P বোঝায় প্যারিটি, অর্থাৎ আয়নার বাম অথবা ডানের প্রতিবিম্ব। T সময় বোঝায়—সম্মুখগামী অথবা পশ্চাৎগামী।

আমরা জানি পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রতিসাম্যের ভক্ত। আসলে পদার্থবিদ্যার নিত্যতার নিয়মগুলোর আড়ালে রয়েছে আনুষঙ্গিক প্রতিসাম্যের নীতি। একটি প্রতিসাম্যের নীতি হল—কোনো কণিকার বৈদ্যুতিক চার্জকে যদি উল্টো করে দেয়া যায়, অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জকে ঋণাত্মক মান দেয়া যায়, তাহলে তা প্রকৃতিতে অনুমোদিত। অর্থাৎ একটি পাথরের মধ্যে যতগুলো কণিকা আছে তাদের চার্জকে যদি উল্টো মান দিই তাহলে আমরা আগের মতোন পাথরই পাব। একে আমরা বলি চার্জের নিত্যতা বা প্রতিসাম্য। এভাবে চার্জের মান উল্টো করে দিয়ে আমরা যে পদার্থ পাব তা অবশ্য হবে প্রতি-পদার্থ। কিন্তু পদার্থ যে-কারণে বাস্তবে থাকতে পারে সেই কারণে প্রতি-পদার্থও প্রকৃতিতে থাকতে পারে। এরা সন্নিধ্যে এলে অবশ্য পরস্পরকে ধ্বংস করে বিকিরণ দেবে।

একইভাবে আর-একটি নিত্যতার বা প্রতিসাম্যের নিয়ম বিশ্বজুড়ে প্রযোজ্য বলে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, তা হল—কোনো বস্তু বা কণিকা যদি একটি আয়নার সামনে রাখা হয়, তাহলে এর যে বিম্ব আমরা দেখব আয়নাতে, তা প্রকৃতিতে পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিটি কণিকার বিন্যাস বা তরঙ্গের আকৃতি আয়নাতে যেভাবে রূপ নেয় তা বাস্তবে লাভ করা যাবে। প্রকৃতির কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই এই দুইয়ের মধ্যে। কিন্তু দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কণিকার বেলায় এই প্যারিটি ভেঙে যায়। অর্থাৎ কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যা দর্পণ প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে ঘটা উচিত না। ইয়ং এবং লি এই প্যারিটি ভাঙার নিয়ম আবিষ্কারের জন্য ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীমহলে এটা ছিল বিস্ময়কর ও হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা। বিশ্বজগতের

অন্তর্নিহিত প্রতিসাম্যের নিয়ম ও আনুষঙ্গিক সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের স্বপ্নও যেন প্যারিটি ভাঙার সঙ্গে ম্লান হয়ে গেল।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা দ্রুত এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পাবার পথ উদ্ভাবন করলেন। পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন যে, প্যারিটি ভাঙার এই ঘটনাকে যদি কাল্পনিক এক বিশেষ আয়নায় প্রতিফলিত করা যায়, অর্থাৎ CP আয়নায়, তাহলে প্রতিসাম্য বজায় থাকে। CP আয়নার অর্থ হল, আয়নাতে প্রতিফলনের ফলে যে পরিবর্তন ঘটল তার সঙ্গে চার্জকেও যদি উল্টো করে দেওয়া যায়, তাহলে প্রকৃতিতে সেই ঘটনা অনুমোদিত হয়।

কোনো ঘটনা ও CP প্রতিসাম্যের কোনো গ্যালাক্সিতে গিয়ে দেখি আমাদের মহাশূন্যযান হঠাৎ ধ্বংস হয়ে বিকিরণে রূপ নিল, তাহলে বুঝতে পারব যে, ঐ গ্যালাক্সি প্রতি-গ্যালাক্সি ছিল। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা CP প্রতিসাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে করতেই প্রিন্সটনের কিছু পদার্থবিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন যে, কিছু দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই প্রতিসাম্যের নিয়মও ভেঙে যায়।

পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে তখন শেষ অবলম্বন থাকল সময়কে অন্তর্ভুক্ত করার, একটি সার্বিক প্রতিসাম্যের নিয়ম পাবার জন্য। এই নতুন প্রতিসাম্য বা নিত্যতার নীতিটি হল CPT প্রতিসাম্য। এখানে CPT এমন এক আয়নার মতো কাজ করে যেখানে চার্জ, প্যারিটি ও সময়—সবগুলোকেই উল্টে দেয়া যায়।

এই CPT উদ্ভাবন শুধু-যে পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রতিসাম্যকে ভালোবাসার কারণে ঘটেছে তা নয়। আসলে দেখানো যায় যে, CPT উপপাদ্য সত্য না হলে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত এখন যে, বিজ্ঞানীরা একে বর্জন করার কথা ভাবতে পারেন না। সুতরাং CPT প্রতিসাম্য পরোক্ষভাবে প্রমাণিত আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ভিত্তিতে। এখন কোথাও যদি CP প্রতিসাম্য ভেঙে যায় তাহলে সেখানে সময়ের প্রতিসাম্যও ভেঙে যাবে এবং সময় সেখানে শুধু একদিকে প্রবাহিত হবে। অবশ্য সময়কে অন্তর্ভুক্ত না করে CP প্রতিসাম্যকে বাঁচানো যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি পঞ্চম বলকে আনতে হবে যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

CPT প্রতিসাম্যকে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত বলে যদি গ্রহণ করি, তাহলে আমরা দেখছি যে, মহাবিশ্বে কোথাও যদি প্রতি-পদার্থ থেকে থাকে তাহলে সেখানে চার্জ, প্যারিটি ও সময় সবই আমাদের জগতের তুলনায় উল্টো। সুতরাং সেই প্রতি-পদার্থের জগতে সময় বিপরীতদিকে প্রবাহিত। সময়ের বিপরীত গতি তাই বিশ্বজনীন না হোক, মহাবিশ্বের কোথাও কোথাও হতে পারে, অন্তত ক্ষুদ্র কণিকার জগতে তো বটেই। এমন ভাবনা নিছক দার্শনিক চিন্তা বা বিজ্ঞানের কল্পগল্পের ব্যাপার নয়, পদার্থবিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয়রূপে বাস্তবতাপ্রাপ্ত।

সময় কোথাও-না-কোথাও বিপরীতদিকে প্রবাহিত হতে পারে একথা মেনে নিলেও আরো একটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। সময় যেদিকেই প্রবাহিত হোক, অনাগত সময় কি নদীর মতো, যার উৎস থেকে প্রান্ত পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে আছে, শুধু উন্মোচিত হচ্ছে? অর্থাৎ সময় কি অনিবার্য ও পূর্বনির্ধারিত? অথবা সময় সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন অনিশ্চিত এক রাশি যা ক্রমাগত উন্মোচিত হচ্ছে না, সৃষ্টি হচ্ছে? অনাগত ভবিষ্যৎ না-আসা পর্যন্ত সে-সম্পর্কে জানার কিছু নেই, জানা সম্ভব নয়। সময় সেক্ষেত্রে গভীরতর অর্থে গতিশীল, অভিনব স্বয়ম্ভূ। যে-সময় এখনো আসেনি এবং সম্পূর্ণ অভিনবরূপেই আসবে, তাকে কি জানা সম্ভব?

সময়ের শুরু নিয়ে নতুন প্রশ্ন : স্ট্রিং-তত্ত্বের আলোকে

সময় কি সীমিত না অনন্ত? অর্থাৎ মহাবিশ্ব—এর স্থান-কাল নিয়ে চিরদিন টিকে আছে অথবা এর একটি নির্দিষ্ট জন্মলগ্ন আছে? এ প্রশ্ন নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি নিয়ে গভীর সব প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ভাবনা থেকেই। আমরা কে? আমরা কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাচ্ছি? এ প্রশ্নগুলো আবর্তিত আমাদের নিজেদের জীবনকে ঘিরে, ফলে কিছুটা সাবজেক্টিভ বা বিষয়গত। কিন্তু বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে যে-প্রশ্ন তা অবজেক্টিভ বা নৈর্ব্যক্তিক হবার প্রয়াস পায়। মহাবিশ্ব নিয়ে ধর্মীয় ভাবনা, দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান—সবই মানুষের কীর্তি ও পরস্পর সম্পর্কিত হলেও এখানে একটি উত্তরণ আছে পদ্ধতিগত। এজন্যেই দার্শনিক ওগুস্ত কোঁৎ সভ্যতাকে তিনটি ধাপে ভাগ করেছেন। প্রথমটি ধর্মের যুগ, দ্বিতীয়টি দর্শনের যুগ ও শেষটি বিজ্ঞানের যুগ রূপে।

আমরা বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে পারি। কোনো বিশেষ প্রশ্ন ধর্মীয়, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকরূপ লাভ করবে তা নির্ভর করে জ্ঞানের অগ্রগতির স্তর এবং পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতার ওপরে। অনেক প্রশ্নই যা একসময় বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রাহ্য হয়নি, কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে সে প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব ছিল না, তা কালক্রমে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে উত্তীর্ণ হয়। সময়ের কি কোনো শুরু আছে অথবা সময় চিরন্তন? এটিও তেমন একটি প্রশ্ন। আমরা লক্ষ্য করব—এ প্রশ্নের জবাব পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে দোলকের অবস্থানের মতো।

অ্যারিস্টোটলের ধারণা ছিল মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই। এবং সেটা তাঁর প্রদত্ত এই নীতির ভিত্তিতে যে, শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। মহাবিশ্ব যেহেতু বাস্তবে দৃশ্যমান এবং তা সম্পূর্ণ নেই থেকে সৃষ্ট হতে পারে না, ফলে মহাবিশ্ব সব সময়েই ছিল। এ্যারিস্টোটলের ধারণার বিপরীতে খ্রিস্টান ধর্মযাজক অগাস্টিনের অভিমত হল—সৃষ্টিকর্তার অবস্থান স্থান-কালের সীমানার বাইরে। তিনি স্থান ও কালকে সৃষ্টি করেছেন মহাবিশ্বের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতোই। অগাস্টিনকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল : সৃষ্টিকর্তা কী করছিলেন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি

করার আগে? এর জবাবে তিনি বলেছেন : সময়ও তিনি সৃষ্টি করেন বলে, এর আগে কিছুই ছিল না।

আমরা লক্ষ্য করি যে, গ্যালিলিও এবং নিউটন সময়কে পরিমাপযোগ্য ভৌত রাশিরূপে পদার্থবিজ্ঞানের নানা সমীকরণে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আগে সময়ের ধারণা বলতে গেলে অস্পষ্ট ছিল। নিউটন তাঁর সনাতনী পদার্থবিদ্যায় সময়কে প্রান্তহীন, অসীম ধরে নিয়েছিলেন গ্রিক দার্শনিকদের ধারণার আলোকে। তাঁর বিশ্বধারণায় সময়ের কোনো শুরু নেই অথবা শেষ। সময় নিষ্ক্রিয়, নিরবচ্ছিন্ন ও সমসত্ত্ব। সময় কোনো বস্তু বা ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সময়কে যে-কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় সীমাহীনভাবে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব মহাবিশ্বের বয়স ও সময়ের বিস্তারকে সীমিত করে দেয়। এই তত্ত্বের অনিবার্য ফলরূপে আমরা দেখি যে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই অতি-সংকুচিত এক বিন্দুতে ছিল এবং পনেরো বিলিয়ন বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণ বা বিগব্যাঙ্গ-এর ভিতর দিয়ে উদ্ভব ঘটেছে মহাবিশ্বের—এর স্থান ও কালের।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটির একটি ছবি পাবার জন্য আমরা আমাদের বংশানুক্রমিক ধারাকে পিছনদিকে প্রসারিত করে আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ, এবং তারও আগে প্রাণীরা যেখানে আমাদের উদ্‌বংশ সেখানে, এবং এর চেয়েও দূর অতীত, যেখানে জড় থেকে জীবনের উদ্ভব, সেখানে পৌঁছতে পারি। সময়কে যদি আরো পেছনদিকে নিয়ে যাই, তাহলে আদি বিশ্ব যেখানে বস্তুর প্রথম উদ্ভব, সেই সময়ে গিয়ে পৌঁছবে। এভাবে কি আমরা সীমাহীনভাবে অতীতের দিকে যেতে পারি? অথবা একটা সময়ে গিয়ে অতীতের শেষপ্রান্ত দেখতে পাব? মহাবিশ্ব কি আমাদের জীবনের মতোই জন্মমৃত্যুর সীমানায় আবদ্ধ? আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব আধুনিক কসমোলোজি বা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বকে সেই সিদ্ধান্তেই নিয়ে যায়।

আমরা দেখেছি এই তত্ত্ব অনুসারে স্থান ও কাল নিষ্ক্রিয় ও অবিচল নয়, যেন নমনীয় স্থিতিস্থাপক রাবারের মতোন। বড় ক্ষেলে দেখলে স্থান পরিবর্তী, যা প্রসারিত বা সংকুচিত হয় এতে ধারণকৃত বস্তুকে নিয়ে, যেমনটি ঘটে জোয়ারে ভাসমান বস্তুর ক্ষেত্রে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৯২০ সালে এটা পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে, দূরের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এবং পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে যে গ্যালাক্সি যত দূরে তত দ্রুত তা অপসৃত হচ্ছে।

স্টিফেন্স হকিং ও রজার পেনরোজ ১৯৬০ সালে এটা দেখিয়েছেন যে সময়কে পেছনদিকে সীমাহীনভাবে প্রসারিত করা যায় না। সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ইতিহাসকে পেছনদিকে নিতে থাকলে একটা সময়ে এসে আমরা পৌঁছি যেখানে সব গ্যালাক্সি পরস্পরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই অনন্য অবস্থাকে গণিতের ভাষায় সিঙ্গুলারিটি (Singularity) বলা হয়, যেখানে বস্তুর

ঘনত্ব, তাপমাত্রা, স্থানের বক্রতা— সবই অসীম হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, কোনো বর্তুলাকার স্থানের ক্ষেত্রে হয়তো পরিমাপ করা হয় ব্যাসার্ধের ব্যস্তানুপাত দিয়ে। সিঙ্গুলারিটি হচ্ছে সেই মহাবিপর্যয় যার পেছনে আমরা মহাবিশ্বের কোনো অতীত খুঁজে পাই না আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের ভিত্তিতে।

এখানে একটি সমস্যা অবশ্য দেখা দেয়। মহাবিস্ফোরণ বা বিগব্যাঙ-এর খুব কাছে যখন আমরা পৌঁছে যাই তখন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের শর্তগুলো প্রয়োগযোগ্য থাকে না। কারণ, চরম ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও বক্রতা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সেখানে পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বস্তুত পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো এমন চরম অবস্থায় পরীক্ষিত নয় বলে আমরা নির্বিঘ্নে এইসব নিয়ম প্রয়োগ করতে পারি না। এই অবস্থায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে বলে অনেক পদার্থবিজ্ঞানী মনে করেন।

বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানে যে দুটি তত্ত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বিশ্বজগতের রহস্যোদ্‌ঘাটনে, তা হল আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। কিন্তু এদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি এখনো সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে এই দুই তত্ত্বই এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যৌক্তিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে ও বস্তুজগতের ঘটনামালার ব্যাখ্যা প্রদানের সাফল্যে যে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন এদের মধ্যে সমন্বয় ও পরিপূরকতা থাকতেই হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি যে তত্ত্বটি গভীরভাবে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বরূপে স্ট্রিং-তত্ত্বের উদ্ভব।

এই স্ট্রিং-তত্ত্ব মৌলিক কণিকার পরিবর্তে অতিসূক্ষ্ম তন্তুকে বস্তুজগতের গঠনকারী উপাদানরূপে কল্পনা করেছে। একটি ভায়োলিনের তারে যেমন নানা সুর ঝংকৃত হতে পারে, এই কোয়ান্টাম স্ট্রিং তেমনি নানা কম্পন সৃষ্টির ভেতর দিয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন বল উৎপন্ন করে ও এদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে। প্রকৃতির চারটি বল, যথা মহাকর্ষ বল, তড়িৎ-চুম্বক বল, নিউক্লীয় প্রবল বল ও নিউক্লীয় দুর্বল বলকে সমন্বিত করার যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন, এবং আংশিকভাবে সফল হয়েছেন তা স্ট্রিং-তত্ত্বের মাধ্যমে সম্ভব, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে। এই তত্ত্ব ন্যূনতম একটি কোয়ান্টাম দৈর্ঘ্যকে যুক্ত করেছে প্রকৃতির অন্যান্য পরম ধ্রুবক, যথা আলোর গতি, প্লাঙ্কের ধ্রুবকের সঙ্গে। এর ফলে মহাবিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে মহাবিশ্বের সূচনা—এই ধারণাকে শেষ কথা বলে মনে করা হচ্ছে না।

মহাবিস্ফোরণের ঘটনা এখনো সত্য বলে গৃহীত। কিন্তু একে অসীম ঘনত্বের মুহূর্ত এবং স্থান-কালের জন্মলগ্নরূপে ধরা হচ্ছে না। মহাবিশ্বের অস্তিত্ব এই মহাবিস্ফোরণ মুহূর্তের আগেও থাকতে পারে। স্ট্রিং-তত্ত্বের প্রতিসাম্যের নিয়ম অনুসারে আমরা দেখব সময়ের কোনো শুরু নেই অথবা কোনো শেষ। মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটে থাকতে পারে শূন্য থেকে এবং তা মহাবিস্ফোরণের দশায় মহাবিশ্বকে

নিয়ে যেতে পারে। অথবা এমন হতে পারে যে মহাবিশ্ব অনেকগুলো জন্মমৃত্যুর ভেতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বর্তমান মহাবিশ্বের যে চিত্র তার সূচনা-কাজ করেছে মহাবিস্ফোরণ।

মহাবিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে মহাবিশ্বের উদ্ভব—এই ধারণার একটি অপরিহার্য পরিণতি যে সিঙ্গুলারিটি, তা একটি সমস্যা সৃষ্টি করে— বড় স্কেলে মহাবিশ্বের যে সমসত্ত্বতা ও দিকনিরপেক্ষতা তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে। মহাবিশ্বকে সবদিকে ও সব দূরত্বে একই রকম হতে হলে এদের মধ্যে একটি যোগাযোগ অর্থাৎ তথ্যের বিনিময় ঘটার কথা। কিন্তু সনাতনী সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন আমরা যদি ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে বিকীর্ণ মহাজাগতিক রশ্মির কথা ভাবি তাহলে দেখব গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব বেড়েছে প্রায় হাজার গুণ, অন্যদিকে পরিদৃশ্যমান মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০ হাজার গুণ। আমরা এখন মহাবিশ্বের এমন দূরত্বের গ্যালাক্সি দেখতে পাই যা ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে দেখা সম্ভব ছিল না। অন্তত প্রথমবারের মতো দূরতম গ্যালাক্সি থেকে আলো এসে পৌঁছেছে আমাদের গ্যালাক্সিতে। কিন্তু যা বিস্ময়কর তা হল, দূরের ও কাছের সব গ্যালাক্সিগুলোই দেখতে প্রায় অভিন্ন। গ্যালাক্সিসমূহের সমসত্ত্বতা সম্ভব যদি এদের উদ্ভবের সময় এরা অভিন্ন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সেটা হবে নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা। এবং অসংখ্য গ্যালাক্সির অভিন্নতা এক আকস্মিক ঘটনা, এমনকি সম্ভাবনার নিয়মে বিরল।

পদার্থবিজ্ঞানীরা ভিন্ন দুটি সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন যার ভিতর দিয়ে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ঘটতে পারে। একটি হল : স্ট্যান্ডার্ড কসমোলোজির ধারণা থেকে পাওয়া হিসাব অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষুদ্র ছিল অতীতের মহাবিশ্ব, অন্যটি হল : হিসাবের তুলনায় মহাবিশ্ব অনেক বেশি পুরোনো, যাতে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে এদেরকে অভিন্ন রূপ দিতে।

এর মধ্যে প্রথম সম্ভাবনাটি বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। ইনফ্লেশন বা ত্বরান্বিত প্রসারণরূপে ১৯৮১ সালে এলান গুথ যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেন তার মূলকথা হল—মহাবিস্ফোরণের $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড পর ত্বরান্বিত গতিতে মহাবিশ্ব বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই সময় প্রবল নিউক্লীয় বল পৃথক হতে থাকে। মহাকর্ষ বল অবশ্য এর আগেই পৃথক হয়ে গেছে। মহাবিশ্ব, যার ব্যাসার্ধ আদি অবস্থায় ছিল $১০^{-৩২}$ সে.মি., তা একটি টেনিস বলের আকার লাভ করে এই অল্প সময়ে। একটি নতুন কোয়ান্টাম ক্ষেত্র এই প্রচণ্ড শক্তি জোগায়। কোয়ান্টাম এই বুদবুদের বিস্তারে বিপুল স্থিতিস্থাপক শক্তি কাজ করে, গতিশক্তি বা নিশ্চল ভর (Rest mass) শক্তির পরিবর্তে, এবং তা প্রচণ্ড মহাবিকর্ষণ ঘটায়। এই ইনফ্লেশন-তত্ত্ব অনেক সমস্যার সমাধান দিলেও নতুন কিছু সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন, এই ইনফ্লেশন আসলে কী? কোথা থেকে এই প্রচণ্ড স্থিতিশক্তি এল?

দ্বিতীয় যে-তত্ত্বটি গ্যালাক্সিগুলোর সমসত্ত্বতা ব্যাখ্যা করতে পারে তা হল—কসমিক স্ট্রিং তত্ত্ব। এক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলারিটি থেকে মুক্ত হতে পারি। কারণ কোয়ান্টাম স্ট্রিং-এর একটি সীমিত আকার আছে যার দৈর্ঘ্য ১০$^{-৩৪}$ মিটারের চেয়ে ছোট হতে পারবে না। যদি এখানে কোয়ান্টাম ক্রিয়া কাজ না করত তাহলে এই স্ট্রিংকে স্বাধীনভাবে অর্ধেক করা যেত, এবং তা আবারও অর্ধেক করা যেত। এইভাবে ধাপে ধাপে এই স্ট্রিং দৈর্ঘ্য ও ভরহীন বিন্দুতে রূপান্তরিত হতে পারত। হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি শেষপর্যন্ত সিঙ্গুলারিটি থেকে মহাবিশ্বকে রক্ষা করে এই তত্ত্বে। অর্থাৎ শূন্য আয়তন ও অসীম বক্রতার বিব্রতকর দশা থেকে মুক্ত থাকতে পারি। এই স্ট্রিং-এ সৃষ্ট তরঙ্গ অবশ্য আলোর গতিতে প্রবাহিত হয়।

দ্বিতীয়ত, কোয়ান্টাম স্ট্রিং-এর ভর না-থাকলেও কৌণিক ভরবেগ থাকতে বাধা নেই। সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে এটি সম্ভব নয়। এই কৌণিক ভরবেগের ধারণাই পদার্থবিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেছে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের জন্য স্ট্রিং-তত্ত্বের ব্যবহারকে।

আমাদের সাধারণ ভায়োলিন যেখানে স্থানিক তিনমাত্রায় তরঙ্গ সৃষ্টি করে, কোয়ান্টাম স্ট্রিং সেখানে অতিরিক্ত আরো ছয়টি স্থানিক মাত্রা লাভ করে। ভৌত যেসব ধ্রুবক আমরা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানে ব্যবহার করি প্রাকৃতিক নিয়ম বর্ণনায়, তা এখানে পরিবর্তী হয়ে যায় এবং মহাবিশ্বের রূপান্তরের নানাপর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন মান পেতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা স্ট্রিং-তত্ত্বে আসে প্রসারণমাত্রারূপে, যা সার্বিকভাবে বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়ার তীব্রতা নির্ধারণ করে। এর ফলে সময়কে অন্তর্ভুক্ত করলে কোয়ান্টাম স্ট্রিং এগারো মাত্রার জগতে কাজ করে।

কোয়ান্টাম স্ট্রিং তত্ত্ব কতকগুলো নতুন প্রতিসাম্যের নিয়ম মেনে চলে। একটি এমন প্রতিসাম্য হচ্ছে দ্বিত্ব। এই প্রতিসাম্যের কারণে ছোট ও বড় উভয় স্ট্রিংই সমান ভরসম্পন্ন। এর কারণ হল ক্ষুদ্রতর স্ট্রিং-এর ভর কম, কিন্তু মৌলিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট করতে গেলে স্ট্রিং-এর ভর বৃদ্ধি পায় অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হবার কারণে। কোয়ান্টাম স্ট্রিং-এর আর একটি প্রতিসাম্য হচ্ছে T প্রতিসাম্য। এক্ষেত্রে একটি বড় ব্যাসার্ধের বেলন ও ছোট ব্যাসার্ধের বেলন একই পরিমাণ শক্তি সংযুক্ত করে এদের উপরে প্যাঁচানো স্ট্রিং-এ। কারণ বড় ব্যাসার্ধের বেলনাকার স্থানের উপরে প্যাঁচাতে স্ট্রিংকে বেশি বিকার দিতে হয় বলে শক্তি বেশি খরচ হয়। অন্যদিকে ছোট ব্যাসার্ধের বেলনাকার স্থানের ওপর প্যাঁচানো স্ট্রিং-এ ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা উচ্চতর কম্পনহারের তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় বলে বেশি শক্তি প্রয়োজন হয়। এই বিপরীত প্রক্রিয়ার ফলে বড় ও ছোট ব্যাসার্ধের স্থান একই শক্তিস্তর লাভ করে।

কোয়ান্টাম স্ট্রিং-এর এসব প্রতিসাম্য চমৎকার গাণিতিক বৈশিষ্ট্য দেয় যা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের জন্য নতুন নতুন চিত্র তুলে ধরছে। দীর্ঘদিন পদার্থবিজ্ঞানীরা ভাবতেন T দ্বিত্ব শুধু লুপ স্ট্রিং-এর বেলাতেই প্রযোজ্য এবং মুক্তপ্রান্ত স্ট্রিং-এর বেলায় প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ১৯৯৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ পলসিন্সকি দেখালেন যে মুক্তপ্রান্ত স্ট্রিং-এও এই T দ্বিত্ব প্রযোজ্য। যে-কোনো স্ট্রিং-এর ফলে মিশ্রণ ঘটাতে পারে উল্লিখিত দুই সীমানা শর্তের। যেমন, ইলেকট্রনকে আমরা স্ট্রিংরূপে বর্ণনা করতে পারি, যার প্রান্ত মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে স্থানিক তিনমাত্রায় এবং বাকি স্থানিক সাতমাত্রায় এর চলাচল বাধাপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে এই তিনমাত্রা ইলেকট্রনের চলাচলের জন্য একটি মেমব্রেন বা D ব্রেন সৃষ্টি করে। ১৯৯৬ সালে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি, প্রিন্সটনের এডওয়ার্ড উইটেন, যাঁর চমৎকার এ বিষয়ে বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আইসিটিপিতে, প্রস্তাব করেন যে আমাদের বিশ্ব এমন একটি ব্রেন-এর উপরে অবস্থান করে। ইলেকট্রন ও অন্যান্য কণিকার আংশিক চলাচল ব্যাখ্যা করে যে, কেন আমরা স্থানিক দশমাত্রার বিশ্ব অনুভব করি না। উইটেনের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানীও এই ধারণা নিয়ে কাজ করছেন।

আমরা দেখেছি স্ট্রিং-তত্ত্বের সবচেয়ে বড় কথা হল—অসীম রাশি নিয়ে কাজ করার যে বিড়ম্বনা তা থেকে মুক্ত হওয়া। Big Bang বা মহাবিস্ফোরণের পূর্বাবস্থায় যে ঘনত্বের অসীমতা, তাপমাত্রায় অসীমতা ও বক্রতার অসীমতা তা অতিক্রম করতে, সীমিত কোয়ান্টাম দৈর্ঘ্যের ধারণা এবং অভিনব সব প্রতিসাম্যের নিয়ম, যা স্ট্রিং-তত্ত্ব উপস্থিত করে সময়কে নতুনভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরে। আমরা মহাবিশ্বের ইতিহাসকে যখন পেছনদিকে সম্প্রসারিত করতে থাকি, এর স্থানিক বক্রতা সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে, যদি আমরা স্ট্রিং-তত্ত্বের পূর্বাবস্থায় আটকে থাকি। কিন্তু স্টিং-তত্ত্ব প্রথমবারের মতো মহাবিস্ফোরণপূর্ব মহাবিশ্বের একটি চিত্র উপস্থিত করে।

এখানে T দ্বিত্ব সময়ের বেলায় একটি নতুন প্রতিসাম্যের নিয়ম তুলে ধরে যেখানে বিগব্যাঙ্গ-এর মুহূর্ত থেকে এর আগে বা পরে যদি আমরা যাই, পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণগুলো একই রকম দেখাবে। অর্থাৎ বিগব্যাঙ্গ-এর পাঁচ সেকেন্ড আগে মহাবিশ্ব একইভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে যেমনটি ঘটেছে বিগব্যাঙ্গ-এর পাঁচ সেকেন্ড পর। কিন্তু পরিবর্তনের হার এই দুই মুহূর্তে হতে হবে পরস্পরের বিপরীত। মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ যেখানে মন্থরিত, বিস্ফোরণের মুহূর্তের আগে এই সম্প্রসারণ ছিল ত্বরান্বিত। এই চিত্র অনুসারে মহাবিশ্ব মহাবিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে সৃষ্ট নয়। বরং এটি একটি ক্রান্তিলগ্ন যেখানে মহাবিশ্বের বিস্তারণ ত্বরান্বিত গতি থেকে মন্থরিত গতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

স্ট্যান্ডার্ড যে ইনফ্লেশন-তত্ত্ব, সেখানে মহাবিস্ফোরণের $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের ত্বরান্বিত বিস্তার অনেকটা আন্দাজে ধরে নিতে হয়, মহাবিশ্বের নিরবচ্ছিন্নতা সমসত্ত্বতা ব্যাখ্যা করতে। কিন্তু স্ট্রিং-তত্ত্বের অভিনব প্রতিসাম্যের নিয়ম থেকে এই ইনফ্লেশনের চিত্র সহজাতভাবেই চলে আসে। মহাবিস্ফোরণপূর্ব বিশ্ব এক্ষেত্রে মহাবিস্ফোরণ-উত্তর বিশ্বের বিম্বচিত্র। ভবিষ্যৎ বিশ্ব যদি অনন্ত হয়, যেখানে এর ধারণকৃত বস্তুমালা ক্রমাগত পরস্পর থেকে সরে গিয়ে, হালকা হয়ে পারস্পরিক সংযোগ ও মিথস্ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে, তাহলে মহাবিস্ফোরণপূর্ব বিশ্ব দূর-অতীতে ছিল তেমনি বস্তুহীন প্রায় হালকা, মিথস্ক্রিয়াহীন ও শীতল।

দূর-অতীত থেকে সময় যত অগ্রসর হয়েছে, প্রকৃতির শক্তিগুলো তীব্রতা পেয়েছে। বস্তুমালা আকৃষ্ট হয়েছে পরস্পরের দিকে। এলোমেলোভাবে কোনো-কোনো এলাকায় বস্তু জমা হয়েছে, বাইরের এলাকাকে হালকাতর করে। শেষপর্যন্ত বস্তুঘন কোনো-কোনো এলাকার ঘনত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে একপর্যায়ে তা ব্ল্যাকহোলে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তর এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাইরের জগৎ থেকে, যার মহাকর্ষ প্রভাব ছাড়া কোনো তথ্যই বাইরে যেতে পারে না। অবশ্য বাইরের বস্তুকণা বা আলো এতে প্রবেশ করতে পারে।

ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণবিবরের অভ্যন্তরে স্থান ও কাল পরস্পরের অবস্থান বদল করে যেন। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্র আসলে কোনো স্থানিক বিন্দু নয় বরং কালিক বিন্দু, যেখানে সময়ের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ব্ল্যাকহোলে পতনশীল বস্তু গ্রাস করে ব্ল্যাকহোল যত ঘনীভূত ও উত্তপ্ত হতে থাকে এবং প্রাপ্ত হয় প্রচণ্ড বক্রতা, স্ট্রিং-তত্ত্ব এদের কোয়ান্টাম সীমা নির্ধারণ করে দেয়। বক্রতা অনুমোদিত পরম মান লাভের পর কোয়ান্টাম বহির্মুখী লক্ষন ব্ল্যাকহোলের প্রসারণ ঘটাতে থাকে। ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও বক্রতা তখন কমতে থাকে। এই বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু হবার মুহূর্তটি হল মহাবিস্ফোরণ। এমন একটি কৃষ্ণবিবরের অভিব্যক্তি হল আমাদের বিশ্ব।

স্ট্রিং-তত্ত্ব যতই চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় হোক, এই তত্ত্ব এখানো অসম্পন্ন এবং অনেক সমস্যা রয়েছে এই তত্ত্বকে ঘিরে। একটি সমস্যা হল স্ট্রিং-তত্ত্বের অন্তত পাঁচটি ভিন্নরূপ আমরা দেখতে পাই এদের উদ্ভাবকদের গৃহীত স্বীকার্যগুলোর ভিন্নতার কারণে, এবং বিভিন্নরকম সন্নিকর্ষ প্রয়োগ করার ফলে। এডওয়ার্ড উইটেন, যাঁকে জীবিত পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান বলে কেউ কেউ মনে করেন, এই সমস্যা থেকে মুক্ত হবার একটি অভিনব ধারণা দিয়েছেন। তাঁর মতে একটি সুপারসিমিট্রিক বা অতিপ্রতিসম স্ট্রিং-তত্ত্বেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে সবগুলো স্ট্রি- তত্ত্বে, এবং তা ভিন্ন ভিন্ন সন্নিকর্ষ প্রয়োগের ফলে। এই অতিপ্রতিসম স্ট্রিং তত্ত্বকে তিনি বলেছেন M তত্ত্ব। M তত্ত্বে M অক্ষরটি নানা অর্থ ধারণ করে উইটেনের মতে। M বুঝাতে পারে মেট্রিক্স অর্থাৎ ধাত্র অথবা মিস্টি বা রহস্য

অথবা ম্যাজিক বা জাদু। সম্প্রতি তিনি আরো একটি শব্দ Murky বা অস্পষ্ট যুক্ত করেছেন M-এর অর্থরূপে।

স্ট্রিং তত্ত্বে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাগতভাবে একে প্রতিষ্ঠিত করা। গাণিতিক সৌন্দর্য ও যৌক্তিক বর্ণনায় কোনো তত্ত্ব যতই আকর্ষণীয় হোক, পরীক্ষাগতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানে তা গৃহীত নয়। কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হবার আগে আর একটি শর্ত যে-কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে পূরণ করতে হয় এবং তা হল পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণসাধ্যতা। অর্থাৎ তত্ত্বের উপস্থাপনে এমন কিছু পূর্বাভাস থাকতে হবে যার ভিত্তিতে পরীক্ষাগতভাবে তত্ত্বের যাথার্থ্য যাচাই করা যায়। যে তত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা দেয় না তা সঠিক হবার দাবিও করতে পারে না। স্ট্রিং তত্ত্ব অন্তত এই প্রথম শর্তটি পূরণ করে বলে এর প্রবক্তারা দাবি করেন।

মহাবিস্ফোরণপূর্ব মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণের ভাবনা অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু একধরনের বিকিরণ এই বিস্ফোরণপূর্ব বিশ্ব থেকে আসতে পারে এবং তা হল মহাকর্ষ-তরঙ্গ। পর্যায়ক্রমিকভাবে মহাকর্ষক্ষেত্রের যে পরিবর্তন এই তরঙ্গে ধরা পড়ার কথা তা পরোক্ষভাবে আমরা দেখতে পারি মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভের পোলারায়ন থেকে। অথবা প্রত্যক্ষভাবে এটি আমরা দেখতে পারি ভূমিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ থেকে। প্রচলিত ইনফ্লেশন-তত্ত্ব অনুসারে যে, কম্পনহারের মহাকর্ষ তরঙ্গ দেখতে পাবার কথা, বিস্ফোরণপূর্ব মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকলে সে তুলনায় বেশি কম্পনহারের মহাকর্ষ তরঙ্গের আধিক্য থাকার কথা। বর্তমানে যেসব পর্যবেক্ষণ-যন্ত্র আছে তা এই পার্থক্য ধরার মতোন সংবেদী না হলেও আগামীতে প্লাঙ্ক স্যাটেলাইট অথবা LIGO এবং VIRGO অবজারভেটরি থেকে তা হয়তো সম্ভব হবে। সময় সীমাহীনভাবে অতীত ও ভবিষ্যতে চিরন্তন অথবা এর একটি শুরু ও শেষ আছে? এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আরো সময় চাই বলে মনে হচ্ছে।

সময়ের ধারণা সৃষ্টিতে নানা সূত্র

সময় নিয়ে বিভিন্ন পেশা ও অভিজ্ঞতার মানুষ চিন্তাভাবনা করেছেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির নানা রূপ আমরা দেখতে পাই সময়ের ধারণায়। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা যখন সময়কে ব্যবহার করেছেন তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজে, সেখানে একধরনের অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা আমরা দেখতে পাই। দার্শনিকরা সময় নিয়ে অনেক বিতর্ক ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন কিন্তু সেখানেও কুয়াশা কাটেনি। স্বভাবতই আমরা আশা করি যে পদার্থবিজ্ঞান সময়-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা উপস্থিত করবে সমস্ত মতানৈক্য দূর করে। একথা সত্য যে-জ্ঞানের অন্য যে-কোনো শাখার চেয়ে পদার্থবিজ্ঞান সময়-সম্পর্কে অনেক বেশি সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করেছে এবং যে মূল বিষয় বা ধারণা পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে কাজ করে তার মধ্যে সময় অন্যতম। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় সময় অনেক বেশি সুনির্দিষ্টতা, পরিমাপ্যতা, প্রকাশসাধ্যতা ও দ্ব্যর্থহীনতা পেয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও ঐকমত্য আমরা পাইনি সময়ের ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যায়। এর কারণ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সময় এসেছে আনুষঙ্গিক কোনো সূত্র বা সমীকরণকে অবলম্বন করে। সময়ের ধারণার উৎস বা সূত্রগুলো ভিন্ন বলে একটি সমন্বিত ধারণা শুধু পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে পাওয়া সম্ভব নয়।

সময়ের একটি বিধিবৎ সংজ্ঞার্থ দেওয়াই বেশ কঠিন। সবচেয়ে সুবিধজনক হল এইভাবে শুরু করা যে, সময়কে পরিমাপ করার জন্য যে-ঘড়ি ব্যবহৃত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই সময়কে আমরা সংজ্ঞায়িত করব। এটা একটি অপারেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি যা আইনস্টাইনও ব্যবহার করেছেন। এভাবে সময়কে সংজ্ঞায়িত করার একটা সুবিধা হল আমাদের পৃথিবী এর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ভিতর দিয়ে একটি ঘড়ির মতন কাজ করছে। আমরা ঘড়ি পেতে পারি নানা ধরনের। যেমন সাধারণ দোলক বা অ্যাটমিক ঘড়ি। শুধু একটি কাজ আমাদের করতে হবে এক্ষেত্রে, এবং তা হল বিভিন্নরকম ঘড়ির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি ও সমন্বয় সাধন। কিন্তু যে-কোনো সমন্বয় সাধনের জন্যে যে যুক্তি প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন সেখানে কিছু পূর্বধারণা বা স্বীকার্য প্রয়োজন। সময়-সম্পর্কে তেমন কিছু ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত বিজ্ঞানের বিধিবৎ পদ্ধতির উদ্ভবের আগে থেকেই। এমন একটি ধারণা হল সময়ের একমুখিতা। আমরা কোনো ঘড়িকে উল্টোদিকে চালাতে পারি না প্রকৃত অর্থে। যদি কোনো ঘড়িকে যান্ত্রিকভাবে উল্টোদিকে চালানো যায়

তাহলে তা সংঘটিত হতে কত সময় অতিবাহিত হল সেটা নির্ধারিত হবে সম্মুখদিকে চলা অন্য ঘড়ির সময় দেখে। সময়-সম্পর্কে আর-একটি প্রচলিত ধারণা হল সময়ের প্রবাহ মসৃণভাবে সংঘটিত হচ্ছে। সময়কে যে-কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তে ভাগ করা যায়। বস্তুত শক্তি-সম্পর্কেও এমন ধারণা ছিল। আমরা একটি কাচের তলকে মসৃণ ভাবি এবং শক্তির আদানপ্রদানকেও। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে বস্তুতও শক্তির এই সীমাহীন মসৃণতা আর গ্রহণযোগ্য নয়। সময়ও কি সূক্ষ্মতম পরিমাপে এর কণা বা দানা রূপ দেখাবে? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের সূক্ষ্ম ভৌত ঘটনায় যেতে হবে যেখানে সময় এর সূক্ষ্মতর বিস্তার নিয়ে উপস্থিত।

পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভবের ভিতর দিয়ে সময় সম্পর্কে ধারণারও বিকাশ ঘটেছে। এ যেন বিভিন্ন দিক থেকে আলো ফেলে সময়ের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করা। পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে সময় সম্পর্কে অর্জিত আমাদের উপলব্ধি তাই একক না হয়ে অনেকগুলো ধারণার সম্মিলিত রূপ। সময়ের এই বৈশিষ্ট্যগুলো পরস্পরবিরোধী নয় বরং পরিপূরক। সময় সম্পর্কে ধারণালাভের ভিত্তিরূপে পদার্থবিজ্ঞানের যে-তত্ত্বগুলো বিশেষভাবে কাজ করেছে তার মধ্যে রয়েছে নিউটনীয় বলবিদ্যা ও তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব, সাবনিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান, তাপবলবিদ্যা, সংখ্যায়নিক বলবিদ্যা, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব, আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত পদার্থবিজ্ঞান।

প্রথমে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান ও তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের আলোকে সময় কী বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত তা দেখা যাক। এক্ষেত্রে দেখা যায় সময়কে উল্টে দিলে নিউটনের সূত্রগুলো সমভাবে কাজ করে। অর্থাৎ সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো সময়ের দিকনিরপেক্ষ। গণিতের ভাষায় সময়কে উল্টোদিকে প্রবাহিত করাকে যদি একটি অপারেটর T দিয়ে বুঝানো যায়, তাহলে কোনো সমীকরণকে এই অপারেটর দিয়ে অপারেট করলে সমীকরণটি অপরিবর্তিত থাকতে পারে। যদি এমনটি হয় তাহলে বলা হবে নিয়মটি সময় বিপরীতকরণে নিত্য (Time reversel invarient)। নিউটনের বলবিজ্ঞানের সূত্রগুলো এই নিত্যতার নিয়ম মানে। মনে রাখতে হবে নিউটনের সূত্র প্রাথমিকভাবে প্রযোজ্য ছিল বস্তুকণার উপরে যার কোনো বিস্তৃত ও পরিবর্তনীয় আকার নেই। একটি দৃঢ় মার্বেলের ক্ষেত্রে আমরা নিউটনের সূত্র যখন প্রয়োগ করি, তখন এর ভরকেন্দ্রকে মার্বেলের প্রতিনিধিরূপে বিবেচনা করি। এমন একটি মার্বেলের গতিপথের চলচিত্র যদি গ্রহণ করি এবং সেই চলচিত্রকে যদি বিপরীতদিকে চালিয়ে দেখি, তাহলে দুটো চলচিত্রই নিউটনের সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাবে। দুটো চলচিত্র দেখে বোঝার উপায় নেই কোন্‌টি আসল গতিপথ মার্বেলের এবং কোন্‌টি সেই গতিপথের উল্টোছবি। অর্থাৎ নিউটনের সূত্র সময়ের দিকনিরপেক্ষভাবে প্রযোজ্য বস্তুকণার ক্ষেত্রে। একটি বাস্তব মার্বেলের ক্ষেত্রে সংঘাতের প্রভাব থাকতে পারে এর গায়ে। কারণ, কোনো মার্বেলই

অসীমভাবে দৃঢ় নয় যা আঘাতের প্রভাবমুক্ত। ফলে, খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে দুটো আলোকচিত্রের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হতে পারে। কারণ যে চলচিত্রটি মার্বেলের সংঘর্ষ-পরবর্তী গতিপথকে দেখাচ্ছে সেখানে মার্বেলটি কিছুটা বিকার লাভ করেছে। অর্থাৎ একটি মার্বেলকে এর গঠনকারী বস্তুকণার সমাবেশরূপে বিস্তৃত আকারের বস্তুরূপে বিবেচনা করলে সংঘর্ষের আগে ও সংঘর্ষের পরের ঘটনামালার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। সময়ের দিক সেক্ষেত্রে ছাপ রাখবে ঘটনার বিন্যাসে।

এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাপ বলবিদ্যা ও সংখ্যায়নিক মেকানিক্সের আলোকে। কিন্তু মার্বেলের পরিবর্তে যদি ইলেকট্রন, প্রোটন বা পরমাণুর সংঘর্ষ নিয়ে আলোকচিত্র গ্রহণ করি তাহলে সংঘর্ষে নিয়োজিত বস্তুর বিকার নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে না। সেক্ষেত্রে সময়ের দিকনিরপেক্ষতা অর্থাৎ T নিত্যতা বজায় থাকে। কিন্তু এই মৌলিক কণিকাদের মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র প্রযোজ্য নয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্র এক্ষেত্রে কার্যকর। মজার বিষয় হল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সময় দিকনিরপেক্ষ– যদিও সময়ের অন্য সনাতনী ধারণা নিয়ে এখানে জটিতা দেখা দেবে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আলোকে সময়ের আলোচনায় এ-বিষয়টি আসবে।

আমরা যদি তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের ভিত্তিতে আলোর ঘটনা ব্যাখ্যা করি যা ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে আমরা পাই, সেখানে সময় T প্রতিসাম্য মানে। আলোর কণিকা যখন প্রতিফলিত হয় আয়না থেকে, তখন আলোর আপতন ও প্রতিফলন প্রতিসাম্য বজায় রাখে। এর ফলে সময় দিকনিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। এখানে সুবিধা হল আলোর কণিকা মার্বেলের মতন বিকার লাভ করে না কোনো সংঘর্ষে। কিন্তু আমরা পরে দেখব আলোর গতি নিয়ে অন্য সমস্যা দেখা দেবে যা নিউটনীয় সূত্র মানে না। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আলোকে সময়ের ধারণা যখন আলোচিত হবে, তখন এই বিষয়টি আসবে। বস্তুত ম্যাক্সওয়েল আলোকে কণিকারূপে বিবেচনা করেননি। ফলে নিউটনের সূত্র সে কারণেও এখানে প্রযোজ্য নয়।

সনাতনী কণিকা বলবিদ্যা গতিবিজ্ঞানে আরো অনেক ধাঁধার জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল জেনোর প্যারাডক্স বা স্ববিরোধিতা। জেনো প্রশ্ন তুলেছিলেন যে একটি তীর যদি ছুটতে থাকে থাকে তাহলে তার অবস্থান ও গতি কীভাবে নির্ধারণসাধ্য? যদি তীরটির মধ্যবিন্দু কোনো একটি বিন্দুতে অবস্থান করে কোনো সময়ে, তাহলে সেই বিন্দুতে একে অবস্থান করতে হবে। তা যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক। অর্থাৎ এর সরণ শূন্য। সেক্ষেত্রে তীরটির গতি থাকতে পারে না। অনদিকে যে সময়টুকুর জন্য তীরটি বিশেষ বিন্দুতে অবস্থান করছে তা যদি শূন্য হয় তাহলে সময়ের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যভাবে দেখলে তীরের গতি বের করতে গিয়ে আমাদের শূন্যকে শূন্য দিকে ভাগ করতে হয়। কিন্তু তা নির্ণয়যোগ্য নয় গাণিতিকভাবে। অনেকে এই ধাঁধার

উত্তর খুঁজেছেন এইভাবে যে : শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে কোনো ফল পাওয়া সম্ভব, ফলে তীরের গতি এরই একটি ফল পেতে পারে। কিন্তু জেনোর এই ধাঁধাকে ইতিবাচকভাবে দেখলে আমরা বলতে পারি এর মধ্যেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বীজ রোপিত হয়েছিল, যেখানে আমরা এখন হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি দেখতে পাই। এই নীতি অনুসারে কোনো বস্তুর অবস্থান ও গতি একই সঙ্গে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে। এ বিষয়টি আসবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আলোকে সময় নিয়ে আলোচনায়।

সময় যে দিকনিরপেক্ষ, অর্থাৎ সময়কে উল্টোদিকে প্রবাহিত করলেও পদার্থবিজ্ঞানের অনেক সমীকরণ অপরিবর্তিত থাকে, তা বুঝতে প্রতিসাম্যের বিষয়টি একটু আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। সমতলে আঁকা কোনো ছবিকে যদি আমরা ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরাই তাহলে ছবিটি অপরিবর্তিত থাকে। যদি একটি সমবাহু ত্রিভুজকে ১২০ ডিগ্রি ঘুরাই তাহলেও সেটা অপরিবর্তিত থাকে, তেমনি একটি বর্গক্ষেত্রকে আমরা ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে আগের চেহারায় নিয়ে আসতে পারি। যে-কোনো বস্তুর বেলায় এমনি প্রতিসাম্যের নিয়ম আমরা পেতে পারি, যা ঐ বস্তুর আকৃতি ও নির্বাচিত ঘূর্ণন-অক্ষের উপরে নির্ভর করে। একে আমরা স্থানিক প্রতিসাম্য বলি নির্বাচিত বস্তুর জন্য। ঘূর্ণনের মাধ্যমে এই পূর্বের অবস্থায় ফিরে আনার ব্যাপারটিকে বলা হয় প্রতিসাম্য বা সিমিট্রি অপারেশন। একইভাবে কোনো ভৌত নিয়ম যদি একই রূপ ধারণ করে যখন সময়কে উল্টে দেয়া হয় অর্থাৎ সময়কে বিপরীতদিকে প্রবাহিত করা হয়, তাহলে তাকে আমরা বলেছি T প্রতিসাম্য।

পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য প্রতিসাম্য বা সিমিট্রি অপারেশন রয়েছে। যেমন কোনো সিস্টেম বা ব্যবস্থা যদি অপরিবর্তিত রূপ লাভ করে যখন এর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা হয় আয়নায়, তা হলে আমরা বলি এর বিম্ব প্রতিসাম্য বা মিরর সিমিট্রি আছে, এবং আনুষঙ্গিক অপারেশনকে বলা হয় প্যারিটি অপারেশন বা P। চার্জ যুগ্ম অপারেটর হচ্ছে বৈদ্যুতিক চার্জকে ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক অথবা ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক কারক অপারেটর, যাকে চিহ্নিত করা হয় C দিয়ে। বৈদ্যুতিক চার্জ ছাড়া অন্য ধরনের চার্জের বেলাতেও এটা প্রযোজ্য। মৌলিক কণিকার ক্ষেত্রে এই চার্জ হতে পারে স্ট্রেঞ্জনেস (Strangeness) । C অপারেটর কোনো কণিকার উপরে প্রয়োগ করলে কণিকাটি প্রতিকণিকায় রূপান্তরিত হয়। এসব বিভিন্ন অপারেটর ও প্রতিসাম্যের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে, কারণ সাবনিউক্লিয়ার কণিকার জগতে T অপারেশনের সঙ্গে P এবং C অপারেশন মিলিতভাবে যাচাই করতে হয়, এখানে কোনো পরিবর্তন বা মিথস্ক্রিয়াকে সার্বিকভাবে দেখতে হলে।

দীর্ঘদিন ধরে P, C এবং T প্রতিসাম্য সাবনিউক্লিয়ার জগতে কার্যকর বলে পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করতেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালে লি এবং ইয়াং প্রথম পরীক্ষাগতভাবে দেখালেন যে P প্রতিসাম্য বা প্যারিটি সিমিট্রি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এরপর এই প্রতিসাম্যতার নিয়ম লঙ্ঘনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। যেমন কোবাল্ট—60 এর তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ক্ষেত্রে P প্রতিসাম্য লঙ্ঘিত হয়। কিছু চার্জহীন কণিকা, যেমন কেয়ন (Kaon)-এর বেলায় P এবং C অপারেশন পর্যায়ক্রমে আরোপ করে প্রতিসাম্য লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, যা আরো আকর্ষণীয়। যদি P,C এবং T অপারেশন পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা যায় তাহলে সমন্বিতভাবে প্রতিসাম্য পাওয়া যায়। এর অর্থ হল T প্রতিসাম্য আলাদাভাবে লঙ্ঘিত। এর ফলে সাবনিউক্লীয় কণিকার মিথস্ক্রিয়ার একটি চলচিত্র যদি নেয়া হয় এবং তা উল্টোদিকে চালানো যায়, আমরা শনাক্ত করতে পারব মূল ঘটনা নয় বলে। অর্থাৎ সময়ের সম্মুখপ্রবাহ এক্ষেত্রে অভিন্ন নয় বিপরীত প্রবাহ থেকে। সময়ের T প্রতিসাম্যের এই ভেঙে পড়া খুবই উত্তেজনাকর। সাবনিউক্লীয় জগতের বাইরে এটি পরিলক্ষিত নয়। একটি ব্যবস্থা কিছু কিছু প্রতিসাম্য দেখাতে পারে কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো প্রতিসাম্য ভেঙে পড়তে পারে। যেহেতু আমরা দেখছি যে T C P একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিসাম্য মৌলিক কণিকাদের মিথস্ক্রিয়ায়, কিন্তু পৃথকভাবে T প্রতিসাম্য লঙ্ঘনীয়, এসব ক্ষেত্রে T C P কিছু কিছু কণিকাকে প্রতিকণিকায় নিয়ে যেতে পারে, সময়কে এদের জন্য উল্টোদিকে প্রবাহিত করে। একে আমরা বলতে পারি দুর্বল টাইম রিভার্সাল ইনভেরিয়েন্স বা সময় উৎক্রম নিত্যতা।

তাপবলবিদ্যার আলোকে সময়কে বুঝতে গেলে সময়-সম্পর্কে অভিনব কিছু ধারণা পাই যা নিউটনের কণিকা বলবিদ্যা বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যায়ও পাওয়া যায় না। তাপবলবিদ্যাকে সনাতনী নিউটনীয় বলবিদ্যারই বিস্তারণ বলে প্রায়শ বলা হলেও এর বৈশিষ্ট্য একক কণিকার বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক দিক থেকে ভিন্ন। এর কারণ, এখানে অনেক কণিকার দ্বারা গঠিত সমাবেশে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা পাচ্ছি যা বিচ্ছিন্ন একক কণিকায় নেই। উপমা টেনে বলতে পারি, একটি সমাজ বা জাতির অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা একক মানুষের নেই যদিও সমাজ বা জাতি একক মানুষদের নিয়েই গঠিত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-ধারণা আমরা পাই তাপবলবিদ্যার প্রভাবে তা হল সময়ের তীর বা সময়ের একমুখিতা। সময়ের তীর নানাভাবে প্রতীয়মান হতে পারে, যার একটি দৃষ্টান্ত হল আমাদের জৈব প্রতিভাস যেখানে আমরা ক্রমাগত স্মৃতি সঞ্চয় করে বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হই। এটা সময়ের একমুখিতার জৈব অভিব্যক্তি। লঘুকরণ দর্শন বা Reductionist দৃষ্টিকোণ থেকে জৈব প্রক্রিয়াকে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের ঘটনারূপে ব্যাখ্যার চেষ্টা চলতে পারে। কিন্তু

সমস্যা হল সময় অভিন্নরূপে প্রতিভাত নয় জৈব ও অজৈব প্রক্রিয়ায়। এ বিষয়ে আমরা আসব পরে। কিন্তু সময়ের তীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা সৃষ্টি হয় পদার্থবিজ্ঞানে, তাপবলবিদ্যার ফসলরূপে। এবং এটি যথার্থ রূপ পায় তাপবলবিদ্যা যখন সংখ্যায়নিক বলবিদ্যার আলোকে ব্যাখ্যাত হয় ক্লসিয়াস, টমসন, কেলভিন, ম্যাক্সওয়েল ও বোল্ডসম্যানের অবদানে।

বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য উদাহরণটি নেয়া যাক। ধরা যাক মাঝখানে দেয়াল দিয়ে বিভক্ত করা একটি বাক্সের এক অংশে অনেকগুলো অণু স্থিতিশীল অবস্থায় আছে এবং বাক্সের অন্য অংশ খালি। বাক্সের দুই অংশকে পৃথককারী দেয়াল যদি তুলে নেয়া যায় বা সেখানে একটি ছিদ্র করা যায় তাহলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের অণু পুরো বাক্সটায় ছড়িয়ে পড়বে ও নতুন স্থিতিশীল অবস্থায় আসবে। এখন প্রশ্ন হল : এই ব্যাপক প্রক্রিয়ায় অণুগুলোর স্বাধীনভাবে ছুটাছুটি ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে কোনো একসময় গ্যাস-অণুগুলো কি আবার আগের অবস্থায় অর্থাৎ একটি চেম্বারে এসে উপস্থিত হতে পারে? হলে কত সময় পরে তা ঘটবে? প্রথমত প্রতিটি অণুর চলাচল যেহেতু T প্রতিসাম্য, মানে এরা এদের অনুসৃত পথের উল্টোদিকেও যাবার স্বাধীনতা রাখে। ফলে গতানুগতিক পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সব গ্যাস-অণুর একটি চেম্বারে ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু আমরা জানি বাস্তবে তা ঘটে না। অবশ্য যদি মাত্র দুটো বা তিনটি গ্যাস-অণু থাকত তাহলে মাঝে মাঝে সবগুলো অণু এক চেম্বারে এসে জমতে পারে। কিন্তু অণুর সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে ততই এটা কম-সম্ভাবনার হয়ে ওঠে যে, সবগুলো অণু একটি চেম্বারে জমা হবে। সাধারণ অবস্থায় আমরা জানি প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে প্রায় $১০^{১৮}$ অর্থাৎ দশ সহস্র কোটি কোটি অণু আছে। এমন অবস্থায় হিসাব করে দেখা যায় কখনই প্রায় গ্যাস-অণুগুলো এক চেম্বারে জমা হবার সম্ভাবনা নেই।

স্থিতাবস্থায় কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা যত সময় পরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে তাকে 'পয়েনকারের আবৃত্ত কাল' বলে। আমাদের নেয়া উপরের দৃষ্টান্তে পয়েনকারের আবৃত্ত কাল দাঁড়ায় অসীম। এটা সহজেই আমরা দেখতে পাই যে অণুর সংখ্যা যদি সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকে, পয়েনকারের আবৃত্ত কাল অসীম হয়ে যাবে; এবং কখনোই গ্যাসের অণুগুলো একটি চেম্বারে জমা হবে না। এখানে কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করার লক্ষ্যে। প্রথমত আমরা কেয়নের বেলায় যে সময়ের T প্রতিসাম্য লঙ্ঘিত হয় এবং দুর্বল T প্রতিসাম্য শুধু আমরা পাই, সে-বিষয়টি গ্যাসের অণুর বেলায় প্রাসঙ্গিক নয় বলে বিবেচনায় আনা হয়নি। দ্বিতীয়ত আমরা যদি গ্যাসের অণুর সংখ্যা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করি তাহলে সিস্টেমটি এত বিশাল হবে যে মহাকর্ষজনিত অপ্রতিরোধ্য সংকোচন ঘটবে যাকে Gravitational Collapse বলে। সে-অবস্থায় স্থিতাবস্থা পাওয়া যাবে না তাপবলবিদ্যার নিয়মে। এসব অবশ্য চরম অবস্থার কথা।

সাধারণভাবে তাপবলবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে একটি বড় আকারের সিস্টেম অর্থাৎ যেখানে অনেক অণুর সমাবেশ ঘটেছে, সেখানে তাপ, চাপ, আয়তন, বিশৃঙ্খলার মাত্রা সবই সংখ্যায়নিকভাবে নির্ণীত হয়। এগুলো ম্যাক্রস্কোপিক প্যারামিটার। একটি থার্মোডাইনামিক সিস্টেম বাইরের প্রভাবমুক্ত থাকলে ক্রমাগতভাবে চরম এনট্রপি অর্জন বা বিশৃঙ্খলার দিকে যায়। এই ম্যাক্রস্কোপিক বৈশিষ্ট্যকে বিচ্ছিন্ন অণুর মাইক্রস্কোপিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বিত করতে বোল্ডসম্যান তার H থিয়োরেম উদ্ভাবন করেন। H হচ্ছে শৃঙ্খলার পরিমাপ, ফলে এনট্রপির বিপরীত। একটি থার্মোডাইনামিক সিস্টেম সবসময় নিজে থেকে H কমাতে চায়। সম্ভাবনার নিয়মে এটা দেখানো যায় যে একটি বড় সিস্টেম যেখানে অসংখ্য অণুর সমাবেশ সেখানে ব্যাপনের বিপরীত ক্রিয়া বা নিম্নতাপমাত্রা থেকে উচ্চতাপমাত্রার দিকে তাপ প্রবাহিত হবার ঘটনা কেন দুর্লভ সম্ভাবনার, এবং বাস্তবক্ষেত্রে অসম্ভব।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সহজ যে সংঘর্ষের ঘটনা দুটো কণিকার মধ্যে, নিউটনীয় বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়মে, তার সঙ্গে জটিল প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। জটিল প্রক্রিয়ার জন্য আমরা দুর্বল T নিত্যতার কথা বলতে পারি। কারণ, ব্যাপনের বিপরীত ক্রিয়া যদিও প্রায় অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, যদি বিচ্ছিন্ন অণুগুলোর আচরণের ভিত্তিতে সমগ্র অণুর সমাবেশকে ব্যাখ্যা করতে চাই। T প্রতিসাম্য ও দুর্বল T প্রতিসাম্যের মধ্যে পার্থক্য হল সম্ভাবনায় মানের যা সাংখ্যায়নিক নিয়মের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়।

কিন্তু এমন জটিল ব্যবস্থাও আছে যা মৌলিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের চেতনা এবং সাধারণীকৃত অর্থে জীবন। এক্ষেত্রে দুর্বল T প্রতিসাম্যও প্রযোজ্য নয়। এই বিশ্লেষণের আলোকে আমরা জীবনের একটি নতুন সংজ্ঞার্থ পাই। আমরা বলতে পারি জীবন হচ্ছে এমন এক জটিল ব্যবস্থা যেখানে দুর্বল T প্রতিসাম্য বা T নিত্যতা বর্জন করে। অবশ্য জৈব প্রক্রিয়াকে এভাবে ভৌত প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করার মূলে রয়েছে আমাদের বর্তমান অজ্ঞতা। আমরা জীবনকে মৌলিক সরল ঘটনার ভিত্তিতে এখনো ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। যদি কখনো এই অজ্ঞতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে জীবন আর রহস্যাবৃত থাকবে না। একটি জটিল ভৌত ঘটনা হবে যেখানে অন্তত দুর্বল T প্রতিসাম্য কাজ করবে।

আমরা আগের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি T C P প্রয়োগ করে আমরা যদি থার্মোডাইনামিক সিস্টেমে সময়ের দিকনিরপেক্ষতা পেতে চাই, তাহলে প্রতিকণিকার ক্ষেত্রে ব্যাপনের বিপরীত ক্রিয়া ঘটবে। তাপও নিম্নতাপমাত্রা থেকে উচ্চতাপমাত্রায় প্রবাহিত হবে। কারণ, কণিকার পক্ষে সময়ের সম্মুখদিকে যাওয়ার অর্থ প্রতিকণিকার সময়ের উল্টোদিকে যাওয়া। কিন্তু যে-যুক্তিতে কণিকার

পক্ষে ব্যাপনের বা তাপপ্রবাহের উল্টো ক্রিয়া সম্ভব নয়। সেই একই কারণে প্রতিকণিকার বেলাতেও এই ক্রিয়াগুলো সম্ভব নয়। এর অর্থ দাঁড়াল থার্মোডাইনামিক্স T C P সময় উৎক্রম নিত্যতা মানে না, যদিও দুর্বল T নিত্যতা মানে। এবং জীবন দুর্বল T নিত্যতাও মানে না।

আমরা দেখেছি যে সময়ের একমুখিতার মূলে রয়েছে সংখ্যায়নিক নিয়ম যা অপ্রত্যাবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়। কোনো ব্যবস্থা যখন খুব অল্পসংখ্যক কণিকার মধ্যে সংঘটিত মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে সীমিত থাকে তখন তা প্রত্যাবর্তী হতে পারে। কিন্তু যখন অনেক সংখ্যক কণিকার সমাবেশ সৃষ্টি হয় এবং সংখ্যায়নিক নিয়ম প্রযোজ্য হয় সম্ভাবনার হিসাবে, তখন সময় দিকনির্ভর হয়ে পড়ে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার জন্য শুধু পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলো ক্ষুদ্র সমাবেশ বা মাইক্রো-দশা সম্পর্কে জানা সম্ভব। এই দশায় সময় দিকনিরপেক্ষ, কিন্তু অনেকগুলো মাইক্রো-দশা মিলে যে ম্যাক্রো-দশা সে সম্পর্কে তথ্য লাভ ঘটে সংখ্যায়নিক পদ্ধতিতে। মাইক্রো দশা থেকে ম্যাক্রো দশায় যাবার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় যেখানে বিশৃঙ্খলা বা এনট্রপি, তা সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পায় তাপীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার জন্য। এর ফলে সময়-নির্ভর হয়ে পড়ে এই ম্যাক্রোব্যবস্থা। মাইক্রো-দশা থেকে ম্যাক্রো-দশায় যাবার কোনো সর্বস্বীকৃত পন্থা নেই। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন যে-তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে নানাস্তরের ঘটনা ব্যাখ্যায় তা বিভিন্নভাবে প্রভাব রেখেছে সময়ের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ও সময়-সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি সৃষ্টিতে।

একটি মাইক্রোসিস্টেমের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে এনট্রপি বৃদ্ধি না পেয়ে সাময়িকভাবে কমতেও পারে, কিন্তু সে-সময় তা যুক্ত বৃহত্তর ব্যবস্থার সঙ্গে। কিন্তু এরপর এনট্রপি বৃদ্ধি পায়, যখন ব্যবস্থাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যদিও মাইক্রোসিস্টেম থেকে ম্যাক্রোসিস্টেম পরিবৃত্তি সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত নয়, একটি সাধারণ সত্য সম্পর্কে সবাই একমত হতে পারি যে, একটি বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের ক্ষেত্রে এনট্রপি কমতে পারে না।

প্রতিটি পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া একটি ব্যবস্থাকে কিছুটা আলোড়িত করে। এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় কতটা শক্তির আদানপ্রদান হল এবং সিস্টেমটি কতটা বড় তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো সিস্টেমের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে অস্থিতিশীলতায় নিয়ে যেতে বা দশা-পরিবর্তন ঘটাতে ছোট আকারের আলোড়ন বড় ভূমিকা রাখতে পারে। টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্র যখন ব্যবহৃত হয় পর্যবেক্ষণের কাজে, তখন একটি সক্রিয়ন শক্তি সিস্টেম থেকে পর্যবেক্ষণযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তা যন্ত্রের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যতক্ষণ-না যন্ত্রটি নতুন করে ব্যবহারের অবস্থায় ফিরে আসে। পরিমাপ প্রক্রিয়া তাই পরিমাপযন্ত্র ও পরিমাপ্য সিস্টেমের মধ্যে সংঘটিত একটি মিথস্ক্রিয়া, যেখানে শক্তির আদানপ্রদান চলে এবং এনট্রপির বৃদ্ধি

ঘটে। পর্যবেক্ষণ তাই একটি অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া এবং খুব যত্নে নেয়া পর্যবেক্ষণও বড়জোর দুর্বল T- নিত্য বা T- invariant।

পরিমাপ্য সিস্টেমগুলোকে আমরা তিন ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করতে পারি। এক হতে পারে, বিবেচ্য ব্যবস্থাটি মোটামুটি আমাদের দেহের মাপের। এই ব্যবস্থাগুলোই সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের অর্থাৎ নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত। দ্বিতীয় হচ্ছে সেইসব ব্যবস্থা যা আমাদের দেহের মাপের তুলনায় অনেক বেশি বড়। এর মধ্যে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। তৃতীয়ত রয়েছে ক্ষুদ্রের জগৎ বা মাইক্রস্কোপিক সিস্টেম। পরমাণু ও মৌলিক কণিকার জগৎ এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় এই জগৎকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রয়োজন। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে সময় অনুপ্রবেশ করে প্রথমত সময়-প্রত্যাবর্তী নিত্য বা Time reversal invarient সমীকরণের মাধ্যমে। এই কোয়ান্টাম জগতে সময়ের ভূমিকা নিয়ে এখানে আলোচনা করা যাক।

এখানে অনেক সমস্যা ও বিতর্ক আমরা লক্ষ্য করি। কোয়ান্টাম পরিমাপে, পরিমাপযন্ত্রের সঙ্গে সংযোগসৃষ্টি করার অর্থ হল, যে ইলেকট্রন তরঙ্গ-অপেক্ষক রূপ বিস্তৃত হয়ে সংযোগ সৃষ্টি করে ওয়েভ ফংশন বা তা শেষপর্যন্ত পর্যবেক্ষণের, ভিতর দিয়ে সংকুচিত হয়ে স্থানিক বিন্দুরূপে দেখা দেয় পর্দায়। এই প্রক্রিয়ার নানারকম ব্যাখ্যা আমরা পাই। একটি ব্যাখ্যা হলো তরঙ্গ-অপেক্ষকের সংকোচন হচ্ছে একটি থারমোডাইনামিক অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া। এখানে সময় অনুপ্রবেশ করে জটিল প্রশ্নের অবতারণা করে। যেমন তরঙ্গ-অপেক্ষক কি আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি সিস্টেমকে ধারণ করে অথবা সবগুলো সিস্টেমকে একত্রে ধারণ করে? যদি দ্বিতীয় ব্যাপারটি সত্যি হয়, তাহলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কি একধরনের সংখ্যায়নিক বলবিদ্যা যা এখনো অসম্পন্ন? এখানে দুটো মতবাদ আমরা দেখতে পাই যার একটির প্রধান প্রবক্তা হলেন নিলস্ বোর এবং অন্যটির আলবার্ট আইনস্টাইন। নিলস্ বোর তাঁর কোপেনহ্যাগেন ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা একটি সম্পন্ন তত্ত্ব যা আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কার্যকারণপ্রসূত। আইনস্টাইনের মতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কার্যকর কিন্তু অসম্পন্ন। কারণ এটি কার্যকারণপ্রসূত নয়, সম্ভাবনার নিয়মে ব্যাখ্যাত, ফলে সন্তোষজনক নয়। নিলস্ বোরের দাবি পরীক্ষাগতভাবে সমর্থন পায় পরবর্তীতে, বিশেষ করে সত্তর ও আশির দশকে। এর আগে ১৯৬৪ সালে বেল-এর অসমতার ভিত্তিতে যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয় সেখানেও বোরের প্রস্তাব সমর্থিত হয়। কিন্তু একটি সমস্যা রয়েই গেছে এবং তা হল কোয়ান্টামতত্ত্ব যেখানে আলোর চেয়ে দ্রুত কোনো সংকেত প্রেরণকে সমর্থন করে না, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি সিস্টেমের দুটো অংশ যখন এতটা দূরে অবস্থান করে যে এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে আলোর গতিকে অতিক্রম করতে হয় এদের মধ্যে যোগাযোগকারী সংকেতকে। আইনস্টাইনের যুক্তি হল পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব স্থানীয়

বা Local হতে হবে। অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে সংযোগ সৃষ্টি হতে হবে তথ্যের বিনিময়ে কার্যকারণ দ্বারা সম্পর্কিত ঘটনার মধ্যে। তাহলে কোনো প্রচ্ছন্ন চলরাশি আছে কি যোগাযোগ-সৃষ্টির?

আইনস্টাইনের ধারণা কিছুদিন চাপা পড়ে গেলেও সম্প্রতি নতুন করে জটিল সব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। দূরক্রিয়া বা পরিদর্শকে সচেতনতা এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে কিনা সে-প্রস্তাবও অনেকে করছেন। মানুষের মস্তিষ্ক, তার চেতনা ও বুদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে কেউ কেউ সময়ের জটিল সব ধাঁধার সমাধানে। ম্যাক্সওয়েল তাপবলবিদ্যার সময়ের দিকনির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে বিশেষ ডেমনের কথা ভেবেছিলেন। এই ডেমন এনট্রপি কমাবার জন্য বাক্সের দুই চেম্বারকে পৃথককারী দেয়ালের মাঝখানে স্থাপিত ছোট দরজায় বসে থাকবে। সে শুধু দরজাটি বন্ধ করে বা খুলে দিয়ে গ্যাস-অণুর কক্ষবদলকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যে এনট্রপি কমে বা তাপ নিম্নমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রায় প্রবাহিত হয়। ম্যাক্সওয়েল ধারণা করেছিলেন ডেমনের পক্ষে বিশেষ শক্তি খরচ না করেই এই নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। কিন্তু আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে এই অণুকে দেখার জন্য যে আলোকতরঙ্গ ব্যবহৃত হবে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি λ হয় তা হলে সেই ফোটনের জন্য শক্তি ব্যয় হবে ch/λ, এখানে h প্লাঙ্কের ধ্রুবক ও C হচ্ছে আলোর গতি। লিও দিলার্ডের এই হিসাব প্রদর্শনের পর ম্যাক্সওয়েলের ডেমনের মৃত্যু হয়। সময়কে দিকনিরপেক্ষ করা সম্ভব হয়নি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি সময়ের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনে পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন অগ্রগতি তার প্রভাব রাখছে। সময়-সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি ক্রমাগত অভিব্যক্তি লাভ করছে সময়ের সঙ্গে। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব সময়ের সনাতনী ধারণাকে সবচেয়ে বেশি নাটকীয়ভাবে বদলে দিয়েছে। এ বিষয় নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি অন্য অধ্যায়ে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি মৌলিক তত্ত্ব কেমন করে সময়ের ধারণাকে প্রভাবিত করেছে সেই বিশ্লেষণের অংশরূপে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের আলোকে লব্ধ সময়ের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করছি।

আলোর গতি শূন্যের মধ্যে নির্দিষ্ট মানের এবং তা আলোর উৎস ও পর্যবেক্ষকের গতি-নিরপেক্ষ। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো সব জড়কাঠামোতেই অভিন্ন রূপ পাবে। এই দুটো স্বীকার্যকে ভিত্তি করে আইনস্টাইন দেখালেন সনাতনী নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের অনেক ধারণাই বদলে যায়। বিশেষ করে আলোর গতিকে অপরিবর্তী রাখতে নিয়ে স্থান ও কাল পরস্পর থেকে এবং পর্যবেক্ষকের গতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকল না, যেমনটি নিউটনীয় ধারণায় বদ্ধমূল ছিল। স্থান ও কাল সমন্বিত হয়ে চারমাত্রিক জগৎ সৃষ্টি হল, যেখানে আগে তিনমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল পৃথকভাবে বিবেচিত হত। আইনস্টাইনের এই চারমাত্রিক জগতে স্থানিক ও কালিক দূরত্ব আলাদাভাবে সত্য নয়, যা সত্য তা হল ঘটনার সঙ্গে

ঘটনার দূরত্ব। এই চারমাত্রিক জগতে এক-একটি ঘটনা, এক-একটি বিন্দু যার অবস্থানাঙ্ক স্থানিক ও কালিকভাবে নির্ধারিত।

দুটো ঘটনার মধ্যে স্থানিক ব্যবধান ও কালিক ব্যবধান পর্যবেক্ষকের গতির ওপরে এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ল যে দৈর্ঘ্য সংকোচন ও কাল প্রসারণ ঘটল। বিশ্বজনীন যুগপত্ততার ধারণাও এর অর্থ হারাল। সমগ্র বিশ্বজুড়ে একটি পরম যুগপৎ মুহূর্ত সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় বলে আমরা স্থান-কালের চারমাত্রিক জগৎকে এমন কোনো তল দিয়ে কাটতে পারি না যা বিশুদ্ধ তিনমাত্রিক স্থানিক জগৎকে বুঝাবে। এর অর্থ দাঁড়াল ইউক্লিড বা নিউটনের স্থির স্থান বলে কিছু নেই। পরম যুগপত্ততায় অবলুপ্তি নিশ্চিত করল পরম স্থানিক সন্নিধির অবলুপ্তি।

এখানে উল্লেখ্য যে যুগপত্তের ধারণা অবলুপ্ত হবার ভিতর দিয়ে স্থানের ধারণা সময়ের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি গভীরভাবে প্রভাবিত হল। কারণ পরম স্থানিক সন্নিধি অবলুপ্ত হলেও কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত দুটো ঘটনার মধ্যে যে পর্যায়ক্রম তা টপোলজির দিক থেকে অপরিবর্তিত থাকে সব পর্যবেক্ষকের জন্যেই। দুটো ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান অবশ্য বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে বদলে যেতে পারে এবং তা শূন্যও হতে পরে। সেক্ষেত্রে দুটো ঘটনা কালিক ব্যবধানে ঘটেছে বলে একদল পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হলেও অন্য একজনের কাছে তা যুগপৎ মনে হতে পারে। অর্থাৎ কার্যকারণ-সম্পর্কযুক্ত দুটো ঘটনার পর্যায়ক্রম কখনোই উল্টে যাবে না। শুধু যেসব ঘটনা কার্যকারণ-সম্পর্কহীন তাদের বেলায় পর্যায়ক্রম উল্টে যাওয়া সম্ভব লরেঞ্জের রূপান্তরণ সমীকরণ লঙ্ঘন না-করেও। কিন্তু এ-ধরনের পর্যায়ক্রমের ধারণা পরম যুগপত্ততার ধারণার মতোই অর্থহীন অপারেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে।

আমরা আগেও আলোচনা করেছি সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব সময়কে স্থানিকরূপ দেয়নি বরং স্থানকে কালিক রূপ দিয়েছে। কার্নপ-এর ভাষায় এটা বলা ভুল যে-দুটো বস্তু স্থানিকভাবে কাছাকাছি থাকলে এদের মধ্যে ভৌত মিথস্ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী। বরং বলা উচিত দুটো বস্তুর মধ্যে যখন মিথস্ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী তখন এদের মধ্যে স্থানিক দূরত্ব কম। কার্নাপের স্থানের টপোলজিকাল বৈশিষ্ট্যকে সময়ের টপোলজিরূপে দেখাবার দৃষ্টান্তকে আরো জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন রিচনবাক, হুইটেকার প্রমুখ। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন বলেন অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে, তার অর্থ হল আমরা যে জগৎ-বিন্দু বা World Point-এ অবস্থান করছি যেখানে আলো এসে এখন পৌছল এবং যে বিশ্ব-বিন্দুতে অ্যানড্রোমেডা ছিল যখন আলো সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে, তাদের মধ্যেকার ব্যবধান। আমরা যাকে এই বিশ্ব-বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বলছি তা মোটেই 'এখানে -এখন' এবং 'সেখানে-এখন'-এর মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝায় না, বরং 'এখানে-এখন' এবং 'সেখানে-তখন'-এর মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝায়। এডিংটনও বলেছেন : আমার বর্তমান মুহূর্ত 'এখানে এখন', অন্য কোথাও না।

অর্থাৎ 'এখন' কথাটা 'এখানের' সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একটি মুহূর্ত একই সঙ্গে দুটো জায়গাতে অবস্থান করে না।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল আলোর গতি সীমিত এবং কোনো বস্তু বা তথ্যই আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে যেতে পারে না। এখান থেকে সিদ্ধান্ত আমরা পাই যে, কোনো ঘটনা ঘ-কে মূলবিন্দু ধরে যদি স্থান-কালের লিখনচিত্র আঁকা যায় তাহলে একটি শঙ্কু বা Cone পাওয়া যাবে। ঘটনাকে উৎস বিন্দু ধরে আলো যেসব এলাকায় পৌঁছতে পারে, তা ধারণ করা আছে এই শঙ্কুর মধ্যে। ঘটনাবিন্দু থেকে উৎসারিত আলো যে-এলাকায় পৌঁছতে পারে অর্থাৎ এই শঙ্কুর অন্তর্গত এলাকাকে বলা হয় সময়-রূপ বা Time-like। এই শঙ্কুর বাইরের এলাকা যেখানে আলো পৌঁছতে পারে না তাকে বলা হয় স্থান-রূপ বা Space-like। এই শঙ্কুর পৃষ্ঠদেশকে বলা হয় আলোক-শঙ্কু বা Light-cone।

একটি প্রশ্ন স্বভাবতই এসে যায় যে এমন কোনো কণিকা কি থাকতে পারে যার গতি আলোর গতির চেয়েও বেশি। এ-ধরনের তাত্ত্বিক কণিকাকে বলা হয় ট্যাকিয়োন। এই ট্যাকিয়োন কণিকা আলোকগতিকে অতিক্রম করতে পারে না উপর থেকে অথবা নিচ থেকে। অর্থাৎ আলোর চেয়ে কম গতি থেকে ত্বরান্বিত হয়ে আলোর চেয়ে বেশি গতি লাভ, অথবা আলোর চেয়ে বেশি গতি থেকে মন্থরিত হয়ে আলোর চেয়ে কম গতিতে নামতে পারে না। মনে হতে পারে ট্যাকিয়োন যদি থাকে তাহলে এর সাহায্যে সংকেত পাঠিয়ে একজন ঘটনা ঘটার আগেই তার খবর পেয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনার মৃত্যুবরণ করেন, সেই দুর্ঘটনার খবর সে ঘটনা ঘটার আগেই সংগ্রহ করতে পারব ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এ-ধরনের যুক্তি স্বভাবতই পরস্পরবিরোধী। এবং কার্যকারণ সম্পর্ক এর ফলে নষ্ট হয়ে যায়। এই ধাঁধার একমাত্র জবাব হল ট্যাকিয়োন তথ্য বহন করতে পারে না। ট্যাকিয়োনের ভর হতে হবে অলীক যার মোট ভরশক্তি কমতে থাকবে, এর গতি যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ট্যাকিয়োন এখনো বিজ্ঞানের কল্পগল্পরূপেই নানা ভাবনার জন্ম দিয়েছে যা সময়ের ধারণাকে রহস্যময়তা দিচ্ছে।

সময়ের ধারণাকে নতুন বৈশিষ্ট্য দিতে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব গভীরভাবে কাজ করছে। বিষয়টি ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু দু-একটি বিশেষ দিক তুলে ধরব। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে স্থান-কালের চারমাত্রিক জগৎ বক্রতা লাভ করে বস্তুর উপস্থিতিতে। এর ফলে স্থান-কালের প্রসঙ্গ-কাঠামো বিকার লাভ করে এবং সময়ের বিস্তার বদলে যায়। সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি তারা নক্ষত্রের ইন্ধন ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্র বাহ্যিক চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা হারায় এবং মহাকর্ষজনিত অন্তর্মুখী চাপ একচ্ছত্র আধিপত্যে অন্তহীনভাবে সংকোচন ঘটায়

নক্ষত্রের, সেইসঙ্গে এর ঘনত্বের। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণবিবর হচ্ছে বস্তুর সেই অবস্থা যেখানে স্থান-কালের বক্রতা এমন রূপ লাভ করে যেখান থেকে আলোও নির্গত হতে পারে না মহাকর্ষের টান অতিক্রম করে। কৃষ্ণবিবরকে ঘিরে একটি পৃষ্ঠদেশ কল্পনা করতে পারি যার ভিতরের কোনো বিন্দু থেকেই আলো মুক্তি পেতে পারে না। এই পৃষ্ঠদেশকে বলা হয় 'ঘটনা দিগন্ত'।

তাপবলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে কোনো বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণ এর পরম তাপমাত্রায় চার-ঘাতের আনুপাতিক। সনাতনী এই হিসাব দ্বারা কৃষ্ণবিবর থেকে কোনো বিকিরণ নির্গত হয় না বলে এর তাপমাত্রা শূন্য হবার কথা। আমরা জীবনের যে সংজ্ঞার্থ দিয়েছি আগে যেখানে জীবনকে বলা হয়েছে এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সময় অপ্রত্যাবর্তী, এমনকি দুর্বল কালিক নিত্যতাও নেই। সে অনুসারে কৃষ্ণবিবর জীবনের শর্ত মানে। যা হোক, কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব অনুসারে এই সনাতনী দৃশ্যপট কিছুটা বদলে যায় এবং শূন্যস্থানও ব্যাপক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে কণিকা-প্রতি কণিকাযুগল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয় ও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এগুলো দেখা যায় না, কারণ এরা অলীক। শক্তির নিত্যতার নীতি অনুসারে যুগলকণিকার মধ্যে একটির শক্তি ঋণাত্মক হতে হবে। কৃষ্ণবিবরের বৈশিষ্ট্যের কারণে এই কণিকা কৃষ্ণবিবরে পতিত হতে পারে। অন্য কণিকাটি সঙ্গী না-পেয়ে ধ্বংস হবার সুযোগ পাবে না, ফলে দৃশ্যমান হবে। ঋণাত্মক শক্তিসম্পন্ন কণিকাকে ভাবা যেতে পারে এর প্রতিকণিকারূপে যা কৃষ্ণবিবর থেকে বিকীর্ণ এবং সময়ের পিছনদিকে সঞ্চারিত। যেখানে এটি বাস্তব রূপ পায়, সেখানে কণিকারূপে বিক্ষিপ্ত সময়ের সম্মুখদিক। এর মূল্য পরিশোধ করতে কৃষ্ণবিবরের ভর ও শক্তি হ্রাস পায় যা 'হকিং ক্রিয়া' বলে পরিচিত।

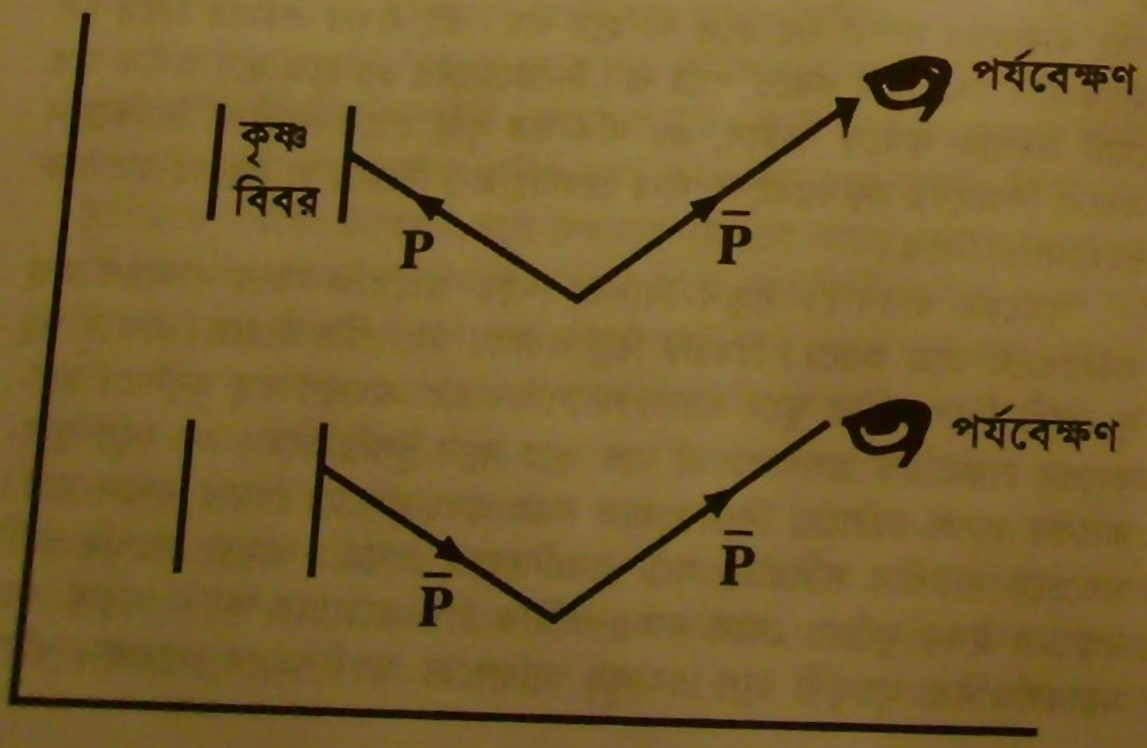

কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে সময়ের প্রতিসাম্যতা আমরা বিনষ্ট হতে দেখি। এ থেকে তিনভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। এক হতে পারে হকিং ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া প্রত্যাশা করা, যাকে আমরা হোয়াইট হোল বা শুভ্রগহ্বর ক্রিয়া বলতে পারি। অবশ্য এর সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, ফলে দুর্বল T নিত্যতা এখানে প্রত্যাশিত। দ্বিতীয়ত আমরা ভাবতে পারি কৃষ্ণবিবরের বাষ্পীয়ভবন ঘটতে পারে, নিজ থেকেই ঘটতে পারে অত্যন্ত দূর সম্ভাবনা নিয়ে। সেক্ষেত্রে হোয়াইট হোলের কথা ভাবার প্রয়োজন হয় না। তৃতীয় পথ হল কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই তৃতীয় সমাধানটি মানতে চাইবেন না এখন।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব একদিক থেকে অত্যন্ত সাধারণীকৃত, অন্যদিক থেকে এই তত্ত্ব অতিনির্বাচিত। অতিসাধারণীকৃত এই অর্থে যে এই তত্ত্বে অনেকরকম ফল পাওয়া যায় যার কিছু কিছু অনিয়ত। যেমন আমরা একটা সময়-রূপ আবদ্ধ রেখা পেতে পারি যার ভিতর দিয়ে শুধু সংকেত নয় বস্তুও সঞ্চারিত হতে পারে অতীতে। অনেকের মতে কোনো তত্ত্বই এমন সাধারণীকৃত হওয়া উচিত না, যেখানে এমন অবাস্তব ঘটনা অনুমোদিত হয়। অন্যদিকে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে নিউটনের মহাকর্ষ ধ্রুব G-কে অপরিবর্তী রাশি ধরা হয়। কিন্তু ডিরাফ মনে করতেন G খুব ধীরগতিতে হলেও সময়ের সঙ্গে বদলে যেতে পারে। এ দিক থেকে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব নির্বাচিত বা সংকীর্ণ।

মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে সময় কী রূপ নেয় সেটা এবার দেখা যাক। একগুচ্ছ গভীর প্রশ্ন সময়-সম্পর্কে উত্থাপিত হতে পারে, যখন আমরা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণে যাই। আমরা আমাদের সৌরজগৎ ও গ্যালাক্সিসমূহকে ভাবতে পারি বস্তুর আদি এক ফ্লুইড অথবা বস্তু ও বিকিরণের দুই ফ্লুয়িড থেকে উদ্ভূত। এই ফ্লুয়িড সমসত্ত্ব ও সমসারক ছিল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের আলোকে ফ্রিডম্যান মডেল ব্যবহার করে বিস্তারমান সংকোচনশীল বা স্পন্দনশীল মহাবিশ্বের চিত্র আমরা পেতে পারি। মহাবিস্ফোরণের ভিতর দিয়ে বিস্তারমান মহাবিশ্বের মূলে রয়েছে সীমা শর্ত।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব ও তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বকে ভিত্তি করে মহাবিশ্বের যে মডেল তা অন্তত দুর্বল T-invariant বা T- নিত্য। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি জীবনের ক্ষেত্রে T- নিত্যতা নেই, এমনকি দুর্বল T- নিত্যতাও। ফলে এখানে জীবন অন্তর্ভুক্ত নয়।

সময়ের পিছনদিকে ভাবা

শুধু তাপবলবিদ্যার গাণিতিক ভাবনা নয়, আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনা স্পষ্টভাবে আমাদের এই উপলব্ধি দেয় যে, সময় শুধু সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ সময়ের তীর একমুখো। এর সহজ দৃষ্টান্ত হল একটি কাচের গেলাশ হাত থেকে পড়ে ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু ভাঙা কাচের টুকরোগুলো আপনা থেকে উঠে এসে আস্ত গেলাশটি নির্মাণ করবে না। এক কাপ গরম চা টেবিলে রেখে দিলে তা একসময় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কিন্তু ঠাণ্ডা চা আপনা থেকেই উত্তপ্ত ধূমায়িত চায়ে রূপান্তরিত হবে না। বাস্তবে যে এমন ঘটে না তাই শুধু না, আমরা এমন উল্টো ঘটনা নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে ভাবতেও পারি না। যেমন এক কাপ গরম চা কিছুক্ষণ পরে যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এমনটি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এমনকি কাপের চায়ের তাপমাত্রা ও বাইরের আবহাওয়া জানলে, কত সময়ে তা ঠাণ্ডা হয়ে পরিবেশের তাপমাত্রা লাভ করবে তা হিসাব করাও সম্ভব। কিন্তু এককাপ ঠাণ্ডা চা দেখে বলতে পারা যাবে না যে এই চা একসময় নিশ্চয়ই গরম ছিল, কিংবা কতক্ষণ আগে তা গরম ছিল। এমন হতে পারে, চাএর কাপটি সবসময়েই ঠাণ্ডা ছিল, কিংবা অল্প সময় আগে গরম ছিল, অথবা বহুসময় আগে গরম ছিল। মোট কথা, তাপ যে উচ্চতাপমাত্রা থেকে নিম্নতাপমাত্রায় প্রবাহিত হয় তা বাস্তবে ও ভাবনায় সম্মুখগতিকে যেমন স্পষ্ট করে তোলে, বিপরীত ঘটনার ক্ষেত্রে তা ঘটে না। অর্থাৎ আমরা যে ঠাণ্ডাবস্তুকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর স্থিত তাপমাত্রার চেয়ে উঁচু তপমাত্রায় উত্তপ্ত হতে দেখি না, তাই শুধু নয়। আমরা কল্পনা ও হিসাব করতে বা অনুমান করতে পারি না এমন ঘটনা ঘটছে বা কতক্ষণে তা সম্পন্ন হয়েছে।

তাপবলবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র বলে, তাপ সবসময় উঁচুতাপমাত্রা থেকে নিম্নতাপমাত্রায় প্রবাহিত হয়, বাহ্যিক কোনো এজেন্ট কাজ না করলে। অথবা যে-কোনো ব্যবস্থা আপনা থেকেই ক্রমাগত বিশৃঙ্খলার দিকে যায় বিপরীতটা না ঘটে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সাধারণ যৌক্তিক হিসাব তাপবলবিদ্যার এই হিসাবের সঙ্গে মিলে যায়।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এই ঘটনার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতির অনেক ঘটনাই প্রত্যাবর্তী নয়। অর্থাৎ অনেক ঘটনাই শুধু সম্মুখদিকে অগ্রসর হয় এবং আমরা তা অনুমান করতে

পারি। কিন্তু কোনো ঘটনার পরিণতি থেকে এর পূর্বাবস্থা বা ঘটনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমরা সবকিছুই উপলব্ধি করি হিসাব কষে, যুক্তি প্রয়োগ করে ও অভিজ্ঞতার আলোকে। সময় যে সম্মুখদিকে শুধু অগ্রসর হয়, একথা বলার আড়ালেও সময়-সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা, সময়নির্ভর নানা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক অনুমান ও হিসাব করতে পারার ক্ষমতা কাজ করে। প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনার ক্ষেত্রে যেখানে অপ্রতিসাম্যতা পলিক্ষিত হয় সেখানেই সময়ের একমুখিতা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

শুধু প্রাকৃতিক ঘটনার বেলাতেই নয়, গাণিতিক হিসাবের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি, দুটি সংখ্যা যোগ করে বা গুণ করে কোনো সংখ্যা পাওয়া যাবে তা নির্দিষ্টভাবে আমরা নির্ধারণ করতে পারি। কিন্তু একটি সংখ্যা দেখে বলতে পারি না কোন্ সংখ্যাগুলোর যোগফল বা গুণফল এই সংখ্যাটি সৃষ্টি করেছে। যেমন ১০+১১ = ২১ বা ৩ ×১২ = ৩৬। কিন্তু ২১ সংখ্যাটি দিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন করে, কোন্ কোন্ সংখ্যার যোগফল ২১? তাহলে তা নির্দিষ্ট একটি ফল দেবে না। অনেকগুলো সম্ভাবনা দেবে। একইভাবে ৩৬ সংখ্যাটি হতে পারে ৬ × ৬, ২ × ২ × ৯, ৪ × ৩ × ৩, ২ × ২ × ৩ × ৩ ইত্যাদি ভাবে। এই সমস্যাটি নিয়ে নতুন গণিতের নতুন শাখা জন্ম নিয়েছে, যাকে ফ্রাকটাল (Fractal) গণিত বলে। আমরা লক্ষ্য করছি সময়ের পিছনদিকে প্রবাহিত হবার বিষয়টি যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ধরা পড়ছে, তেমনি আমাদের যৌক্তিক চিন্তা ও গাণিতিক ভাবনার সঙ্গেও তা সম্পৃক্ত।

আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের ও সে-অভিজ্ঞতা সাজাবার একটি লক্ষ্য হল কার্যকারণ সম্পর্ক উদ্ঘাটন এবং ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারা। বস্তুত সময়ের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে ঘটনার পরম্পরা অনুধাবন ও বিশ্লেষণের জন্যেই। আমরা লক্ষ্য করব কার্যকারণ সম্পর্কও একটি একমুখিতা বা অপ্রতিসাম্যতা প্রদর্শন করে। আমরা এটা ভাবতে অভ্যস্ত যে কার্যকারণ সম্পর্কে যে-ঘটনাটি কারণরূপে কাজ করে তা কালিকভাবে প্রাপ্ত ফলরূপে পাওয়া ঘটনার আগে অবস্থান করে। অর্থাৎ জল পড়ার ফলে যদি পাতা নড়ে, তাহলে জল আগে পড়ে তারপর পাতা নড়ে।

সময় যদি উল্টোদিকে চলত, আমাদের পক্ষে কোনো ঘটনার পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হত না। এটা দুই কারণে। প্রথমত আমরা কিছু দেখতে বা শুনতে পেতাম না। কারণ আলো বাইরের বস্তু থেকে এসে আমাদের চোখে পড়ত না। বরং আমাদের চোখ থেকে বস্তুর দিকে ছুটত। আমরা বস্তুটির কোনো তথ্য পেতাম না আলোর মাধ্যমে। তেমনি বস্তু থেকে শব্দ আমাদের কানে এসে না-পৌছে কান থেকে ছুটত বস্তুর দিকে, কিছু শোনার আগেই। ফলে কোনো তথ্য আমাদের কাছে পৌছত না।

এই ভৌত ঘটনার বিপর্যয় ছাড়াও আমাদের হিসাবের ক্ষেত্রেও অবশ্য একটি উত্তরণের কথা আমরা ভাবতে পারি, যদিও তা বিজ্ঞানের কল্পগল্প মনে হবে। সময়

যদি উল্টোদিকে প্রবাহিত হয় ঘটনার জগতে, তাহলে আমাদের মস্তিষ্কও যেহেতু বস্তু দিয়ে তৈরি সেখানেও সবকিছু উল্টোভাবে ঘটবে। ফলে আমাদের চেতনা, স্মৃতি, যুক্তিপ্রয়োগ ও উপলব্ধি বিপরীত গতি লাভ করবে। আমাদের মানসিক ক্রিয়া, কার্যকারণ বিশ্লেষণও উল্টে যাবে এমনটি ভাবতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতেই পারব না যে আমাদের পুরো জগতে সময় উল্টোদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এ-ধরনের ভাবনা সবটাই অর্থহীন ও অবাস্তব মনে হতে পারে। কারণ এখানে আমরা অতীত ও ভবিষ্যৎকে যেন শুধু পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করেছি। কিন্তু আমরা যদি কল্পনা করি সে দুই ভিন্নজগতের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, যার একজন এমন এক জগতের অধিবাসী যেখানে সময় সামনের দিকে যায় এবং অন্যজনের জগতে সময় পিছনদিকে যায়—তাহলে নতুন পরিস্থিতি উদ্ভব ঘটবে। প্রত্যেকেই নিজের মতন করে ভাববে যে তার সময় স্বাভাবিকভাবেই চলছে, শুধু অন্যজনের সময় প্রবাহিত হচ্ছে উল্টোদিকে। এরা নির্ধারণ করতে পারবে না কার সময় সম্মুখদিক যাচ্ছে এবং কার সময় উল্টোদিকে যাচ্ছে। কিন্তু বড় সমস্যা হবে এদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা।

সাইবারনেটিক্সের জন্মদাতা রবার্ট উইনার দেখিয়েছেন যে এক্ষেত্রে উভয়েই অন্যজনের তথ্যকে বিশৃঙ্খলারূপে বিবেচনা করবে। সব ঘটনাই যা একজনের কাছে তার নিজের জগতের পরিপ্রেক্ষিতে যৌক্তিক মনে হবে, তা অন্যজনের কাছে ভৌতিক ও দুর্বোধ্যরূপে ধরা পড়বে। ভাষার শব্দগুলো চেনা যাবে না, ছবির রেখাগুলো উল্টো মনে হবে। ফলে যা শৃঙ্খলা তা বিশৃঙ্খলারূপে প্রতীয়মান হবে। উইনারের সিদ্ধান্ত হল তথ্য বিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে সময় একমুখী হতে হবে। আমরা যদি বোধগম্য, যোগাযোগসাধ্য ও যৌক্তিক জগতে বাস করতে চাই যেখানে প্রকৃতির নিয়মগুলো আমরা আবিষ্কার করতে পারব, আমাদের চারপাশের ঘটনামালার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকবে—তাহলে সেই জগতে সময় অবশ্যই একদিকে শুধু প্রবাহিত হবে।

বিষয়টিকে আমরা এভাবেও ভাবতে পারি : আমরা যাকে আমাদের বিশ্ব বলে জানি, তা তো আমাদের উপলব্ধ জগৎ। এই উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের পাওয়া তথ্য আমরা বিশ্লেষণ করতে পেরেছি কার্যকারণের নিয়মে। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়ে যে সংকেতগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে আলো বা শব্দরূপে, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আছে। ফলে আমাদের জগৎ বলতে যদি উপলব্ধ জগৎকে বুঝি তাহলে সেখানে সময় অবশ্যই একদিকে শুধু প্রবাহিত।

তবু যদি আমরা কল্পনা করি যে ভিন্ন এক জগতের মানুষের সঙ্গে আমাদের দৈবাৎ দেখা হল যার জগতে সময় উল্টোদিকে প্রবাহিত হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে? প্রথমত আমরা পরস্পরকে বুঝব না এবং সব যোগাযোগের চেষ্টাকেই

উন্মাদের কাণ্ড বলে যে গণ্য করব তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যেটা ঘটবে তা হল, আমরা পরস্পরের ভবিষ্যৎ জানব যেমন করে আমরা নিজেদের অতীত জানি। পরস্পরের জন্য ভবিষ্যৎ কী দুর্ঘটনা অপেক্ষা করে আছে তা ঘটে-যাওয়া ঘটনার মতোই নিশ্চিত ও স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হবে উভয়ের কাছেই। অর্থাৎ আমরা নিজেদের অতীত ও অন্যের ভবিষ্যৎ জানব। এটা হতে পারত পরস্পরের জন্য খুবই সুবিধাজনক অবস্থা। কারণ, আমরা পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে একত্রে উভয়েই অতীত ও ভবিষ্যৎ জেনে নিতে পারতাম নিজেদের। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। কারণ, আমরা পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করতে ব্যর্থ হব। একজনের দেয়া তথ্য অন্যজনের কাছে বিশৃঙ্খলারূপে ধরা পড়বে। পরস্পরকে উন্মাদ ভাবার ফলে, বাস্তব সমস্যাটি পরস্পরের কাছে তুলে ধরে যে এর সমাধান সন্ধান সেটাও হবে না।

সময়ের তীর অর্থাৎ সময়ের একমুখী প্রবাহের ধারণা অবশ্য এমনি অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি আমরা প্লাঙ্ক-সময়ে চলে যাই। প্লাঙ্ক-সময় বলতে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড বুঝায়। নিউটনীয় সময়ের ধারণায় সময়ের ক্ষুদ্রতম বিস্তার বলে কিছু নেই। কারণ প্রবাহিত বিচ্ছিন্ন ধারায় তাকে সীমাহীনভাবে ভাগ করে যেতে পারি আমরা। কিন্তু বস্তু ও শক্তির বেলায় যেমন কণা বা কোয়ান্টাম আছে, সময়ের বেলায়ও তেমন একটি ধারণা আমরা পেতে পারি কোয়ান্টাম-তত্ত্বের আলোকে। এটা আসে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা বিধি থেকে।

স্থান-কালের যে চারমাত্রিক জগৎ, সেখানে আমরা কি এমন দুই জগতের কথা ভাবতে পারি যার একটিতে সময়ের যে তীর তা অন্য জগতের তুলনায় বিপরীত? যতই অবাস্তব মনে হোক, এই প্রশ্নটি পদার্থবিজ্ঞানী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিত্ত্বের গবেষক কসমোলজিস্টদের কাছে বারবার এসেছে। আমরা যদি ব্লাকহোলের ঘটনা-দিগন্তের কথা ভাবি, লক্ষ্য করব যে এটি একটি অদ্ভুত প্রবেশপথ যেখানে দুটো জগৎ এসে মিলেছে। একটি জগৎ এই ঘটনা-দিগন্তের বাইরে এবং অন্যটি এর ভিতরে। যদি কোনো দুর্ভাগা মহাকাশযাত্রী এই প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে, সে মুহূর্তে অবলুপ্ত হয়ে যাবে ব্লাকহোলের কেন্দ্রে, যা গণিতের ভাষায় সিঙ্গুলার পয়েন্ট অর্থাৎ যেখানে স্থান-কালের বক্রতা অসীম। এটা ঘটে কারণ আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে বস্তুর অসীম ঘনত্ব স্থান-কালকে দুমড়ে সীমাহীন বক্রতা সৃষ্টি করে। কিন্তু দুর্ভাগা এই মহাকাশচারীর জন্য একটি অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে ঘটনা-দিগন্ত অতিক্রম করে ব্লাকহোলে প্রবেশের মুহূর্ত ও এর কেন্দ্রে বিলুপ্ত হয়ে যাবার মধ্যবর্তী অতিক্ষুদ্র কালিক বিস্তারে। এই সময়ে সে ঘটনা-দিগন্তের বাইরের তথ্য এবং ব্লাকহোলের ভিতরের তথ্য একই সঙ্গে দেখতে পাবে। যদিও এই মহাকাশচারীকে বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাব না এবং তার

কাছ থেকে কোনো তথ্য বাইরে আসতে পারবে না, এর বিপরীতটা কিন্তু ঘটবে অর্থাৎ নিকট বাইরের তথ্য ভিতরে ঢুকতে পারবে। কারণ, বাইরে থেকে আলো মহাকাশচারীকে অনুসরণ করবে এবং তাকে অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করবে। ফলে সে একই সঙ্গে আমাদের জন্য অগম্য ব্ল্যাকহোলের ভিতরের তথ্য এবং ব্ল্যাকহোলের অতিনিকট বাইরের জগতের তথ্য একই সঙ্গে দেখতে পাবে।

সম্পূর্ণ গাণিতিক যুক্তিতে এই ভিন্নজগৎ হচ্ছে আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবিম্ব বা মিরর ইমেজ, যা অসীমভাবে বক্রতাপ্রাপ্ত। এই অন্যজগতে সময়ের প্রবাহ আমাদের উপলব্ধ সময়ের প্রবাহের বিপরীত। সময়ের প্রবাহ বলাটা ঠিক হবে না, কারণ আমরা পরে দেখব সময়ের প্রবাহ কথাটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এবং এর সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ সহজ নয়। আমরা বরং 'সময়ের তীর' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। কারণ তীর বলতে দুটো ধারণা আমরা পাই। একটি হল দিকনির্দেশনা, অন্যটি হল তীরের গতি। আমরা এখানে শুধু দিক-নির্ধারণের অর্থটি গ্রহণ করতে পারি। মহাকাশচারী একই সঙ্গে দুই বিপরীতমুখী সময়ের অভিজ্ঞতা এই দুর্লভ মুহূর্তে পেতে পারে যা স্বভাবতই উদ্ভট। এই মহাকাশচারী একই সঙ্গে দুই ভিন্নজগৎকে প্রত্যক্ষ করবে এমন এক এলাকায় যাকে আমরা বলতে পারি এমন এক গলনপাত্র বা উত্তপ্ত কটাহ যেখানে বিপরীতমুখী কালিক তীরের সংঘর্ষ ঘটে। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের মহাকাশচারী অবশ্য বাইরে আসতে পারবে না তার তথ্য নিয়ে। ফলে আমরা এই সমান্তরাল, দুই বিপরীতমুখী সময়ের তীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত বিশ্বের সহঅবস্থান সম্পর্কে জানতে পারব না।

এই কাল্পনিক চিত্রের নিকটতম বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা পাই কেয়ন-কণিকার ক্ষেত্রে। কেয়ন (Keon) যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৭ সালে, তখন একটি রহস্য সৃষ্টি হয় ক্লাউড চেম্বারে মহাজাগতিক রশ্মির V আকৃতির আঁচড় সৃষ্টির দৃশ্যে। পদার্থবিজ্ঞানীরা তখন থেকেই অনুমান করেন যে এর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক কোনো ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে। কেয়ন সৃষ্টি হয় নিউক্লীয় কণিকা প্রোটন ও নিউট্রন-এর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে। কেয়ন সৃষ্টি হবার পর বেশিক্ষণ টিকে থাকে না। কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে সাবনিউক্লিয়ার কণিকায় রূপান্তরিত হয় যাদের একত্রে মেসন বলা হয়। মেসন-কণিকার সঙ্গে প্রোটন ও নিউটনের একটি মিল রয়েছে। তা হল, এদের মধ্যে তীব্র মিথস্ক্রিয়া ঘটে যার ভিতর দিয়ে একধরনের কণিকা অন্যধরনের কণিকায় রূপান্তরিত হতে পারে। প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে এই মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রবল নিউক্লীয় বল যা এখানে কার্যকর, তা দুর্বল নিউক্লীয় বল থেকে ভিন্ন। দুর্বল নিউক্লীয় বলের দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই বিটা-ক্ষয় প্রক্রিয়ায়। যেসব কণিকা প্রবল নিউক্লীয় বল দ্বারা প্রভাবিত হয় তারা সবই নিউক্লীয় কণিকার গঠনকারী কোয়ার্ক দ্বারা তৈরি। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রোটন ও নিউট্রন তিনটি করে কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। মেজনে আছে দুইটি কোয়াক। মোট

ছয়রকম কোয়ার্ক আছে এবং প্রতিটি কণিকার প্রতিকণিকা আছে। ছয়টি কোয়ার্ক হচ্ছে যথাক্রমে আপ, ডাউন, স্ট্রেঞ্জ এবং টপ, বটম ও চার্ম। এর ফলে আমরা ছত্রিশ রকম মিশ্রণ পাই একটি কোয়ার্ক ও একটি অ্যানটিকোয়ার্কের। এর ফলে অনেকরকম মেজন আমরা পেতে পারি, কারণ মেজন তৈরি হয় একটি কোয়ার্ক ও একটি অ্যানটিকোয়াক দিয়ে। কেয়ন এমন একটি মেজন কণিকা। কেয়ন অবশ্য তিনরকমভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যথা : চার্জহীন, ধনাত্মক চার্জযুক্ত ও ঋণাত্মক চার্জযুক্ত।

এই কেয়ন সময়ের দিকনিরপেক্ষতা সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করল। বিজ্ঞানীরা এটা স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নিয়েছিলেন যে, মৌলিক কণিকাদের ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনাই প্রত্যাবর্তী। অর্থাৎ যে-ঘটনা সম্মুখদিকে ঘটছে তা একইভাবে পিছনদিকে ঘটতে পারে। একে আমরা সময়ের দিকনিরপেক্ষতা বলি। গাণিতিকভাবে বলা হয় যে, কোনো সমীকরণ যদি একটি পারমাণবিক ঘটনাকে নির্দেশ করে তাহলে সময়ের তীরকে উল্টো করে দিলে অর্থাৎ সময় t কে −t দিয়ে প্রতিস্থাপন করলেও সমীকরণটি বৈধ হবে। সময়কে উল্টে দেবার গাণিতিক যে অপারেটর তাকে আমরা T দিয়ে প্রকাশ করি। কথাটা তা হলে দাঁড়াল প্রকৃতির নিয়ম মাইক্রোস্কোপিক স্তরে T-নিরপেক্ষ। কিন্তু কেয়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিসমাম্যের নিয়ম লঙ্ঘিত হতে দেখা গেল। কেয়ন সৃষ্টি হয় একনিমেষে অর্থাৎ দশ কোটি কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ সেকেন্ডে, যখন একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন পারস্পরিক সংঘর্ষে প্রবল মিথস্ক্রিয়া ঘটায়। কিন্তু কেয়ন যখন নিজে ভেঙে পড়ে অন্য কণিকার জন্ম দেয় তখন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সময় নেয়—প্রায় লক্ষকোটিগুণ সময়।

আমরা নিউটনের সূত্র, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বক সমীকরণ ইত্যাদিতে সময়ের প্রত্যাবর্তিতা দেখে এসেছি। এর ফলে একটি বলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে বিশেষ উচ্চতায় পৌছতে যে-সময় লাগে, সেখান থেকে আগের অবস্থানে ফিরে আসতে সেই একই সময় লাগে। পদার্থবিজ্ঞানের যে-কোনো সমীকরণে । এর পরিবর্তে। আমরা বসাতে পারি, সমীকরণের কার্যকারিতা বিঘ্নিত না করে। পরীক্ষাগতভাবে সময়ের এই প্রত্যাবর্তিতা অর্থাৎ T ইনভেরিয়েন্স যাচাই করতে হলে ল্যাবরেটরিতে ঘটানো কোনো ঘটনায় যেসব ধাপ জড়িত তার প্রতিটি বিপরীতভাবে ঘটানো সম্ভব হতে হবে। উল্লেখ্য, বড় আকারের ঘটনায় যেখানে ঘর্ষণজনিত প্রক্রিয়া জড়িত সেখানে এই প্রত্যাবর্তিতা শর্ত প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় সেটা প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ আমরা পারমাণবিক স্তরে সংঘটিত ঘটনার কথা বলছি।

অল্পদিনের মধ্যেই আরো এ-ধরনের উদ্ভট কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল। এদের বলা হল স্ট্রেঞ্জ (Strange)-কণিকা। এইসব স্ট্রেঞ্জ-কণিকার আচরণের পিছনে মূল উৎসরূপে স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক কাজ করছে সেটা উদ্ঘাটিত হল। একটি

স্ট্রেঞ্জ-কণিকার জন্ম হয় যখন একটি স্ট্রেঞ্জ-কোয়ার্ক উৎপন্ন হয় নিউক্লীয় কণিকার মধ্যে প্রথম মিথস্ক্রিয়া ঘটাবার মতন সংঘর্ষে। এই সংঘর্ষ অবশ্য একটি স্ট্রেঞ্জ অ্যানটিকোয়ার্কও সৃষ্টি করে। কোয়ার্ক ও অ্যানটিকোয়ার্ক যেখানে মিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে, সেখানে পরস্পরের বিপরীতমুখী স্ট্রেঞ্জ-বৈশিষ্ট্য কাটাকাটি হয়ে যায় এবং আমরা কোনো স্ট্রেঞ্জ-বৈশিষ্ট্য দেখি না। কিন্তু কোয়ার্ক অ্যানটিকোয়ার্ক যুগল যদি তাৎক্ষণিকভাবে পৃথক হয়ে যায়, এবং কোয়ার্ক আবদ্ধ হয়ে পড়ে কেয়নে, তাহলে স্ট্রেঞ্জ-বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে এই কেয়ন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে না, যতক্ষণ-না ঘটনাক্রমে সে আর-একটি কণিকার সংস্পর্শে আসে যেখানে অ্যানটিস্ট্রেঞ্জ অ্যানটিকোয়ার্ক আছে।

স্বভাবতই এমন ঘটনা কম-সম্ভাবনার। এই প্রক্রিয়া আসলে অপ্রত্যাবর্তী হয়ে থাকত। কিন্তু তা যে ঘটে না তার কারণ, দুর্বল নিউক্লীয় বল একধরনের কোয়ার্ককে অন্যধরনের কোয়ার্কে রূপান্তরিত করতে পারে। আমরা যদি এইভাবে বিচার করি যে কোয়ার্ক সৃষ্টি হওয়া এবং কোয়ার্কের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া আসলে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা নয়, তাহলে এক্ষেত্রে সময়ের দিকনিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হবার দৃষ্টান্তরূপে এই ঘটনাকে উপস্থিত করতে পারি না। বরং পুরো ঘটনাকে এর বিভিন্ন ধাপে ভাগ করে, যুক্তি দাঁড় করাতে পারি যে T-ইনভেরিয়েন্স সংরক্ষিত।

কিন্তু এর পরও অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করা যায় চার্জহীন কেয়ন K_0-এর ক্ষেত্রে। এর ক্ষয়কাল দুই ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঘটে। একসময় এটি দুটি নিয়নে রূপান্তরিত হয়, সেকেন্ডের দশ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে এবং অন্য সময় তিনটি নিয়নে রূপান্তরিত হয় এর দশগুণ জীবনকাল নিয়ে। এই দুইরকম ক্ষয়প্রক্রিয়া বা রূপান্তর কিম বুঝতে হলে আমাদের সম্পর্ক জানতে হবে আয়নায় প্রতিফলন ও সময়ের তীরের প্রতিফলন অর্থাৎ মিরর রিফ্লেকশন ও টাইম রিফ্লেকশনের মধ্যে। এটা বেশ সাধারণ নিয়ম হিসাবে দেখানো যায় যে আয়নায় প্রতিফলন ও সময়কে উল্টে দেয়ার ফল ঘটনার উপরে একই প্রভাব রাখে। যেমন, একটি ঘূর্ণনশীল গোলকের যদি প্রতিবিম্ব দেখা যায় আয়নায় তাহলে মনে হবে গোলকের ঘূর্ণনগতি উল্টে দেয়া হয়েছে। সময়কে পিছনদিকে নিলেও একই ছবি আমরা পেতাম। একটি সংশোধন অবশ্য করতে হবে যে, এক্ষেত্রে কণিকা ও প্রতিকণিকার অবস্থান পরস্পরের মধ্যে বদল করে নিতে হবে। এভাবে বিচার করলে মিরর সিমিট্রি ও টাইম সিমিট্রি একসঙ্গে ধরলে কালিক প্রতিসাম্য রক্ষা পায়। কিন্তু ১৯৬৪ সালে প্রিন্সটনের কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী খুব অল্পসংখ্যক কেয়ন K_1 এ এতদিনের লালিত T ইনভেরিয়েন্স অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পরমভাবে পার্থক্য করেন নাই, এই অর্থে যে বিশ্বজনীন 'এখন' বলে কোনো বর্তমান নেই। এর অর্থ এই নয় যে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্যকারী সময়ের তীরের দিক নির্ধারণ সম্ভব নয়। আমরা যেমন কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে উত্তর ও দক্ষিণদিক নির্ধারণ

করতে পারি, কিন্তু যা আমাদের বিশেষ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর তা অন্য অবস্থান থেকে দক্ষিণ হতে পারে। অর্থাৎ পরমভাবে উত্তর ও দক্ষিণ না থাকলেও বিশেষ অবস্থানে থেকে উত্তর ও দক্ষিণদিক বলতে কী বুঝায় তা জানা সম্ভব। পৃথিবী যে ঘুরছে এই পরিপ্রেক্ষিতেও উত্তর-দক্ষিণ নির্ধারণ করা সম্ভব, কারণ এই ঘূর্ণন একটি অপ্রতিসাম্য সৃষ্টি করে। কেয়নও তেমনি সীমিত অর্থে সময়ের দুটো দিক—অতীত ও ভবিষ্যৎ পৃথক করতে পারে। কিন্তু পরমভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎরূপে সময়কে পৃথক করতে পারে না।

অন্তর্নিউক্লীয় কণিকা কেয়নের ক্ষেত্রে যে সামান্য অপ্রতিসাম্য আমরা লক্ষ্য করি অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে তার গুরুত্ব গভীর। এই অতিসামান্য কালিক অপ্রতিসাম্যতার জন্যেই পদার্থ ও প্রতিপদার্থের প্রতিসাম লঙ্ঘন করে। এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল দুটো দশা K_1 ও k_2 সৃষ্টি হতে পারে কেয়নের, যেখানে কেয়ন ও প্রতিকেয়নের মিশ্রণ ঘটছে। যদি কেয়ন থেকে প্রতিকেয়নে রূপান্তর ও প্রতিকেয়ন থেকে কেয়নে রূপান্তর একই দ্রুততায় ঘটে তাহলে সময়ের প্রতিসাম্য অর্থাৎ T ইনভেরিয়েন্স পরীক্ষাগতভাবে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা গেছে প্রতিকণিকারূপে K_0 বেশি সময় অতিবাহিত করতে চায় কণিকা K_0 । এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কেয়নের ক্ষেত্রে অতীত ভবিষ্যৎ পৃথক করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে, যদিও এই পার্থক্য অতিসামান্য। এ যেন দুই সমান্তরাল বিশ্ব—অতীত ও ভবিষ্যৎ পাশাপাশি অবস্থান করছে, এবং কেয়ন একটাতে অবস্থান করে অন্যটিতে উঁকি দিচ্ছে।

প্রশ্ন উঠবে : আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না; তাহলে কেয়ন কেমন করে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে অপ্রতিসাম্য দেখতে পায়? এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য একটু গভীরভাবে আইনস্টাইনের তত্ত্বের অর্থ বুঝতে হবে। সামান্য ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে T বিচ্যুতি অর্থাৎ সময়কে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করলে বা সময়ের তীরকে উল্টে দিলে সম্পূর্ণভাবে তা সময়ের সম্মুখপ্রবাহের সঙ্গে মিলে যায় না। গণিতের ভাষায় আমরা একে বলেছি T বিচ্যুতি। এটা আমরা দেখেছি বস্তুর ক্ষুদ্রস্তরে, যথা কেয়ন ও প্রতিকেয়নের আচরণে। এর ফলে কেয়ন যে-সময় নিয়ে প্রতিকেয়নে রূপান্তরিত হয়, প্রতিকেয়ন সেই সময়ে কেয়নে রূপান্তরিত হয় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যদি এই সামান্য T বিচ্যুতি বস্তুর ক্ষুদ্রতম স্তরে না-ঘটত, তাহলে বর্তমান মহাবিশ্ব আমরা পেতাম না, যা বস্তু দিয়ে তৈরি। যে মহাবিস্ফোরণের ভিতর দিয়ে মহাবিশ্বের উদ্ভব, সেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত, ঘনীভূত বিন্দুদশায় শক্তি ও বস্তু ছিল একাকার। বস্তু থেকে শক্তি ও শক্তি থেকে বস্তুর রূপান্তর ঘটছিল। কোয়ার্ক ও প্রতিকোয়ার্ক একই সঙ্গে উৎপন্ন হচ্ছিল শক্তি থেকে এবং এদের সমন্বয়ে অর্থাৎ বিলুপ্তির ভিতর দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছিল

বিকিরণ। মহাবিস্ফোরণের $১০^{-৬}$ সেকেন্ড পর যখন তাপমাত্রা $১০^{-১৩}$ কে-তে নেমে এল, তখন একটি দশা পরিবর্তন হল। তখন যথেষ্ট তাপশক্তি ছিল না বিকিরণ থেকে কোয়ার্ক ও প্রতিকোয়ার্ক অর্থাৎ পদার্থ ও প্রতিপদার্থ সৃষ্ট হবার। কোয়ার্ক ও প্রতিকোয়ার্ক পরস্পরের সঙ্গে মিলে রূপান্তরিত হচ্ছিল বিকিরণে। সেই সময় যদি সময়ের সামান্য অপ্রতিসাম্যতা অর্থাৎ T বিচ্যুতি না থাকত তাহলে পদার্থ ও প্রতিপদার্থ সমান পরিমাণে মিলে পরস্পরকে ধ্বংস করে রূপান্তরিত হত বিকিরণে। কিন্তু পদার্থ ও প্রতিপদার্থের আদর্শ ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি বলেই কিছু পদার্থ অবশেষ ছিল এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার পরও।

আমরা যে একটি গামারশ্মির বিশ্বের পরিবর্তে একটি বর্তনশীল বস্তুময় বিশ্ব পেয়েছিলাম তখন, তারই ফলশ্রুতিরূপে একপর্যায়ে মানুষের উদ্ভব। আমরা এখন বসে যে মহাবিশ্বের রহস্যোদ্ঘাটনের কাছে অবতীর্ণ হতে পেরেছি তার মূলে কাজ করেছে সামান্য T বিচ্যুতি। এই T ভায়োলেশনের ফলে পদার্থের পরিমাণ সামান্য বেশি ছিল প্রতিপদার্থের চেয়ে। সেখান থেকেই অণুপরমাণু ও জৈব সব বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে। সময়ের সামান্য অপ্রতিসাম্য আমাদের অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত বলেই বিষয়টি এত বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হল।

T বিচ্যুতির ধারণাটি পদার্থবিজ্ঞানীদের মনে গ্রথিত হবার পরই প্রচেষ্টা শুরু হল এ নিয়ে সূক্ষ্ম পরীক্ষা চালানো। ফরাসি বিজ্ঞানীরা গ্রেনবল এ এই পরীক্ষার আয়োজন করে। দক্ষিণ ফ্রান্সের এই শহরটি চৌম্বক গবেষণা ও নিউক্লিয়ার গবেষণার জন্য বিখ্যাত। একে বলা হয়ে থাকে চুম্বক নিয়ে গবেষণাকারীদের মক্কা। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল নিয়ে নয়, নিউট্রন নিয়ে গবেষণা চলেছে সময়ের সম্ভাব্য অপ্রতিসাম্যতা সন্ধানে।

আমরা জানি নিউট্রন চার্জহীন কণিকা। কিন্তু ১৯৩৩ সালে অটোস্টার্ন যখন আবিষ্কার করলেন যে নিউট্রনের চুম্বকত্ব আছে তখন তা বিস্ময় সৃষ্টি করল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। কারণ চৌম্বকত্বের জন্য বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহ চাই অথবা বৈদ্যুতিক চার্জের স্পিন চাই। নিউট্রনকে আমরা কল্পনা করতে পারি ঘূর্ণনশীল ক্ষুদ্র গোলক হিসাবে। সব নিউট্রনের জন্যেই এই ঘূর্ণনগতি অবশ্য অভিন্ন। কিন্তু সরল এই চিত্র এর চুম্বকত্বের ব্যাখ্যা দেয় না। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর গঠন অনেক বেশি জটিল। এখন আমরা জানি নিউট্রনের মধ্যে তিনটি কোয়ার্ক আছে যার একটির চার্জ ধনাত্মক ও এর মান ইলেকট্রনের চার্জের ২/৩ ভাগ এবং দুটি ঋণাত্মক যাদের প্রত্যেকের মান ইলেকট্রনের চার্জের ১/৩ ভাগ। মোট বৈদ্যুতিক চার্জ শূন্য হলেও এদের অবস্থানের জন্য এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধ নিয়ে পাক খাচ্ছে। এর সার্বিক ফল হল একটি চৌম্বক মোমেন্ট। এর চৌম্বকক্ষেত্র এর ঘূর্ণন অক্ষের দিকে অবস্থান করে।

নিউট্রনের মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জের উপস্থিতি আর-একটি সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। নিউট্রনের ঘূর্ণন-অক্ষ বা স্পিন-অক্ষ স্থানের মধ্যে একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে। নিউট্রনের যেমন একটি চৌম্বকক্ষেত্র ও দিক আছে, ফলে একটি চৌম্বক দ্বিপোলের মতন এটি কাজ করে, তেমনি এর একটি বৈদ্যুতিক দ্বিপোলও আছে কি? এখান থেকেই সময়ের তীর সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়।

মনে করা যাক নিউট্রনের স্পিনের একটি চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হল এবং তাকে উল্টোদিকে চালনা করা হল। এক্ষেত্রে নিউট্রনের স্পিন বিপরীতদিকে অবস্থিত বলে মনে হবে। অন্যদিকে নিউট্রনের যদি বৈদ্যুতিক দ্বিপোল থাকে, তার কোনো পরিবর্তন দেখা যাবে না ফিল্মটাকে উল্টোদিকে চালনার জন্য। কারণ তড়িৎ দ্বিপোল শুধু বৈদ্যুতিক চার্জগুলোর আপেক্ষিক অবস্থানের ওপরে নির্ভর করে, এদের গতির ওপরে নির্ভর করে না। এর ফলে সময়ের তীরকে উল্টে দিলে নিউট্রনের স্পিন উল্টে যায়, কিন্তু তড়িৎ দ্বিপোল অপরিবর্তিত থাকে।

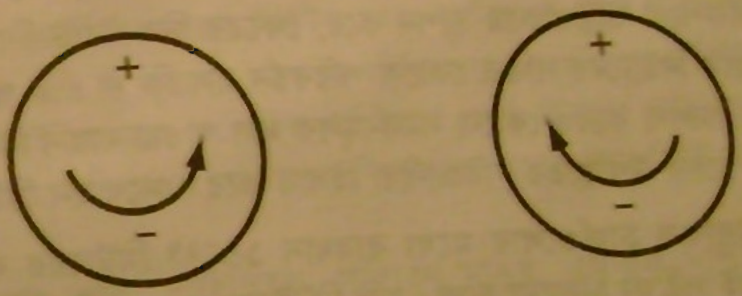

এর ফলে কোনো নিউট্রনকে একটি তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করলে এর স্পিন এবং তড়িৎ দ্বিপোলের বিপরীত সম্পর্ক ধরা পড়বে। তড়িৎক্ষেত্র বৈদ্যুতিক দ্বিপোলের ওপরে ক্রিয়া করবে এবং একে ঘুরাবার চেষ্টা করবে, যাতে দ্বিপোলের ধনাত্মক দিক তড়িৎক্ষেত্রের ঋণাত্মক ক্ষেত্রের দিকে অবস্থান নেয় এবং দ্বিপোলের ঋণাত্মক দিক তড়িৎক্ষেত্রে ধনাত্মক ক্ষেত্রের দিকে অবস্থান নেয়। তড়িৎক্ষেত্রের সঙ্গে এই মিথস্ক্রিয়ার ফলে কিছু শক্তিহ্রাস ঘটবে দ্বিপোলের। আমরা যদি সময়কে বিপরীতদিকে প্রবাহিত করতে পারতাম অর্থাৎ সময়ের তীরকে উল্টে দিতাম, তাহলে একটি নিউট্রনের উপরে দৃষ্টি রাখলে দেখতাম নিউট্রনের স্পিন উল্টে গেছে কিন্তু তড়িৎ-দ্বিপোল এবং বাইরের বৈদ্যুতিক নক্ষত্র অপরিবর্তিত থাকছে। আমরা যদিও সময়ের দিককে উল্টে দিতে পারি না, তড়িৎক্ষেত্রকে উল্টোদিকে প্রয়োগ করতে পারি, যার ফল সময়ের দিককে উল্টে দেবার সমান। কারণ যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল স্পিন-এর দিক ও তড়িৎ দ্বিপোলের দিকের মধ্যে আপেক্ষিক সম্পর্ক। এর ফলে আমরা সময়ের দিক পরিবর্তনের প্রভাব পরীক্ষা করতে পারি এটা দেখে যে, তড়িৎক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন করলে নিউট্রনের শক্তির পরিবর্তন হয় কি না।

এখানে উল্লেখ্য যে, নিউট্রনের চৌম্বকক্ষেত্রের জন্য এই ধরনের পরীক্ষা সম্ভব নয়। কারণ আমরা দেখেছি নিউট্রনের চৌম্বক দ্বিপোল সৃষ্টি হয় নিউট্রনের মধ্যে উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহের জন্য এবং সময়কে বিপরীতমুখী করলে এক তড়িৎপ্রবাহের দিকও উল্টে যায়। অর্থাৎ চৌম্বক দ্বিপোল যা ঘূর্ণনশীল চার্জ থেকে উৎপন্ন, তা সময়ের দিক উল্টোলে স্পিনের সঙ্গে একইভাবে উল্টে যায়। স্থির তড়িৎচার্জের অবস্থানের কারণে সৃষ্ট তড়িৎ দ্বিপোলের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। এর ফলে চৌম্বক দ্বিপোল ও স্পিনের দিক একই সঙ্গে উল্টে যায় সময়কে বিপরীতদিকে প্রবাহিত করলে। এবং এদের আপেক্ষিক অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। এ-সমস্ত যুক্তি প্রয়োগের মূল কথা হল নিউট্রনের যদি কোনো তড়িৎ দ্বিপোল পাওয়া যায়, তা যতই নগণ্য হোক, আমরা প্রমাণ পাব যে সময়কে উল্টে দিলে বিশ্বের প্রতিসাম্যতা বজায় থাকে না। সেক্ষেত্রে নিউট্রনের তড়িৎ দ্বিপোল সময়ের দিক নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে।

তড়িৎ দ্বিপোল পরিমাপের জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হল নিউট্রনকে একটি শক্তিশালী তড়িৎক্ষেত্রে স্থাপন করে, ক্ষেত্রের দিক উল্টে দিতে হবে, এবং দেখতে হবে নিউট্রনের শক্তির কোনো পরিবর্তন হল কি না। এ পর্যন্ত অতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা পরিচালনা করেও কোনো সমর্থনমূলক ফল পাওয়া যায়নি নিউট্রনের মধ্যে তড়িৎ দ্বিপোলের উপস্থিতির। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন নিউট্রনের মধ্যে ধনাত্মক ঋণাত্মক চার্জগুলোর মধ্যে ব্যবধান $১০^{-২৭}$ মিটারের কম। আরো সূক্ষ্মভাবে এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। যদি নিউট্রনের মধ্যে তড়িৎ-দ্বিপোল পাওয়া যায় তার অর্থ হবে সময়ের অতীত ও সময়ের ভবিষ্যৎ বস্তুর মধ্যে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এটা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর ভাবনা যে নিউট্রন বা কেয়নের মতন অতিক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ইতিহাস দেখতে চান। পদার্থবিজ্ঞানী ইউভাল নিম্যান দাবি করেছেন যে সময়ের দিক কেয়নের ক্ষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার ভিতর দিয়ে মহাবিশ্বের প্রসারণ বা সংকোচনকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হবার পরিবর্তে যদি সংকোচনশীল হত তাহলে কেয়নের ক্ষয়কালের বা ডিকে টাইমের অপ্রতিসাম্যতা বর্তমানের মতন না হয়ে এর বিপরীত দিকে হত। এখানে উল্লেখ্য যে, পদার্থ দিয়ে তৈরি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ আর প্রতিপদার্থ দিয়ে তৈরি মহাবিশ্বের সংকোচন একই কথা।

মনস্তাত্ত্বিক সময়

সময়-সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা মনের পিছন-দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তা স্বভাবতই ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থানির্ভর অস্বচ্ছ জটিল—প্রায় যোগাযোগ-অসাধ্য। সময়কে এই ব্যক্তিনির্ভর, বিষয়ী, অধ্যাত্মীয় বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে নৈর্ব্যক্তিক, স্বচ্ছ, পরিমাপযোগ্য ও যোগাযোগসাধ্য ধারণায় উত্তীর্ণ করতে সাহায্য করেছে পদার্থবিজ্ঞান। এখানে অবদান রেখেছেন গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন প্রমুখ। ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা থেকে মুক্ত করে একটি গাণিতিক রাশিরূপে সংজ্ঞায়িত করেন নিউটন তার বলবিদ্যার সূত্রে। সময়কে বাহ্যিক ঘটনা, বস্তুর গতি ও ত্বরণের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন গ্যালিলিও—নিউটনের একটু আগে। তিনিই সময়কে গাণিতিক রাশিরূপে প্রথম ব্যবহার করেন তার গতি ও ত্বরণের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণে, যা আরো নিগূঢ়ভাবে প্রবেশ করে নিউটনের বলবিদ্যার ব্যাখ্যায়।

সময়কে কবি, সাহিত্যিক, সাধারণ মানুষ, এমনকি দার্শনিকরা যেমন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়রূপে দীর্ঘদিন অন্তর্গতভাবে ধারণ করেছেন এবং এখনো করেন, তা থেকে পদার্থবিজ্ঞানীদের সময়-ভাবনা স্বভাবতই ভিন্ন। কারণ পদার্থবিজ্ঞানে দুটো শর্ত আরোপ করা হয় প্রতিটি ধারণাকে গ্রহণযোগ্য করতে। একটি হল যে, চলৎরাশি বা ধারণাকে আমরা বিশ্বজগতের ঘটনামালার ব্যাখ্যায় ব্যবহার করব তা পরিমাপযোগ্য হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে রাশি বা ধারণাকে আমরা ভৌত জগতের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করছি তা যোগাযোগসাধ্য হতে হবে অর্থাৎ এর সর্বজনীনতা বা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ভাবনা যদিও মূল ভিত্তি বহির্জগতের ধারণা লাভের, মূলত এগুলো আমরা পাই ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সাধারণের গ্রহণযোগ্যতার সীমায় নিয়ে যেতে হলে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বাহ্যিক মানদণ্ডে পরিমাপ করে ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। এর ফলেই নৈর্ব্যক্তিক বিমূর্ত ও গাণিতিক ধারণায় উত্তীর্ণ হতে চায় পদার্থবিজ্ঞানে ব্যবহৃত ধারণাগুলো।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সময়কে সমস্ত কুয়াশাচ্ছন্নতা ও ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং প্রতিটি তত্ত্বের উদ্ভাবন সময়ের ধারণাকে স্পষ্টতর

করেছে। কিন্তু মানুষ হিসাবে প্রতিটি বিজ্ঞানী নিজস্ব মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিগত ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। এখানে কাজ করে স্বজ্ঞা, কল্পনা ও অনুমান। প্রমাণসাধ্য, পরিমাপযোগ্য, এমনকি প্রকাশসাধ্য নয় এমন অনেক ব্যক্তিগত এলোমেলো ভাবনা তাদের মধ্যেও কাজ করে। এ যেন পেছন দুয়ার দিয়ে নানা অনুমানাত্মক চিন্তার উঁকি দেয়া। এ-ধরনের স্বজ্ঞামূলক চিন্তাকে মানুষ হিসাবে আমরা বর্জন করতে পারি না দুটো কারণে। প্রথমত, যে বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলো পরীক্ষিত, প্রমাণিত ও যুক্তিযুক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত তা প্রাথমিক স্তরে স্বজ্ঞারূপেই বিজ্ঞানীদের মনে প্রায়শ উদয় হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, যে ভাবনা বা প্রশ্ন বিশেষ সময়ে অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলে প্রতিভাত হচ্ছে তা কালক্রমে বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক রূপ লাভ করতে পারে নতুন গাণিতিক, তত্ত্ব ও অভিনব পরিমাপ যন্ত্রের উদ্ভাবনে। যেমন সময়ের প্রবাহ এবং বর্তমান মুহূর্ত যে হারিয়ে যাচ্ছে অতীতের গহ্বরে, এ-ধরনের ভাবনা যে সবার মনেই উঁকি দেয় তা নিছক প্রহেলিকা ও হেঁয়ালি ভাবনা বলে উড়িয়ে দেয়া কি সঙ্গত?

আমরা খাবার টেবিলে পরিপাটিরূপে সাজানো পূর্ণাঙ্গভাবে পাকানো খাবার যেমন পাই, বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোও তেমনি যৌক্তিকভাবে সাজানো পরীক্ষিত ও প্রমাণিতরূপে প্রকাশিত হতে দেখি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও জার্নালে। কিন্তু বিশুদ্ধভাবে রাঁধা ও যথার্থভাবে পরিবেশিত খাবারগুলো প্রস্তুত হয় যে-রান্নাঘরে, সেখানে এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত আয়োজন চলে খাবার-প্রস্তুতির। অক্রম ও অসম্পন্নতার অজুহাতে রান্নাঘরের কাঁচা খাবারগুলো অরক্ষিত বলে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করলে টেবিলের রক্ষিত ও পরিবেশিত খাবারগুলো আমরা পেতাম না। বিজ্ঞানের ধারণা ও তত্ত্বের ক্ষেত্রেও আমরা শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত ভাবনাকে অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক ধারণাগুলোই শুধু প্রকাশ করলেও সব প্রাথমিক ধারণা ও উপলব্ধিই ব্যক্তিগত।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা কখনো স্বীকার্য ধরে অগ্রসর হই, কখনোবা বাহ্যিক পরীক্ষা অর্থাৎ অপারেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি। প্রথম পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হল দার্শনিক এমানুয়েল কান্টের গৃহীত স্বতঃসিদ্ধ। নিউটনের ব্যবহৃত সময়ের ধারণা যে-সমস্যার সৃষ্টি করে তার সমাধানে তিনি এটা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করলেন যে, সময়ের ধারণা সেই সঙ্গে স্থান ও কার্যকারণের ধারণা জন্মগত বা পূর্বপ্রদত্ত জ্ঞান। অন্যদিকে আইনস্টাইন সময়ের ধারণাকে সবরকম রহস্যমুক্ত করতে আদিকাল পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদের আলোকে বললেন : ঘড়িতে যে-সময় আমি দেখি সেটাই আমার সময়। সময় সে-অর্থে একান্তভাবেই পরিমাপলব্ধ একটি রাশি যা পর্যবেক্ষকের সঙ্গে ঘড়ির গতিনির্ভর। আমরা দেখেছি নিউটনের বিশ্বজনীন ঘটনা ও পর্যবেক্ষক-নিরপেক্ষ পরম-সময়ের ধারণা গেল বদলে।

আমরা দেখেছি পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও নতুন সব তাত্ত্বিক ধারণার উদ্ভবের ভিতর দিয়ে সময়ের ধারণা ক্রমাগতভাবে স্পষ্টতর হলেও ঐকমত্য সৃষ্টি

হয়নি। কিন্তু যা আরো তাৎপর্যপূর্ণ তা হল বিজ্ঞানীদের বাহ্যিক তত্ত্বভিত্তিক ধারণার আড়ালে তাদের একটি অন্তর্গত বা মনস্তাত্ত্বিক সময়ের ধারণা বা কালিক চেতনা পরিলক্ষিত, যা একান্তভাবেই বিজ্ঞানীর নিজস্ব স্বজ্ঞানির্ভর। এই ব্যক্তিগত সময়ের ভাবনা বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রদত্ত তাঁর ভাবনার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। আর এজন্যেই একে আমরা বলছি মনের পিছনদুয়ার দিয়ে এই ভাবনার প্রবেশ। আমরা এখানে এই মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাগুলোকে অগ্রাহ্য করতে চাচ্ছি না। কারণ ভবিষ্যতে এই ধারণাগুলো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেতেও পারে। এছাড়া সময়কে কেন্দ্র করে আমাদের মনোজগতে কী বিচিত্র সব অবচেতন উপলব্ধির সৃষ্টি হচ্ছে তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, সময়ের প্রবাহ নিয়ে যে সহজাত ধারণা চলে আসছে দীর্ঘদিন, তার পিছনে কোনো ভৌত প্রক্রিয়া থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এক্ষেত্রে বিভক্ত তাঁদের স্বজ্ঞামূলক ধারণায়। এটাই স্বাভাবিক। কারণ পরীক্ষা করে এই অনুমানগুলো যাচাই করা সম্ভব হয়নি এখনো। কেউ কেউ ভাবছেন সময়ের প্রবাহিত হবার ধারণাটি বিশ্বজনীন এবং এর আড়ালে বিশ্বজুড়ে একটি প্রক্রিয়া কার্যকর। অন্যদল ভাবছেন সময়ের এই প্রবহমানতার ধারণা একটি নির্বাচিত বিষয় যা মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন ও ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রিগজিনের ধারণা : কিছু কিছু ভৌত ঘটনার সংখ্যায়নিক ব্যাখ্যায়, যেমন বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়াগুলোতে, অন্তর্নিহিত অপ্রতিসাম্য আছে সময়ের। এক্ষেত্রে সময়ের তীর মৌলিকভাবে চলে আসে। অন্যদিকে পেনরোজ এইমত পোষণ করেন যে, সময়ের প্রবাহের ধারণা ঘটে মস্তিষ্কে সংঘটিত রহস্যজনক প্রক্রিয়ার দ্বারা, যার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে।

উৎকণ্ঠা নিয়ে সময়ের এই সাবজেক্টিভ বা বিষয়ী ধারণার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক সময়ের ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। গ্রিক দার্শনিক অস্তিত্ব নিয়ে কোনোকিছুর অবস্থান করা এবং কোনোকিছুর হয়ে ওঠার মধ্যে পার্থক্য খুঁজেছেন। যেমন একখণ্ড স্থির অপরিবর্তী প্রস্তরখণ্ড হচ্ছে নিশ্চল অবস্থিতির দৃষ্টান্ত এবং একটি বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমন ও বৃদ্ধি হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত।

বিংশ শতাব্দীতে এসে এডিংটন বলেছেন : কোনোকিছুর হয়ে ওঠার বা সময়ের প্রবাহের ধারণা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন গভীরভাবে সংযুক্ত যে এর পিছনে নৈর্ব্যক্তিক ভৌত জগতের প্রভাব নিশ্চয়ই রয়েছে। তাঁর কথা হল, "যদি এটা হয় যে আমাদের নিজের অস্তিত্বের কারণেই আমি অন্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুধাবন করি, তাহলে আমি কোনোকিছুর হয়ে ওঠার অর্থাৎ সময়ের প্রবাহের ধারণা উপলব্ধি করি, কারণ আমি নিজে হয়ে উঠছি।" তিনি আরো বলেছেন :

"আমরা সময়কে অনুধাবন করি দুইভাবে। প্রথমটি হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করা, যেমন করে আমরা স্থানিক সম্পর্ক দেখতে পাই। কিন্তু দ্বিতীয় আর-একটি পথ আছে সময়কে অনুভব করার যা অন্তর্গত, একান্ত মনস্তাত্ত্বিক। এ যেন মনের পিছন-দরজা দিয়ে সময়ের ধারণ লাভ অধ্যাত্মীয় প্রক্রিয়ায়।" স্বভাবতই এ-ধরনের বক্তব্য অবৈজ্ঞানিক মনে হবে যদিও এডিংটন ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী। অন্তর্গত সময় বা নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি যখন চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তখন নিজেকে অনুভব করি যার সঙ্গে বাইরের কিছুর সম্পর্ক থাকে না।" এইভাবে সময়কে অনুভব করা হচ্ছে অনাতর্গতভাবে সময়কে জানা। স্থান অন্যদিকে সম্পর্কিত বাহ্যিক অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে। বস্তুকে দেখা তাই বাহ্যিকভাবে দেখা।

সম্প্রতি রজার পেনরোজও অনেকটা এডিংটনের সুরে অন্তর্গত সময়ের কথা বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সময়ের প্রবাহ সম্পর্কে আমরা সচেতনভাবে যা অনুভব করি এবং আমাদের চমৎকার সব পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব ভৌতজগৎ সম্পর্কে যে-ধারণা তুলে ধরে—এই দুইয়ের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। এই ব্যবধান ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের সচেতন ধারণার আড়ালে গভীর পদার্থবিজ্ঞান আছে।

দেখা যাচ্ছে সময়ের প্রবাহ সম্পর্কে আমাদের মানসিক অভিজ্ঞতা এতই গভীর যে নানা মনস্তাত্ত্বিক রহস্য এখানে কাজ করছে। অনেক পদার্থবিজ্ঞানী যেমন হসমার্ড এসব অধিবিদ্যক ভাবনাকে নিছক কথার মারপ্যাঁচ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একথা সত্যি যে, সময়-সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই অবৈজ্ঞানিকভাবে উত্থাপিত হয়েছে। দৃষ্টবাদীদের মতে যে-প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান নেই তা অবান্তর ও অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু দার্শনিকরা প্রশ্ন করেছেন যে প্রশ্নের জবাব এখন পাওয়া সম্ভব নয় বলে কি তা উত্থাপন থেকে বিরত থাকা সঙ্গত?

সময়কে অনুভব করার জন্য বিশেষ ইন্দ্রিয় নেই আমাদের, যে-অর্থে আমাদের দেখার ও শ্রবণ করার ইন্দ্রিয়রূপে আছে চোখ ও কান। তবু আমাদের গভীর এক কালিক চেতনা আছে যা গভীরভাবে সম্পর্কিত আমাদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে এবং এই উপলব্ধির সঙ্গে যে সময় মুক্ত প্রাপ্ত নিয়ে প্রবাহিত যার কল্যাণে আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা বদলাতে পারি আমাদের কাজ দিয়ে।

এটা আমাদের জন্য বিস্ময় সৃষ্টি করে যে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বে সময়কে পর্যবেক্ষককেন্দ্রিক করলেও ব্যক্তিগতভাবে সময়ের প্রবাহকে উপলব্ধি বা সংজ্ঞায়িত করার কোনো অবকাশ নেই। এখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে পরমভাবে পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই। এদিক থেকে নিউটন ও ল্যাপলোসের দেয়া সময়ের ধারণার সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েই গেছে আইনস্টাইনের তত্ত্বে। এবং সেটা এই অর্থে যে নিউটন ও ল্যাপলেসের মতন

আইনস্টাইনও নির্দিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্কে আস্থা রেখেছেন। কোয়ান্টামতত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়েও তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার বিধি গ্রহণ করতে চাননি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তিনি এই তত্ত্বকে সফল কিন্তু অসম্পূর্ণ মনে করতেন। বিশেষ করে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি ও ওয়েভ-ফাংশনের সম্ভাবনাভিত্তিক ব্যাখ্যা আইনস্টাইন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি "বিধাতা নিশ্চয়ই পাশা খেলছেন না" সংক্ষেপে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্ভাবনার নিয়মের প্রতি তাঁর নিস্পৃহতা প্রকাশ করে। আইনস্টাইনের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা স্বজ্ঞামূলক যেখানে তাঁর বাহ্যিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির চেয়ে অন্তর্গত মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। কারণ তিনি শেষদিকে এসে বলেছেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিঃসন্দেহে কার্যকর একটি তত্ত্ব মাইক্রোজগতের ঘটনা ব্যাখ্যায়, কিন্তু তাঁর ভিতরের মন বলে এটা অসম্পূর্ণ।

তিনি দীর্ঘসময় ধরে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন একীভূত তত্ত্ব উদ্ভাবনের, যা হবে কার্যকারণের নিয়মে নিশ্চয়তাবাদের ধারক। নিশ্চয়তাবাদের প্রভাব সময়ের ওপরে অত্যন্ত ব্যাপক তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে সময় এর গতিশীলতা হারায়। কারণ নিশ্চিত কার্যকারণের নিয়ম প্রয়োগ করে ভবিষ্যতের সব ঘটনা সম্পর্কে আমরা এখনই জেনে ফেলতে পারি। তাহলে সমগ্র ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে ধারণ করা আছে। যেমন ল্যাপলেস বলেছিলেন ১৮১৯ সালেই যে, একজন অতিবুদ্ধিমান প্রাণী বিশ্বজগতের সববস্তুর অবস্থান ও গতি এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতির নিয়মগুলো জেনে অনাগত ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করতে পারে তার গাণিতিক হিসাব কষে। তাঁর কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একইভাবে স্পষ্ট ও জ্ঞাত। আমরা লক্ষ্য করি যে আইনস্টাইন সময়কে সনাতনী নিউটনীয় ধারণা থেকে অনেকখানি মুক্ত করে এনে সময়কে পর্যবেক্ষকনির্ভর ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক ভৌতরাশিরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর নিশ্চয়তার দর্শন সময়কে গতিবর্জিত করে। এক্ষেত্রে মহাবিশ্বের সমস্ত ঘটনা যা কালিক পর্যায়ে সাজানো, তা মহাবিশ্বসৃষ্টির মুহূর্তেই ঠিক হয়ে গেছে। এ যেন একটি পূর্ব থেকে নির্মিত একটি চলচিত্র, যা ততটুকুই আমাদের কাছে নতুন মনে হয় যতটা আমরা অজ্ঞ। কিন্তু একজন সবজান্তার কাছে কী ঘটতে যাচ্ছে সবজানা এই মুহূর্তেই, কারণ কার্যকারণের নিয়মের নিশ্চয়তা এটি সম্ভব করেছে। সময়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে সময়ের যে-বিভাজন তা এক্ষেত্রে অর্থহীন; কারণ সব ঘটনাকেই কালনিরপেক্ষ সমীকরণে আমরা প্রকাশ করতে পারি। সময় তাহলে কি একটি বিন্দুতে এসে দাঁড়াচ্ছে না?

সময়কে যদি গতিশীল বাস্তব ও অর্থপূর্ণ রাশিতে আমরা রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে আগামীকাল কী ঘটবে তা জানতে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেমন দুইমাত্রিক জগতে কোনো বিন্দুতে অবস্থান জানতে হলে দুটো

স্থানাঙ্কই জানতে হবে। একটি স্থানাঙ্ক দিয়ে যদি নিশ্চিতভাবে কোনো অবস্থান জানা যেত তাহলে ঐ জগৎ আসলে দুইমাত্রিক নয়। আমরা যে চারমাত্রিক জগতে ঘটনার ঠিকানা জানতে চাই সেখানে তিনটি স্থানিক মাত্রা ছাড়া একটি চতুর্থ কালিক মাত্রা আছে। যদি এটা সম্ভব হয় যে, সব ঘটনার মধ্যে যে-সম্পর্ক তা কালনিরপেক্ষ সমীকরণ দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব, তাহলে বুঝতে হবে সময় কোনো বাস্তব ও অপরিহার্য মাত্রা নয়।

সময়কে একটি অপরিহার্য বাস্তব মাত্রারূপে আমরা পেতে পারি দুইভাবে। এর একটি হল বিশৃঙ্খলার তত্ত্ব, অন্যটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। এই দুই তত্ত্বই প্রকৃতির ঘটনামালায় অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে। বিশৃঙ্খলার তত্ত্বে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক এত সূক্ষ্ম ও সংবেদী যে, প্রতিমুহূর্তের অতিসামান্য পরিবর্তন বড় পরিবর্তনের সূচনা ঘটনায় পরবর্তীতে। এর ফলে কার্যকারণের নিয়ম ও নিশ্চয়তার বিধি ক্ষুদ্রতম স্তরে কার্যকর হলেও সময়ের বিস্তারে পুরো ব্যাপারটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রস্তরে সামান্য পরিবর্তন বিবর্ধিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সময়ের সঙ্গে। বিশৃঙ্খলার তত্ত্ব অভিনব এক তত্ত্বরূপে নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি করছে সময়-সম্পর্কে। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রকৃতির অনেক ঘটনাই বিশৃঙ্খলার অন্তর্গত। যেমন অনিয়ত প্রবাহ, ঘূর্ণবাত, হৃদ-আক্রমণ। কিন্তু কিছু ব্যবস্থা আছে, যেমন মানুষের মস্তিষ্ক, যার অবস্থান বিশৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলার মধ্যবর্তী এক ক্রান্তিক প্রান্তে; এটি একটি চমকপ্রদ দশা যা এখনো আমাদের সম্পূর্ণ বোধের অতীত। এখানে কাজ করে অভিনবত্ব ও উন্মুক্ততা, যা এই ব্যবস্থাকে বিকল্প দুই পরিস্থিতির মধ্যে তুলনা করে অভিযান চালাতে পারে নতুনের সন্ধানে, সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে হারিয়ে না-যেয়ে। এর মধ্যদিয়েই মস্তিষ্ক মানুষের মুক্তচিন্তাকে লালন করে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যাও আপেক্ষিকতার তত্ত্বর মতন পর্যবেক্ষককে কেন্দ্রবিন্দু করে ঘটনার, কিন্তু তা অনেক বেশি গুরুত্বের সঙ্গে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পর্যবেক্ষণক্রিয়া কোনো ঘটনাকে অনেক বেশি সুনির্দিষ্টতা প্রদান করে এর অনিশ্চিত ও কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে। পর্যবেক্ষণের আগে কোনো বস্তু বা ঘটনা অনেকগুলো বিকল্প সম্ভাবনাকে ধারণ করে রাখে, যাকে ওয়েভ-ফাংশন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। পর্যবেক্ষণের আগে কোনো ব্যবস্থা অনেকগুলো সম্ভাবনাকে ধারণ করে রাখে। বিশেষ পরীক্ষা পরিচালনা বা পর্যবেক্ষণক্রিয়া এই সম্ভাবনার তরঙ্গকে চুপসে দেয় একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে, যাকে আমরা পর্যবেক্ষণলব্ধ ফল বলি। এটা একটি বড় ধাঁধা পদার্থবিজ্ঞানে যে, কেমন করে একটি সম্ভাবনার জগৎ যা একাধিক বিকল্প মানকে ধারণ করে আছে তা একটি একক ঘটনায় রূপান্তরিত হয় পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে।

অনেক পদার্থবিজ্ঞানী কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্ভাবনার জগতের সঙ্গে আমাদের মনোজগতের কোনো সম্পর্ক টানতে চান না। কিন্তু কেউ কেউ আমাদের মনস্তাত্ত্বিক জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থাকে ওয়েভ-ফাংশন বা তরঙ্গ-অপেক্ষকের সঙ্গে তুলনা করতে চান। সম্ভাবনা তরঙ্গের ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের মানসিক চেতনার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক তারা দেখতে চান। [illegible], [illegible] এবং দার্শনিক রিচনবাক এই দলে। রজার পেনরোজ এবং আরো কেউ কেউ সময়ের প্রবাহকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন মস্তিষ্কের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার মাধ্যমে এবং তা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়মে। সময়ের প্রবাহের ধারণাকে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যার চেষ্টা একটি উত্তেজনাকর নতুন গবেষণার ক্ষেত্র, যা এখন মাত্র উন্মোচিত হচ্ছে।

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET